উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

কোর পত্র – ১০২ (আবশ্যিক)

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১ চর্যাপদের সাধারণ আলোচনা

একক ২ চর্যাপদের পদ বিশ্লেষণ ১, ৫, ৬, ৮, ১৪

একক ৩ চর্যাপদের পদ বিশ্লেষণ ২১, ২২, ২৮, ২৯, ৪২

একক ৪ চর্যাপদের কবি পরিচয়

একক ৫ বৈষ্ণব পদাবলীর সাধারণ আলোচনা

একক ৬ পদাবলীর পর্যায় বিভাগ- গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী, গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত

একক ৭ পদাবলীর পর্যায় বিভাগ- মাথুর, আত্মনিবেদন, ভাবসম্মিলন, প্রার্থনা

পর্যায় খ

একক ৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাধারন আলোচনা

একক ৯ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্ম খণ্ড

একক ১০ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বিরহ

একক ১১ চৈতন্য চরিতামৃতের সাধারন আলোচনা

একক ১২ চৈতন্য চরিতামৃতের কাব্য পরিকল্পনা

একক ১৩ আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একক ১৪ মধ্য লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ

কোর পত্র – ১০২ (আবশ্যিক) - প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

পর্যায় খ

একক ৮। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাধারন আলোচনা – উদ্দেশ্য, পুঁথি আবিষ্কার, নামকরণ, রচনাকাল নির্ণয়, কাব্য পরিচয়, কাহিনী বিশ্লেষণ, চরিত্র আলোচনা, সমাজচিত্র, কাব্যমূল্য, কবিপরিচয় ও চন্ডীদাস সমস্যা।

একক ৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্ম খণ্ড – উদ্দেশ্য, জন্ম খন্ডের অবতারণা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্ম খণ্ডের আলোচনা, জন্মখণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা।

একক ১০। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বিরহ – উদ্দেশ্য, ভূমিকা, রাধা চরিত্র, কৃষ্ণ চরিত্র, বড়াই চরিত্র, রাধা বিরহ প্রক্ষিপ্ত কিনা, রাধা বিরহের গীতিধর্মিতা।

একক ১১। চৈতন্য চরিতামৃতের সাধারন আলোচনা – উদ্দেশ্য, চরিত কাব্যের বৈশিষ্ট্য, কবি পরিচয়, রচনাকাল।

একক ১২। চৈতন্য চরিতামৃতের কাব্য পরিকল্পনা - পরিচ্ছেদ বিভাগ, উৎস, কাব্যের বিষয় বিন্যাস, কবির কবিত্ব, কাব্যের

ভাষা, আদি লীলার চতুর্থ ও মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ এর গুরুত্ব।

একক ১৩। আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ - কাব্য বিশ্লেষণ, বস্তু সংক্ষেপ, রাধাতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব কৃষ্ণ তত্ত্বের সঙ্গে গৌরাঙ্গ তত্ত্বের সম্পর্ক, গোপী তত্ত্ব, কৃষ্ণ তত্ত্ব।

একক ১৪। মধ্য লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ - কাব্য বিশ্লেষণ, বস্তু সংক্ষেপ, সাধ্য তত্ত্ব, সাধন তত্ত্ব, কৃষ্ণ তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেম বিলাস, ইষ্ট গোষ্ঠী।

একক ৮। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাধারন আলোচনা

বিন্যাসক্রম

৮.১। উদ্দেশ্য

৮.২। পুঁথি আবিষ্কার

৮.৩। নামকরণ

৮.৪। রচনাকাল নির্ণয়

৮.৫। কাব্যপরিচয়

৮.৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর কাহিনী

৮.৭। চরিত্র আলোচনা

ক। কৃষ্ণ

খ। রাধা

গ।বড়াই

৮.৮। সমাজচিত্র

৮.৯। কাব্যমূল্য

৮.১০। কবি পরিচয় ও চন্ডীদাস সমস্যা

৮.১১। অনুশীলনী

৮.১২। গ্রন্থপঞ্জি

৮.১। উদ্দেশ্য

মধ্যযুগের সাহিত্যকে দুটি পর্বে ভাগ করলে, প্রথম পর্বটি সবটুকু অংশ জুড়ে আছে বড়ু চন্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কৃত হলো তখন বিতর্কের ঝড় উঠলো যে, এতদিন আমরা যে চন্ডীদাসের পদ পাঠ করছিলাম ,তিনি তাহলে কোন চন্ডীদাস ছিলেন। পদাবলী চণ্ডীদাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর চন্ডীদাসকে এক করা যায় না।এই এককে আমাদের সাহিত্য আলোচনার মূল বিষয় হবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটি আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত ,নামকরণ প্রসঙ্গ,রচনা কাল নির্ণয় ইত্যাদি ।কবি বড়ু চন্ডীদাসের পরিচয় আমরা এখান থেকে পাব।

৮.২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার

মধ্যযুগের,বা বলা যেতে পারে প্রাকচৈতন্য যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাব্য বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।' সবার উপরে মানুষ সত্য' পদের রচয়িতা চন্ডীদাসের নামে বাঙালি আজও পাগলপারা। চৈতন্যদেব একজন চন্ডীদাসের পদ পড়তেন একথা 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় ।চৈতন্যদেব যে কবির কাব্য পাঠ করতেন তিনি যে সমাজে সমাদৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সাহিত্যিকরা চণ্ডীদাসকে এক ও অদ্বিতীয় বলে মনে করতেন । যখন দেখা গেল বিংশ শতাব্দীতে চন্ডীদাস ভনিতা এমনসব পদ আবিষ্কৃত হতে লাগল যার সঙ্গে এতদিন প্রচলিত পদের রচয়িতা চন্ডীদাস কে মিলিয়ে নেওয়া যায় না,তখন এই বিশ্বাসে চিড় ধরল।কেউ কেউ একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে লাগলেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দঃ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের জুহুরি, বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি পুঁথি আবিষ্কার করলেন ।পুঁথিটি পাওয়া গেল রাজগুরু মহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে । পুঁথিটির প্রথম দুটি

এবং শেষের একটি পাতা নেই। কবির ভনিতা চন্ডীদাস ,বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়।এটির বিষয় কৃষ্ণের ব্রজলীলার ধারাবাহিক রচনা। পুঁথিতে কাব্যটির কোন নাম পাওয়া যায়নি। আবিষ্কর্তা এর নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

৮.৩। নামকরণ

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে পুঁথিটি আবিষ্কার করেন সেটি খণ্ডিত ছিল। প্রথম দিকের কয়েকটি পাতা এবং শেষ পাতা না মেলায় পুঁথিটির নাম কি তা জানা যায় না। বইটির আরম্ভ শেষে সমাপ্তিসূচক পুস্তিকায় গ্রন্থের নাম থাকার কথা কিন্তু প্রথম ও শেষ পাতা না পাওয়ায় পুঁথির নামকরণ এর সমস্যা দেখা দেয় ।আবিষ্কর্তা বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে এর নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণের ভুমিকায় নামকরণ সম্পর্কে বসন্তরঞ্জন বলেছেন,' দীর্ঘকাল যাবৎ চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম এতদিনে তার সমাধান হইয়া গেল ।আমাদের ধারণা আলোচ্য পুঁথিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হইল ।'বসন্ত রঞ্জনের জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন-'কথিত হয় চন্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন খেতুরির এক বার্ষিক উৎসবে চন্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হইয়া ছিল অবশ্য কীর্তনাঙ্গে।' আলোচ্য পুথির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্তন, তাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামকরণ অসমীচীন নয়।

তবুও বহু পন্ডিত ব্যক্তি পুঁথির নাম পরিবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। বইটি প্রকাশের ১১ বছর বাদে গ্রন্থটির নামকরণ নিয়ে প্রথম সংশয় প্রকাশ করেন রমেশ বসু ।এরপর দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ, নলিনীনাথ দাসগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বিমানবিহারী মজুমদার ,অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামকরণে আপত্তি জানান। নামকরণ সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে যখন বসন্তরঞ্জন ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণের পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত একটি চিরকুট ছাপিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল," শ্রী নারায়ন নম(?) শ্রী শ্রী আচার্য প্রভু। শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ,শ্রীকৃষ্ণসন্দবের ৯৫ পত্র হইতে

এক সত দস পত্র পরজন্ত/একুনে ১৬ ষোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রী শ্রী মহারাজা/হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন সন ১০৮৯(?)...তাং ২১ অগ্রহায়ন। গুং কৃষ্ণ পঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ভ.১৬ পত্র দাখিল হইল।"

এর ফলে অনেকে মনে করলেন যখন পুথির ভিতরে এই চিরকুট পাওয়া গেছে তখন পুঁথিটির নাম ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নয় 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ'। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।আর এক গোষ্ঠীর মতে কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হতে পারে না কারণ 'কীর্তন' শব্দটি কীর্তি, খ্যাতি বা যশ বোঝায়। তাই আদিরসাত্মক এই গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হতে পারে না। কিন্তু 'কীর্তন' শব্দটির অর্থ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে 'কীর্তন 'শব্দে ঘোষণা, কথন, বর্ণন, গুণকীর্তন ইত্যাদি অর্থ বুঝিয়েছেন। রাধা কৃষ্ণ লীলা বর্ণনা, এই অর্থে কীর্তন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি দিয়ে সম্পাদক কিছু ভুল করেননি। দ্বিতীয় পর্বে যারা বলেন গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' তাদের মত ঠিক নয়। গ্রন্থের মধ্যে আলগা কাগজের লেখা একটি পাতা থাকলে কখনোই সেটি গ্রন্থ নাম উল্লেখ করে না। তাছাড়া যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ৯৫ থেকে ১১০ এই ষোলটি পাতা ধার নেবেন তিনি কেন সম্পূর্ণ খণ্ড ধার না নিয়ে মাঝের কিছু পাতার করবেন কেন! কৃষ্ণ পঞ্চানন যে পাতাগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে ছিল 'ভারখন্ডের' শেষ দিকের কয়েকটি গান। সম্ভবত গোটা 'ছত্রখণ্ড' ও 'বৃন্দাবনখণ্ড'এর প্রথমদিকের কয়েকটি গান। গ্রন্থাগারে পুঁথির ব্যাপারে এত সর্তকতা গ্রহণ করা হতো সেখান থেকে পুঁথির ১০৪-১১১ সংখ্যক পত্র হারিয়ে গেল কি করে ! আসলে শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন মহারাজার জন্যে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' থেকে যে ষোল পাতা ধার নিয়েছিলেন তা জীবগোস্বামী রচিত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ এর, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নয়। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদেরও মনে হয় পুঁথির আনুমানিক নাম 'কৃষ্ণধামালী' বা 'রাধাকৃষ্ণচরিতবিলাস' বা 'রাধাকৃষ্ণপ্রেমামৃত' না হয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হওয়াই যথাযথ।

যে সব গবেষক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' থেকে 'শ্রী' বাদ দিতে চান তাদের বিরুদ্ধে বলার কথা এই যে ,মধ্যযুগ যেহেতু সব সাহিত্য দেবকেন্দ্রিক এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' প্রথমেও আছে পুরাণের উক্তি ও কৃষ্ণের কথা তাই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি যথাযথ।

৮.৪। রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত হওয়ায় এটি কখন রচিত জানা যায় না। তবে গ্রন্থের আভ্যন্তরিণ সাক্ষে,লিপি দেখে, কাগজ দেখে গবেষকরা এর রচনাকাল ও পুঁথির লিপিকাল অনুমান করেছেন । 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানতে পারি চৈতন্যদেব চন্ডীদাসের পদ পাঠ করতেন। সুতরাং চন্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের কবি। বড়ু চণ্ডিদাসের কাব্যে আদি রসালো, তাই এই ধরনের কাব্য চৈতন্যদেব পাঠ করতে পারেন না বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মত চৈতন্যদেব যার গান শুনতেন তিনি পদাবলী চণ্ডীদাস। চৈতন্যদেব যদি এ কাব্য পাঠ করতেন তাহলে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক অনুলিপি পাওয়া যেত এবং এর কাব্য বৈষ্ণবরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অবশ্যই চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের কাব্য তা না হলে এটি অন্যভাবে লেখা হত।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থের ভাষা বিশ্লেষণ করে বলেছেন "বইখানি আলোচনা করে আমার ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে এর ভাষা ১৪০০থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের এ ধারে কিছুতেই হতে পারে না।" সুকুমার সেন ' ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন "বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর পুঁথি তেমন পুরনো না হইলেও মূলে হস্তক্ষেপ বেশি না পড়ায় আদি মধ্য বাংলার পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায়'। সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের' প্রথম খন্ডে বলেছেন "সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর বলে অনুমান করেছেন ,এ অনুমান এমন বিশ্বাসে পরিণত অতএব অপরিতক্ত।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি মধ্যযুগের কাব্য।

পুঁথির লিপি বিচার করে গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কাব্যটিতে তিন ধরনের হস্তাক্ষর দেখা যায়- প্রাচীন হস্তাক্ষর, প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি ,অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়েছে তা বর্তমান অথবা খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন। বসন্তরঞ্জন যে পান্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন তা ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত বলে মনে হয়। রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ বা তার কিছু আগে। অর্থাৎ মূল গ্রন্থের রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী। গ্রন্থটির লিপিকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। সুকুমার সেনের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে হতে পারে না। যদিও এই মত অনেকেই স্বীকার করেননি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত ভাষা পঞ্চদশ শতাব্দীর অধিক পরবর্তী নয়। ভাষাতাত্ত্বিকদের যুক্তিও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি রচনা কাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

৮.৫। কাব্যপরিচয়

ত্রয়োদশ খন্ডে বিন্যস্ত বড়ুচন্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। চর্যাগীতির পর প্রায় আড়াইশ বছর বাংলা সাহিত্যের প্রায় বন্ধ্যা যুগ। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে বাংলার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে নতুন করে বাংলা সাহিত্য লেখা সম্ভব হয় নি তবে ভিতরে ভিতরে সাহিত্য চর্চার ধারাটি ফল্গুনদী র মতো যে বহমান ছিল , তা স্বীকার করতেই হয়। সেই আয়োজনে আমাদের লোকজীবন অঙ্গীভূত , আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন প্রয়াসের মধ্যে লালিত হতে হতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় উজ্জ্বলরূপে কৃষ্ণ কথা আত্মপ্রকাশ করে।রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে কাব্য রচনার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান। ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বিস্তৃত বর্ণনা আছে, আছে এক প্রিয়তমা ব্রজবধুর কথা । কিন্তু কোথাও স্পষ্ট করে রাধার নাম উল্লেখ নেই। অবশ্য কেউ কেউ শ্লোকে উল্লেখিত “অনোয়ারাধিতে

নুনং” অংশে রাধা নামের অস্তিত্ব সন্ধান করে থাকেন । ” খিল হরিবিংশে” ও কৃষ্ণের রাসলীলা র বর্ণনা এবং তাঁর এক প্রিয়তমা প্রধান গোপীর উল্লেখ আছে। একইভাবে বিষ্ণু পুরাণের ও নামোল্লেখ করা যায়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ” পদ্মপুরান , মৎস্যপুরান , বায়ুপুরান , বরাহপুরান , ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ”। এগুলিতে রাধা কৃষ্ণ উভয়ের উল্লেখ শুধু নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা লভ্য।

প্রাচীন সাহিত্যে রাধা কৃষ্ণ কে একত্র দেখতে পাই “ গাথা সপ্তাশতি ” “কবিন্দ্রবচনসমুচ্চয়” “ প্রাকৃত পৈঙ্গল ” কৃষ্ণকর্ণমৃত” প্রভৃতি গ্রন্থে। এছাড়া ভট্ট নারায়ণের “ বেনী সংহার” নাটকের নন্দিশ্লোক , আনন্দবর্ধনের “ধ্বন্যালোক” গ্রন্থেও রাধাকৃষ্ণের বিষয়ক শ্লোক আছে। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সর্বজন পরিচিত গ্রন্থ হলো জয়দেবের “গীতগোবিন্দম ” এটি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক একটি সম্পূর্ণ কাব্য । দ্বাদশ সর্গ সমন্বিত এই কাব্যে রাধাকৃষ্ণ লীলা র যে বিস্তৃত বর্ণনা বিধৃত তার দ্বারা পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বড়ু চণ্ডীদাস নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছিলেন । লীলারস ও কাব্যরস উভয়দিক থেকে জয়দেবের “গীতগোবিন্দম” কোনো আকস্মিক রচনা নয়, তেমনই বড়ুচন্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” ও । ” গীতগোবিন্দম ” সংস্কৃতে লেখা। কিন্তু এর বাগভঙ্গী বাংলার কাছাকাছি। ” বিলাস কলাকুতূহল ” ও হরিস্মরণ এর যুগলবন্দী এই কাব্য। উপরন্তু জয়দেব ছিলেন লক্ষনসেনের রাজ সভাকবি। তিনি ” গীতগোবিন্দ” রচনা করে বৈষ্ণবধর্ম কে প্রেম মার্গে নতুন এক ঐতিহ্য দান করেন । কিন্তু বড়ুচন্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” এ বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী প্রাকৃত জীবনরসে পূর্ণ , কিন্তু বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে , শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচিত হয়েছে , যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে সেই প্রণয় কাহিনীরই সমধিক স্ফূর্তি ঘটেছে।

তুর্কি আক্রমণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা র প্রাক্কালে বাংলার রাষ্ট্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিস্থিতি তে বাঙ্গালীর সাহিত্য চর্চার ধারাটি মোটামুটি স্তব্ধ ছিল।

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ স্বাধীন বাংলার পত্তন করলেও সমাজজীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেই সময়ের কাব্য। আধ্যাত্মিক আদর্শ অপেক্ষা নরনারীর জৈবিক তৃষ্ণা ও কামনা বাসনার লালসাবৃত্তি “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্যে প্রাধান্য পেলেও মানবিক আবেদন এবং জীবন রসের দিক থেকে এই কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী সংযোজন।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে , বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর গোয়ালঘরে মাচার উপর ধামাভরা একরাশ পুঁথির মধ্যেথেকে এই গ্রন্থের পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। গ্রন্থটির বিষয় বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তারই সম্পাদনায় পুঁথিটি প্রকাশিত হয়। এর প্রথম , মধ্য ও শেষাংশের কয়েকটি পাতা পাওয়া যায় নি । তাই কাব্যে নাম ও পরিচিতি অজ্ঞাত থেকে গেছে। বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা বলে আবিষ্কারক এর নাম দেন “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” । তাছাড়া পুঁথির অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ নামাঙ্কিত একটু চিরকুট তিনি পান । কাব্য মধ্যস্থিত ভনিতা অংশটি লক্ষ্য করে কবিকে বাশুলি দেবীর পূজক বলে মনে হয়। ভণিতায় কবি চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস বলে পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুঁথিটির লিপি বিচার করে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে কোনভাবেই কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে রচনার নয়। তার মতে এখানে তিন প্রকার হস্তাক্ষর আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হয় বলে তিনি মনে করেন। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক বৈজ্ঞানিক লিপির সাহায্যে এই বিষ্ণুপুরাণের পুঁথির অক্ষর এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অক্ষরের তুল্যমূল্য বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ১৫০০ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি অনুলিখিত হয়েছে ।ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীনতা বিচার করে কাব্যটিকে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলেছিলেন। ডঃ শহিদুল্লাহ এটিকে সমর্থন করেন কিন্তু পুঁথির কাগজ ও বিচার করে ডঃ সুকুমার সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের লিখিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন

।বাংলা সাহিত্যের প্রথম খন্ডে সুকুমার সেন তার মতের সমর্থনে আরো দেখালেন যে অতীতে প্রাচীন ছাঁদের অক্ষরের সঙ্গে একই পাতায় অর্বাচীন ছাঁদের অক্ষর পাওয়া যায়। সুতরাং অক্ষরের ছাঁদের দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয়না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়,সেগুলি হল বাঁকুড়া, মানভূম, ধলভূম অঞ্চলের ভাষাতেও লভ্য। তাছাড়া ফার্সি 'মজদুর' শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যোগে গঠিত 'মজুরি' ও 'মজুরিঅ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতাকে দুর্বল করেছে বলে তিনি মনে করেন।

পুঁথির অক্ষর ,কাগজ কালি ও কাব্যে ভাষা ছাড়াও আরেকটি পন্থা অবলম্বন করে কাব্যের প্রাচীনতা প্রমাণ করা হয়ে থাকে তাহলে কাব্যটি চৈতন্য পূর্ববর্তী না চৈতন্য পরবর্তী তার বিচার। চৈতন্যদেব কোন এক চন্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য পাঠ করতেন বা শ্রবণ করতেন ।ডঃ সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুতুল বাজির অভিনয় স্বয়ং কানাইয়ের নাটশালায় চৈতন্যদেব প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন তার 'নটনাট্য ও নাটক' গ্রন্থে। চৈতন্যদেব পাঠিত বা শ্রুত কাব্যটির রচয়িতা যে চন্ডীদাস, তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস হন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন নিঃসন্দেহে প্রাচীনতার বিচারে চৈতন্য পূর্ব যুগের কাব্য । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদি রসের প্রাচুর্য কাব্যটিকে আদৌ চৈতন্যর কাছে পৌঁছে ছিল কিনা এ নিয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ।তবে মতামত ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল।

এই কাব্যের ভাষা প্রাচীনতম বাংলা ভাষা। এটি লোক সমাজে বিশেষ ভাবে প্রচারিত ছিল না । গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব থেকে বহু দূরবর্তী রচনা এটি । অভিজাত ও মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তির অধিকারে কাব্যটি সীমাবদ্ধ ছিল বন বিষ্ণুপুরের রাজ পরিবারের (এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মালম্বী) গ্রন্থাগারিক রক্ষিত থাকায় এতে আধুনিকতার হস্তক্ষেপ পড়েনি। এই কাব্যে পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যযুগীয় আদিপর্বে মূল লক্ষণগুলি বর্তমান। ডক্টর সুকুমার সেন এর মধ্যে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভাষার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। ডক্টর চিত্তরঞ্জন কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত জীবন তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের

বিস্ময়কর সঙ্গতি আবিষ্কার করেছেন। তবে যাই হোক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচীনতা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সব পণ্ডিতেরা প্রায় একমত। তাই কাব্যটি রচনা কাল চতুর্দশ শতাব্দীর কিছু পরবর্তী হওয়াই সঙ্গত বলে মনে হয়। বহু শব্দের অপভ্রংশএর ক্ষীণ প্রভাব লক্ষণীয়।

কাহিনী ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন চতুর্দশ শতাব্দী হিসেবে বিবেচ্য। আদি রসের প্রাধান্য যুক্ত এই কাব্যে জীবনের আদর্শ ও গ্রাম্যতা স্থূলতার আধিক্যে জন্মখন্ড-উল্লেখিত পৌরাণিক প্রেক্ষাপট হয়েছে এবং রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রে উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক সংলাপের উপর মূলত এর কাব্য গঠিত হয়েছে রাধা প্রথমে কৃষ্ণ বিতরাগি হলেও পরে নানা ঘাত প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের স্তর পেরিয়ে তিনি কৃষ্ণ অনুরাগিণী তে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু পদাবলীতে প্রাপ্ত মহাভাব - স্বরুপিনী আত্মনিবেদিত রাধাকে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ ও অনুরাগ পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে একেবারে সাদৃশ্যহীন। কারণ এখানে দেহ চেতনারই প্রাধাণ্য কৃষ্ণ যে ভাষায় রাধার সঙ্গে কথা বলেছেন তা শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য কেন মধ্যযুগের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় না। সর্বোপরি তিনি বলপূর্বক রাধার সতীত্ব লুণ্ঠন করেছেন এবং নিষ্ঠুরভাবে তাকে ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেছেন এক কথায় রাধার প্রেম ও নারীত্ব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ কর্তৃক যে ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তাতে সন্দেহাতীত ভাবে একথা বলা যায় যে কাব্যটি কিছুতেই চৈতন্য আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ের নয়।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা সহ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য প্রকাশ করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা চর্যাপদ এর পরবর্তী স্তরে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর খাঁটি বাংলা ভাষা। তিনি তার 'অরিজিন অন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ '(O.D.B.L) গ্রন্থে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের চর্চার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান নির্দেশ করে ব্যাকরণগত বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল চতুর্দশ, পঞ্চদশ শতাব্দীর। আবার চর্যাগীতির রচনাকাল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আগে হলেও এরপর এর পুঁথি লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায় বলে কবির পরিচয় জানা যায়নি। কারও কারও মতে তিনি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাসুলির সেবক ছিলেন। সংস্কৃতে তার অবাধ অধিকার ছিল, সংযোজিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি তারই পরিচায়ক। এছাড়া কবি পুরাণ পারঙ্গম ছিলেন। সমগ্র কাব্যটি পাঠ করলে তা সন্দেহাতীত ভাবে বোঝা যায় গভীর সামনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বাদর্শ ছিলনা, ছিলনা কোন গোষ্ঠী চেতনা তাই স্বাধীনভাবে তিনি কাব্য রচনা করেছেন । সম্ভবত তৎকালে প্রচলিত কৃষ্ণকথাকে তিনি জনক মনরঞ্জক রূপে গড়ে তুলতে আদি রসের প্রাধান্য দানেই অধিক আগ্রহী হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। পদাবলী সাহিত্যের রাগানুগাভক্তি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় কোমল কান্ত রূপের সন্ধান বড়ুচন্ডীদাসের কাব্যে পাওয়ার কথা নয়। তবে এখানে বৈধ ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপ বা তার শক্তিমত্তার দিকটি একটি সুপরিস্ফুষ্ট বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। সুতরাং বিষয়বস্তু ভাবাদর্শ ও যুগ প্রবণতা বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

৮.৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর কাহিনী

বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগের সর্বপ্রথম আখ্যানকাব্য। তেরোটি খন্ড বিশিষ্ট এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হলো রাধা কৃষ্ণের প্রেম। কংস নিধনের জন্য মর্ত্যে আবির্ভূত কৃষ্ণ বড়াইয়ের মুখে রাধার রূপের কথা শুনে কিভাবে আকুল হলেন এবং রাধা লাভের জন্য বড়াইকে দূতীতে পরিণত করলেন, তা কবি খুব বিশ্বস্ত ভাবেই বর্ণনা করেছেন এই কাব্যে। রাধা যেহেতু আত্ম স্বরূপ বিস্মৃত ও আইহন পত্নী তাই কৃষ্ণের প্রণয় সম্ভাষণে সাড়া দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং সেখানেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। কারণ কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন। রাধা বড়াইয়ের মাধ্যমে কৃষ্ণ প্রেরিত কর্পূর তাম্বুল পদদলিত করেন এবং নিজের কুল শীল মান-মর্যাদার প্রসঙ্গ তুলে বড়াই কে চপেটাঘাত করেন। কৃষ্ণের প্রতি তীব্র উপেক্ষা ব্যর্থ হওয়ার মধ্যেই রাধার মনে আজন্ম লালিত সতীত্বের সংস্কার সক্রিয় ছিল। কিন্তু কাম চেতনায় অন্ধ

কৃষ্ণের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। তার ওপর তিনি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ শাসিত সমাজের একজন পুরুষ। তাই স্বেচ্ছাচারী হতে তার বাধা কোথায়? এদিকে রাধার প্রহার ও ভর্ৎসনায় বড়াইর আত্মসম্মান ও আহত হয়েছে। তাই বড়াই ও কৃষ্ণ রাধাকে এই প্রত্যাখ্যানের উচিত শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করতে থাকে। ঠিক হয় রাধার শাশুড়ির কাছে গিয়ে বড়াই তাকে দই দুধের পসরা নিয়ে মথুরার হাটে যাওয়ার প্রস্তাব দেবে এবং এর কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির কথা বলবে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা কে না চায়? শ্রীরাধার শাশুড়ি সম্মত হলেই মথুরার উদ্দেশ্যে রাধাকে গৃহের বাইরে আনা সম্ভব হবে। পরিকল্পনা মতো কাজ করেছে বড়াই এবং তাতে সফল হয়েছে। দই দুধের পসরা নিয়ে রাধা বড়াইর তত্ত্বাবধানে অন্য গোপযুবতীদের সাথে মথুরা অভিমুখে রওনা দিয়েছেন। তাম্বুল খন্ডের এই ঘটনার পরই দানখণ্ডের সূচনা যেখানে কৃষ্ণ মহাদানী সেজে রাধার শরীরে প্রতীতি অঙ্গের কুৎসিত ব্যাখ্যা করবেন।এবং রাধার বয়স এগারো বছর হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে বারো বছরের দান চাইবেন। দান দিতে অপারগ বালিকার দেহ ছল-বল-কৌশলের দ্বারা সম্ভোগ পর্যন্ত করবেন কৃষ্ণ। একাকিনী প্রান্তরে অসহায়া বালিকা তার যৌনাখস্মের আগেই যৌবন হারালেন। তার সব প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার চেষ্টা বলশালী, কামনালোলুপ পুরুষের পরাক্রমের কাছে পরাজিত হল।

কাব্যের প্রথম খন্ড জন্ম খন্ড ।এর যে পৌরাণিক ও ঐশী সত্তার পরিচয় প্রকাশিত তার সঙ্গে পরবর্তী খন্ড গুলিকে মেলানো যায়না ।জন্ম খন্ড কৃষ্ণের আবির্ভাবের ভাগবতীয় ঘটনা সন্নিবেশিত অংশের অত্যাচার থেকে ধরিত্রীর জন্য ভগবান নারায়ন কৃষ্ণ রূপে দেবকীর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করলেন আর নারায়ন পত্নী লক্ষ্মী কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য মর্ত- এ সাগর গোয়ালঘরে পদুমার উদরে রাধা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। আইহনের সঙ্গে রাধার বিবাহ হলেও দেবতাদের ইচ্ছায় আইহন হলেন নপুংসক । রাধার তনুলীলা ধীরে ধীরে সৌন্দর্যের শতদল রূপে প্রস্ফুটিত হলে আইহনের ইচ্ছায় তার মা রাধার মায়ের কাছ থেকে তার পিসিকে নিয়ে এলেন রাধার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থাৎ হলো রাধার মায়ের পিসি রাধার মাতামহী। জন্মখন্ড তাকে দায়িত্বশীল রমণী

হিসেবে উপস্থাপিত করা হলেও মোটামুটি ভাবে তাম্বুল খন্ড থেকেই নিজের ভূমিকা বদল করেছে পরিণত হয়েছে কৃষ্ণের দূতীতে।

"দান খন্ড "পরবর্তী "নৌকা খন্ড" রাধাকে নিয়ে বড়াই অন্যপথে মথুরায় নিয়ে গেলেও কৃষ্ণ নৌকার মাঝি সেজে যমুনার ঘাটে অপেক্ষা করতে থাকেন ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে চিনতে না পেরে রাধা নৌকায় উঠে বসেন এবং মাঝ নদীতে নৌকা টলমলিয়ে কৃষ্ণ পুনরায় রাধার যৌবন লুণ্ঠন করেন কিন্তু এবার দেহ চেতনার পথ ধরে রাধার মনে প্রেম চেতনা জাগ্রত হয় ফলে বাড়ির কাছে তিনি এবার কৃষ্ণের প্রশংসা করেন এখন থেকে রাধা কিছুটা কৃষ্ণমুখী।

"ভার খন্ডে" মিলন প্রত্যাশী কৃষ্ণ ভার বাহকের বেশ ধরেছেন এবং রাধাও তাকে মৃদু প্রশ্রয় দিয়েছেন ।মিলনের আশ্বাস দিয়ে তাকে রাধা তার দুই দুধ এর পসরা পর্যন্ত বহন করিয়েছেন কৃষ্ণ অনভ্যাসবশত ভার ফেলে দিতে উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এই বাকযুদ্ধে ভারখণ্ডের সমাপ্তি। অবশ্য এখানে রাধা ফেরার পথে কৃষ্ণকে মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা না করায় ছত্র খণ্ডের প্রথম থেকেই রাগান্বিত কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই খন্ড অনেক বাকযুদ্ধ আছে তবে বড়াইয়ের মধ্যস্থতায় অনিচ্ছুক হয়েও কৃষ্ণ রাধার মাথায় ছত্র ধারণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠা না থাকায় ছত্রখন্ডের শেষাংশ জানা যায়নি।

"বৃন্দাবন খণ্ডে" কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলনের জন্য বৃন্দাবনে এক মনোরম পুষ্প কুঞ্জ রচনা করেন। এই খন্ড রাধা প্রথম কৃষ্ণ দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা নিজে থেকে উদ্যোগী হন এবং তাই পরিকল্পনামতো মথুরার হাতে যাওয়ার আয়োজন করে বড়াই। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ অন্য গোপন যুবতীদের সঙ্গে মিলিত হলে রাধা মানিনী হন। এই প্রথম প্রেমে জাগ্রত অধিকারবোধ ও অভিমানের জায়গা থেকে রাধার বৃষ্টি হয় অশ্রুসজল পরে কৃষ্ণ সক্রিয় চেষ্টায় অভিমান আনতে রাধাকৃষ্ণ কোন যে মিলিত হন ভাগবত এর রাসলীলা ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ এর প্রভাব পড়েছে।

"কালিয়দমন খন্ডে" কালীদহে কালীয় নাগকে দমন করেছেন কানাই রাধা ও অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে জলকেলি করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কালীয় নাগের দংশনে তিনি আত্ম স্বরূপ বিষয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন ।পরে বলভদ্র দশাবতার স্তোত্র পাঠে তিনি বিস্ফোরণের স্থান থেকে জাগ্রত হয়ে কালীয় নাগ দমন করেন কাব্যের এই অংশে রাধা সর্বসমক্ষে কৃষ্ণকে পরানপতি বলে উল্লেখ করেছেন। যমুনা খন্ড রাধাকৃষ্ণ ও অন্য গোপীদের জলকেলি বর্ণিত কিন্তু ছলনাময় শ্যাম জলকেলি করতে করতে যমুনার মধ্যে পদ্মবনে আত্মগোপন করেন তারপর রাধা ও অন্য গোপীরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি জল থেকে উঠে কদম বৃক্ষে আশ্রয় নেন এবং পরদিন প্রভাতে রাধা ও অন্য যুবতীরা তাদের বস্ত্র যমুনার ঘাটে রেখে অন্বেষণে জলের মধ্যে নামলে কৃষ্ণ তাদের বস্ত্রহরণ করেন পরে বিবস্ত্র রাধার কাতর অনুরোধে বস্ত্র ফিরিয়ে দিলেও হারটি লুকিয়ে রাখেন কৃষ্ণ তারই অনিবার্য পরিণতিতে হারখণ্ডের অবতারণা যেখানে রাধা কৃষ্ণ জননী যশোদা কানুর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করেছেন ফলে মা যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণ তিরস্কৃত হন এবং ছলনাময় বচন বা বাকচাতুর্য দ্বারা রাধা কে দোষী ও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে সচেষ্ট হন।

বানখন্ডে কৃষ্ণ-রাধার প্রতি রীতিমতো ক্ষুব্ধ কারণ রাধা যশোদার কাছে তার নামে নালিশ করেছেন তাই এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি রাধাকে মদন বাণ নিক্ষেপে মূর্ছিত করেন এ ব্যাপারে প্রাথমিক ভাবে তিনি বড়াইয়ের সমর্থন পান। কিন্তু মূর্ছিত রাধার মূর্ছা ভঙ্গ হয় না দেখে বড়াই কৃষ্ণকেই তিরস্কার ও দায়ী করতে থাকে, অবশ্য কৃষ্ণের চেষ্টাতেই রাধা শেষপর্যন্ত চেতনা ফিরে পান এবং উভয়ের মিলন হয়।

এরপর "বংশীখণ্ড" এটি কাব্যের দ্বাদশ খন্ড। খন্ডের শুরুতেই রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্য কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে বসে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে তথাপি রাধা তাতে বলেন না তখন কৃষ্ণ একটি মোহন সুন্দর বাঁশি নির্মাণ করেন যা স্বর্ণনির্মিত ও হীরকখচিত। কিন্তু বাঁশিটি তিনি নেপথ্যে বসে বাজান রাধার সামনে আসেন না। তাই বলছি ধ্বনি শুনে রাধা আকুল হলেন তার রন্ধন কার্য বিপর্যস্ত হলো নিজে অন্তরে জাগ্রত প্রেম ও সংসার তথা সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা আর তার পক্ষে সম্ভব হলো না তার

অশ্রু প্লাবিত রূপ ও আত্মহননের ইচ্ছা দেখে বড়াই কৃষ্ণ অনুসন্ধানে তৎপর হলেন। তখন সে নিদ্রাউলি মন্ত্রে কৃষ্ণকে ঘুমপাড়ালে রাধা সেই অবকাশে কানুর বাঁশি চুরি করেন। নিদ্রাভঙ্গে কৃষ্ণ ক্রন্দনাকুল হন এবং রাধা ও অন্যান্য ষোলশত গোপীর কাছে বাঁশি টি প্রার্থনা করেন। বেশ কিছু বাদানুবাদের পর রাধা-কৃষ্ণকে বাঁশি ফিরিয়ে দিলে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু রাধার সঙ্গে মিলনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন না।

সবশেষে রাধাবিরহ। এখানে কৃষ্ণ রাধার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্যদিকে রাধা কানুর জন্য নিতান্ত ব্যাকুল তিনি স্বপ্নে শ্যামের দর্শন পান কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন হয় না পরে বড়াইর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাধাকৃষ্ণের দেখা হলেও তিনি রাধাকে পূর্বের প্রত্যাখ্যানের কথা স্মরণ করিয়ে বারবার তিরস্কার করতে থাকেন । রাধার অনুনয় ক্ষমা প্রার্থনা ও বড়াই র বারংবার অনুরোধে শেষপর্যন্ত কৃষ্ণ-রাধার সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু রতিশ্রান্ত রাধা নিদ্রামগ্ন হলে বরাইয়ের হাতে রাধাকে সমর্পণ করে কৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করেন ।এরপর রাধার তীব্র আকুলতায় , বড়াইর শত অনুরোধেও কৃষ্ণ আর রাধার কাছে ফিরে আসেননি। কারণ এখন তার রাধার নাম শুনলে আর যেতে ইচ্ছে করে না- "জায়িতে না ফুরে মন নাম শুনি তারে" ।

ফলে রাধার জন্য পড়ে থাকে অনন্ত বিরহ। কাব্যটি এখানে খন্ডিত ।এর সমাপ্তি অংশটুকু জানা না গেলেও কাহিনী ও চরিত্রের প্রকৃত বিচারে কাব্যটির বিয়োগান্তক পরিণতি যে স্বাভাবিক ও সংগত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ পালাটি রাধা বিরহ যার সঙ্গে খন্ড কথাটি যুক্ত নয় । অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে এটি শেষ পালা এবং কাহিনীকে সম্পূর্ণ করেছে তাই এটি খন্ড নয় সমাপ্তি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৌরাণিক আঁধারে মর্তকামনার ধূলি ধূসরিত জীবনের ঊষ্ণতাবহ কাব্য। কাব্যটি সম্বন্ধে রুচিহীনতা, গ্রাম্যতাদোষ , অশ্লীলতা ইত্যাদি অভিযোগ উত্থিত হয়। কিন্তু "বংশী খণ্ড" ও "রাধা বিরহ" কাব্যটি বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিক আবহ সৃষ্টি করেছে এবং পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের বৈষ্ণব প্রাথমিক অভিব্যক্তি ঘটে। দেহ চেতনার উর্ধ্বে প্রেমভক্তির আত্মনিবেদনের সুর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একদিকে আছে আখ্যানধর্মীতা অন্যদিকে নাটকীয়তা ও গীতপ্রাণতা । জয়দেবের গীতগোবিন্দের নাটগীতির ধারা প্রায় পুরোপুরি বজায় আছে এই কাব্যে। রাধা , কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রে একটি উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক সংলাপের মধ্য দিয়ে কাব্যকাহিনী অগ্রসর হয়েছে তাছাড়া আছে একটি নিটোল আখ্যানবৃত্ত। “তম্বুলখণ্ডে” কৃষ্ণের রাধার জন্য আকুল আগ্রহ, দানখন্ডে নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য রাধার তীব্র আকুলতা কিংবা বংশী খণ্ড ও রাধা বিরহ তে রাধার বিরহী চিত্তের হাহাকারে গীতিকাব্যিক সুরমূর্ছনা ধ্বনিত।

পৌরাণিক আদর্শ ও লৌকিক জীবন সংমিশ্রণে এই কাব্য অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। নাটকীয়তা গীতিময়তা ও আখ্যানধর্মীতা ছাড়াও এই কাব্যে আছে বিবৃতি মুখ্যতা। কাব্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত সংযোজক শ্লোক গুলি বিবৃতি মুখ্য তার পাশাপাশি ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালি সমাজ ভাগবত পুরাণ এর প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের বীরমূর্ত্তি সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেই শক্তিধর ভগবানের শক্তিমত্তার দিকটি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য প্রকাশ পেয়েছে । ভূভার হরণের জন্য ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু সমগ্র কাব্যে কংসনিধন অপেক্ষা রাধাসম্ভোগই বড় হয়ে উঠেছে। তার দেব চরিত্র লৌকিক জীবনের রক্তরাগে সঞ্জীবিত। এতে পৌরাণিক মহিমা ক্ষুন্ন হলেও কবি কিন্তু জন্মখন্ড জানিয়েছেন-

"কাহানজির সম্ভোগ কারণে।

লক্ষ্মীকে বুলিল দেবগণে।।

এবং দেবতাদের ইচ্ছায় রাধাস্বামী আইহন হয়েছেন নপুংসক। আবার শেষ পর্যন্ত কংস নিধনের জন্য কৃষ্ণ রাধা কে ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেছেন। রাধার সঙ্গে তার আচরণের রূঢ়তায় তুর্কি আক্রমণ অর্থ নীতিভ্রষ্ট কামাতুর উশৃংখল জীবনের ছবি স্পষ্ট। ফলে কাব্যটি পৌরাণিক পটভূমিতে লৌকিক জীবনরসের কাহিনী। পুরাণ ও পুরাণ বহির্ভূত বিষয় এ কাব্যে স্থান পেয়েছে কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হিসেবে। কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি প্রাকৃত অপভ্রংশ রচনায় প্রকীর্ণ লোকায়ত গ্রামীণ রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কাহিনী অনুসরণ করেছেন। রাধাকৃষ্ণ ও বড়াই কেউই ভাব বৃন্দাবনের

বাসিন্দা নন তারা রক্তমাংসের জীবন্ত সত্তায় আমাদের কাছে সমোপস্থিত । তথাপি কাব্যের উপসংহারে বিরহিনী রাধা আকুলতার বৈষ্ণব পদাবলীর মহাভাবস্বরূপিনী রাধার ভাববিহ্বলতা লক্ষণীয় হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন এদিক থেকে কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি ১৩ টি খন্ডে বিভক্ত । খন্ডগুলি হল জন্ম খন্ড, তাম্বুল খন্ড, দান খন্ড, নৌকাখন্ড, ভারখন্ড, ছত্রখন্ড, বৃন্দাবন খন্ড, কালিয়দমন খন্ড, যমুনা খন্ড, হারখন্ড,বানখন্ড, বংশী খণ্ড এবং রাধাবিরহ।

৮.৭। চরিত্র বিচার:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেহেতু আখ্যানকাব্য তাই এখানে চরিত্রের পূর্ণাঙ্গরূপে উদ্ভাসনই প্রত্যাশিত। অপ্রধান চরিত্র বেশকিছু থাকলেও মূল চরিত্র হিসেবে আমরা কৃষ্ণ ও রাধার পরই বড়াইয়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। বস্তুতপক্ষে বড়াই না থাকলে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে প্রেম বন্ধনে সহায়তা করার কেউ ছিলনা।

ক) রাধা

জন্মখন্ড-এ রাধাকে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী বলে পরিচয় দান করা হলেও এই রাধা কিন্তু সাগর ও পদুমার এবং আইহনের পত্নী রূপে আত্মপরিচয় আগ্রহী কারণ তিনি আত্ম স্বরূপ বিস্মৃতা । ফলে কৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষা নিজের আজন্মলালিত সতীত্বের সংস্কার দ্বারা অধিক চালিত হয়েছেন তিনি । সুতরাং কৃষ্ণের প্রেম আহ্বানে প্রথমেই সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে তারপরও তার মধ্যে ছিল আত্মসচেতনতা এবং আপন কুলশীল মান-মর্যাদার প্রতি দায়িত্ববোধ তাই কামাচার কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি বারবার বলেছেন -- " বড়ার বহুআরি আহ্মে বড়ার ঝি" । কৃষ্ণকেও সতর্ক করে বলেছেন -"রাজা কংসাসুরে মো এ করিব গোহারি।"

তথাপি কৃষ্ণের বল বিক্রম ও স্বেচ্ছাচারিতার কাছে রাধার সব প্রতিরোধ ভেসে গেছে। একাকিনী প্রান্তরে কৃষ্ণ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছেন তিনি । দানক্ষণ্ডে বলপূর্বক কৃষ্ণের সেই সম্ভোগ তৃষ্ণার ছবি আছে। আত্মপ্রতিরোধে অসমর্থ অসহায় বালিকা রাধা চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন আবার কখনো ক্ষোভে ঘৃণায় প্রতিবাদে জ্বলে উঠেছেন। তবু যখন কবি লেখেন-

"লোটা আঁ লোটাআঁ কাঁদে রাহী"

তখন মধ্যযুগের পুরুষশাসিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পরিবেশে নারীর অসহায়তার চিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।কিন্তু এই দেহ চেতনা থেকেই রাধার মনে শ্যামের প্রতি প্রেম চেতনা জাগ্রত হয় এবং ধীরে ধীরে তা পূর্ণ বিকশিত রূপ পরিগ্রহ করে বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ তে সেই পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। আসলে জন্মখণ্ডেই কবি দন্দ্বের বীজ প্রোথিত করেছেন রাধাকে আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করে। কারণ কৃষ্ণ জানেন তিনি নারায়ন এবং রাধা তারই পত্নী লক্ষ্মী, সেখানে রাধা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বড়াই যখন তাকে বলেছেন যে কৃষ্ণ দেবতা তার সঙ্গে প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হলে রাধা বিষ্ণুপুরে স্থান লাভ করবেন তখন রাধার উক্তি;

ধিক জাউ নারির জীবনে দহেঁ পসু তার পতি।

পরপুরুষের নেহা এ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতি।।

অথচ সেই রাধাই কালিয়দমন খণ্ডে কৃষ্ণকে সর্বসমক্ষে পরানপতি বলে ঘোষণা করেছেন বৃন্দাবন খন্ডে শ্যামের জন্যই অভিসারিকার বেশ ধারণ করেছেন বংশী খণ্ড কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শ্রবণে আকুল হয়ে বলেছেন -

কে না বাঁশি বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।

কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।

আর রাধা বিরহে ঐকান্তিক আকুলতা ও চিত্ত বিদীর্ণ হাহাকার তার কণ্ঠেই হয়েছে -

এভাহোঁ বড়াই মোর কর প্রতিকার

আনিআঁ দিআর মকে কাহ্ন একবার।।

অথচ ভাগ্যের অমোঘ বিধানে কৃষ্ণ তখন -রাধার প্রতি গততৃষ্ণ। কামতৃষ্ণ কৃষ্ণ একাধিকবার রাধার দেহ সম্ভোগে এখন আর তার প্রতি কোন আগ্রহ অনুভব করেন না। যদিও তিনি রাধার পূর্ব ব্যবহারের অজুহাত দিয়েছেন সর্বত্র তাই রাধার প্রতি বিতস্পৃহ কৃষ্ণের শেষ সিদ্ধান্ত-

"জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুনী তারে।।

ফলে রাধার অনন্ত অসীম বিরহের হাহাকারে এই কাব্যের সমাপ্তি রচিত হয়। বড়ুচন্ডীদাসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বিবর্তিত চরিত্র হিসেবে রাধাকে পূর্ণ পরিণত নায়িকায় পরিণতি দান। যা মধ্যযুগের অন্য কোন কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। পদাবলীর রাধার সঙ্গে এখানেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা পৃথক। তাছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও রাধা প্রেম এভাবে লাঞ্ছিত হয়নি।

খ) কৃষ্ণচরিত্র

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কাব্য হলেও এখানে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার গরিমাই অধিক। তবে একথা ঠিক যে কৃষ্ণ আছে বলেই রাধার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে । বিশেষত কৃষ্ণ যদি এরকম রূঢ় ও নিষ্ঠুর চরিত্রের অধিকারী না হতেন তাহলে তার বিপরীতে রাধার বেদনা এরকম তীব্রভাবে অনুভব করা যেত না এবং চরিত্রটিও এতটা গুরুত্ব পেতনা।

জন্মখন্ডে কৃষ্ণের আবির্ভাবের পৌরাণিক পটভূমি কবি উল্লেখ করেছেন - "কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাসে।" তাই দেব আকাশে সভা বসালেন এবং স্বর্গের নারায়ন মর্ত্যে কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হলেন ইনি আত্মসচেতন রূপে প্রথম থেকেই রাধাকে কামনা করতে লাগলেন । তবে তার আগে জন্ম খন্ডে ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে রোহিনী নক্ষত্র বর্ষণমুখর রাত্রি তে তার আবির্ভাব এর পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত। কৃষ্ণের অনুপম রূপ-লাবণ্যের বর্ণনাও কবি দিয়েছেন এমন শ্রীময় পুরুষ তাম্বুল খন্ড

থেকেই বড়াইর মুখে রাধার রূপ বর্ণনা শুনে তার প্রতি তীব্র আগ্রহ অনুভব করেছেন এবং বলেছেন -

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনী।

ধরিবাক না পারোঁ পরাণী বড়ায়ি ল।।

তারপর কাব্যের প্রায় অধিকাংশ খণ্ড জুড়ে রাধাকে পাওয়ার জন্য তার ছল বল ও কৌশল লক্ষ্য করা গেছে। তার ঐশী সত্তা ও কংস বধ এর মতো বৃহৎ কর্মের সম্ভাবনা কাব্যের কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। বরং সাধারণ মানুষের মতো তিনি তাঁর স্থূল কামনা-বাসনা গুলি ব্যক্ত করেছেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য নানা ছলনা ও বলপ্রয়োগে পাপ-পুণ্য বা নৈতিকতা অনৈতিকতার কোন প্রশ্ন কে গুরুত্ব দেননি। রাধা পরস্ত্রী জেনেও তিনি নির্লজ্জভাবে তাকে কামনা করেছেন তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নগ্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বলপূর্বক তার দেহসম্ভোগ করেছেন রাধা যখন তাকে বারংবার স্মরণ করিয়েছেন যে তিনি তার মামীমা ও কৃষ্ণ তার ভগিনী তাই তাদের মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্ক বা প্রেমের সম্পর্ক অনুচিত। তখন কৃষ্ণ নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিয়েছেন "নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী"। তারপর বড়াইয়ের মধ্যস্থতা ও পরামর্শে রাধার দেহসম্ভোগ এর জন্য নানা ষড়যন্ত্র ও ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন তিনি কখনো সেজেছেন মহাদানি, কখনো ভার বাহক, কখনো ঘাটিয়াল ,কখনো বা রাধার মাথায় ছত্রধারণ ও তিনি করেছেন। এসব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যবহার কোমল নয় বরং অনেক বেশি নিষ্ঠুর নির্মম হৃদয়হীন আবার একথাও ঠিক যে রাধার জন্যই এত রকম দেশ তিনি ধারণ করেছেন এত বাকচাতুর্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন বৃন্দাবনের ফল ও পুষ্পের কানন তৈরি বা কালীয়নাগ কে দমন অভিপ্রায়, কৃষ্ণের রাধার প্রতি আগ্রহ ও আকুলতাই প্রকাশিত। নিজে দেব অধীশ্বর হয়েও তিনি রাধার মাথায় ছত্রধারণ করেছেন । কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনার মনে ছিল তুর্কি আক্রমণ উত্তর নীতিভ্রষ্ট ভোগকামনাতোর উশৃংখল জীবন ও মানব স্বভাবের প্রতিফলন। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় পুরুষ হিসেবে কৃষ্ণ ওষুধের দ্বারা চালিত হয়েছেন এবং যেনতেন প্রকারেণ ও নারীর দেহ অধিকারে সচেষ্ট হয়েছেন । সমগ্র কাব্যে এই

আত্মম্ভরিতা ও আত্ম আস্ফালন প্রকাশিত। উপরন্তু প্রকাশিত তার স্বেচ্ছাচারী মনোভাব যখন এবং যতদিন পর্যন্ত মনে হয়েছে তিনি রাধার দেহসম্ভোগ করেছেন এবং যখন তার মনে এই দেহের প্রতি আসক্তি দূর হতে হয়েছে তিনি মথুরা গমনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন , তাও যদি তা শুধু কংস নিধনের মতো মহৎ উদ্দেশ্য হত। কৃষ্ণ মুখে "মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিন্যাস" । বললেও রাধাকে ত্যাগ করে যাওয়ার যে কারণগুলি জানিয়েছেন এবং যে ভাষায় রাধাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাতে তার চরিত্র মহিমা নিঃসন্দেহে ক্ষুন্ন হয়েছে জন্ম খন্ড ব্যক্ত কংসের অত্যাচার থেকে সৃষ্টি রক্ষার প্রতিশ্রুতি পূরণের মুহূর্তেও তার চারিত্রিক গরিমা রক্ষিত হয়নি। কারণ রাধা তার কাছে এখন নটকী ,গোয়ালি, ছিনারি , পামরি ছাড়া আর কিছু নন। রাধার যৌবন চেতনা যখন জাগ্রত হয়নি তখন কৃষ্ণ তার সেই যৌবন লুণ্ঠনে তৎপর ছিলেন আর যখন রাধার জীবনকুঞ্জে যৌবন সমাগত তখন কৃষ্ণ তাকে উপদেশ দিয়েছেন-

"এঁবে গোআলিনী কেহ্নে পোড়ে তোর মন ।

পোটলি বন্ধিয়া রাখ নহুলি যৌবন "।

যে মামিমা ভাগিনার সম্পর্কের কথা বলে রাধা কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চাইতেন কৃষ্ণ সেই সম্পর্কের উল্লেখ করে রাধাকে ব্যঙ্গ করেছেন "সবজন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার" । রাধার বিরহ বেদনা নিবারণের জন্য বাঁক চতুরা বলাই মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে তার অনুরোধ কৃষ্ণ সবসময়ই রক্ষা করেছেন এই শেষবার তিনি বরাই কে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই কথা বলে -

"আর তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।

বিথর বুলিয়া বড়ায়ি কাজ কিছু নাহি।।"

এই নির্মম আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। তথাপি মনে রাখতে হবে কংস নিধনের যে প্রতিশ্রুতি জন্মখন্ড তে ব্যক্ত হয়েছে তাই পূরণের জন্য রাধাবিরহ তে কৃষ্ণের মথুরা গমন ।বৈষ্ণব পদাবলীতে ও কৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছিলেন কিন্তু তা কাপুরুষের ভীরু

পলায়ন বা নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান নয় । বস্তুতপক্ষে বড়ু চন্ডীদাসের কৃষ্ণচরিত্র ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও পদাবলী সাহিত্যে থেকে একেবারে পৃথক ।এতে তার দৈবী মহিমা অনেকটাই ক্ষুন্ন হয়েছে কিন্তু মানুষ হিসেবে তার চরিত্র অনেকটাই আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

গ) বড়াই

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াই সম্পর্কে রাধার মায়ের পিসি সে রাধার বড় আই । কাব্যের প্রথমে 'জন্মখন্ডে' রাধার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইহনের ইচ্ছায় তার মা তাকে রাধার জননী পদুমা র কাছ থেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে কৃষ্ণের দূতীতে সে পরিণত হয় সে অতি বৃদ্ধা চেহারার বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন কবি -

শ্বেত চামর সম কেশে।

কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে।।

বড়াই কে অনেকে কুটনি জাতীয় চরিত্র বলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে নায়ক নায়িকার মধ্যে মিলন সাধনের জন্য দৌত্যকর্মে নিযুক্ত এরকম চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। বাড়ির মুখে রাধার রূপ যৌবন কথা শুনে কৃষ্ণ তার প্রতি আকৃষ্ট হন এই মিলন কার্যে বড়াই তাকে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। বস্তুতপক্ষে তার বাকচাতুর্য , বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সক্রিয়তা ও কর্মতৎপরতা চরিত্রটিকে উল্লেখযোগ্যতা দান করেছে ।সমগ্র কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ অপেক্ষা বড়াই অধিক সক্রিয় চরিত্র ।তার বাকচাতুরতায় রাধা-কৃষ্ণ ও আইহণ এবং আইহোন জননী পর্যন্ত হার মেনেছেন কার্যসিদ্ধিতে সে অত্যন্ত পটু ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। কৃষ্ণ কর্তৃক বড়াই চরিত্র এভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে

"রাম কাজে হনুমন্তা।

তেহেন আম্মার দুতা ।"

তারই পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্ভব হয়েছে এসব ক্ষেত্রে নাতনি রাধার সঙ্গেও ছলনা করেছে সে নিজে নেপথ্যে থেকে ও নির্লিপ্তির অভিনয় করে

কৃষ্ণের হাতে সঁপে দিয়েছে রাধাকে এর জন্য কোনো অনুশোচনা বা অপরাধবোধ ছিল না কারন সে কৃষ্ণের স্বরূপ জানতো এবং এও জানত যে রাধার স্বামী আইহন নপুংসক। তাই রাধা কে সে বলেছে "যৌবন সাগরে তোর কানহাই ভেলা"। রাধার কৃষ্ণের প্রতি অনাগ্রহ ও তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার এমনকি বড়াইকে তিরস্কার নীরবে মেনে নেয়নি বৃদ্ধা রাধা কে জব্দ করার পরামর্শ করেছে কৃষ্ণের সঙ্গে সুতরাং কৃষ্ণের প্রতি সে যে অত্যন্ত স্নেহশীল ছিল তা বোঝা যায় কিন্তু কৃষ্ণ যখন রাধাকে পুষ্পবানে আহত করেছেন তখন মূর্তি তাকে দেখে নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হয়নি বড়াইয়ের পক্ষে। সে কানু কে তিরস্কার করেছে এবং এরপরে বংশী খন্ডে ও রাধা বিরহে রাধার প্রতি কৃষ্ণের উদাসীনতা ও বড়াইয়ের সমর্থন পায়নি বরং কানহা র এই ব্যবহারে সমালোচনাও করেছে সে।

"বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোমার চরিত।

যাচিতে উপেখহ তহ্মে সে আমৃত"।

লক্ষণীয় যে রাধা যখন কৃষ্ণের জন্য মিলন আকুল হয়েছেন তখনো সেখানে বড়াই সক্রিয় আবার কৃষ্ণের রাধার জন্য মিলন আকাঙ্খার সময়ও বড়াই পাশে থেকেছেন। দুজনের কারোরই অশ্রুজল কাতরতা তাকে স্থির থাকতে দেয়নি কিন্তু এত করেও যখন শেষ রক্ষা হয়নি তখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেছে তার । কৃষ্ণকে সে স্পষ্টই বলেছে-

রাধিকা থাকিলি বসি আপনার ঘরে।

তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে।।

আসি যাই করি মোর আকুল পরাণে।।

দূতী হিসেবে তাঁর পরম চূড়ান্ত পরিচয় । তথাপি উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য কাব্যে দুটি চরিত্রের ঊর্ধ্বে স্নেহ মমতাময়ী নারী হিসেবেই বড়াই চরিত্র অধিক উদ্ভাসিত। সাধারণভাবে দুতীর দৌত্যকার্যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপার থাকে কিন্তু বড়াই যা

করেছে স্নেহের তাগিদেই করেছে কাব্যে নানা মুহূর্তে তার বাৎসল্য প্লাবিত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় এদিকে রক্তমাংসের স্নেহশীলা নারী হিসেবে তার যে পরিচয় কাব্যে উদ্ভাসিত তার মূল্য কোন অংশে কম নয়।

৮.৮। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমাজ চিত্র

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজের ছাপ কবির অজ্ঞাতসারেই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মধ্যযুগের কবিরা সেরকম সমাজমনস্ক না হলেও যে সমাজে তারা বাস করছেন তার ছাপ মুদ্রিত হয়েছে তার সাহিত্যে। মধ্যযুগের সমাজ ইতিহাসের বৃত্তান্ত জানার একমাত্র উপায় এই সাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যেও সমাজচিত্র সেইরূপ খুঁজে পাওয়া যায়।এখানে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র দেখতে পাই ।যে সমাজে জীবিকার তাগিদে মেয়েরাও বাড়ির বাইরে বেরোতে ।তাদের সঙ্গে থাকতো বয়স্কা নারী। যার রক্ষণাবেক্ষণে গোপীনীরা দুধ বিক্রি করতো ।বাল্য বিবাহ প্রথা চালু ছিল তার প্রমাণ ১১ বছরের কিশোরী রাধার আইহনের সঙ্গে বিবাহ। নারীর স্বাধীনতা মতামতের কোনো মূল্য সমাজ সংসারে ছিল না -"একালের বহু সব নহে সতন্তরী"।

শাশুড়ি, ননদি, স্বামী নিয়ে পারিবারিক জীবন ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী ছিল। সে জীবন ছিল সুখের আনন্দের। সেকালের পারিবারিক জীবনে খুব একটা অশান্তি ছিলনা। বধুর সর্বদা ঘর থেকে বেরোনো স্বাধীনতা ছিল না, যদিও তারা দুধ বিক্রি করতে মথুরার হাটে যেত ।বৃন্দাবনে রাধা বড়াই এর সাহায্য প্রার্থনা করেছে বাইরে হাটে যাওয়ার জন্য।তাদের পরিকল্পনা মতো গোপিনীদের শাশুড়িরা রাধার শাশুড়ির কাছে বলেছে তোমার জন্যই গোপ বধুদের হাটে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। অথচ সবাই নিজ নিজ বধূদের হাটে পাঠাতে চায়। তবে রাধার শাশুড়ি যদি রাধাকে হাটে না পাঠায় তবে সবাই মিলে তাকে এক ঘরে করবে। তোমার ঘরে কেউ অন্ন জল খাবে না ।আর গোপ সমাজের জীবিকাই যদি বন্ধ হয়ে যায় জীবন ধারণ করবে কিভাবে... একথা শুনে রাধার শাশুড়ি ভয় পেয়ে বধূকে হাটে পাঠাতে সম্মতি দেয় ।

"এ বল সুনিআঁ ডরে আইহনের মাএ।

প্রনাম করিআ বুইল তা সক্ষার পাএ।

কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর"।

একঘরে করার প্রথাটি এখনো অনেক স্থানে আছে। এভাবেই পাড়া-প্রতিবেশীরা সামাজিকভাবে বর্জন করে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবারকে শাস্তি দেয়। বাংলাদেশের সমাজ একদা এক ঘরে হওয়াকে চরম শাস্তি বলেই মেনে নিত।তখন গোপ জাতি ছাড়াও নাপিত, কুমোর, তেলি, স্বর্ণকার, বেনে, মাঝি প্রভৃতি ব্যক্তিদের পাশাপাশি চন্ডাল, যোগী, মজুর প্রভৃতি বিচিত্র বৃত্তির মানুষ বাস করত।রাজা অপরাধীর শাস্তি দিত ।রাধা-কৃষ্ণকে কংসের ভয় দেখিয়েছে।পথকর গ্রহণের জন্য রাজা ঘাটোয়াল নিযুক্ত করতেন। ঘাটোয়াল যাত্রীদের কাছ থেকে পাড়ির বিনিময়ে শুল্ক আদায় করত।

শাক, ভাজা,ঝোল, অম্বল এসব ছিল বাঙালির রোজকার আহার। সকলেই নিজ নিজ আবৃত্তি অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহ করত। সমাজে বিশেষ করে মেয়েদের কথাই বলা হয়েছে ।তারা দুধ,দই, ঘোল বিক্রি করতে যেত। যাত্রার আগে সবাই শুভাশুভ টিকটিকি, হাঁচি এসব মেনে চলত। কৃষ্ণ বাঁশি হারিয়ে ভেবেছে অশুভক্ষনে যাত্রা করেছে। রাধা ভাগ্য প্রতিকূল হলেই ভেবেছে তার যাত্রা অশুভক্ষনে শুরু হয়েছে -

"কোণ আসুভ খনে পাঅ বঢ়ায়িলোঁ।

হাঁছী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ''।।

এছাড়া ভাদ্র মাসের চতুর্থী রাত্রে জলের মধ্যে চাঁদ দর্শন, মাটিতে জলের আখর কাটা এসবকে অশুভ বলে মনে করা হতো। কেউ কিছু হারালে চণ্ডীর পুজো করতে হতো। বড়াই কৃষ্ণ কে খুঁজে পেতে রাধাকে চণ্ডীর পুজো করতে বলে...

"বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পুজা মানিআঁ তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।"

এর থেকে বোঝা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চন্ডী হারানো জিনিস খুঁজে দিতেন বলে মনে করা হত। ঠিক যেমন ছিল চন্ডীমঙ্গলে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় সমাজে শাক্তদেবী বিশেষভাবেই পূজিত হতেন। শুভ কাজে যাওয়ার আগে অনেকেই দেব-দেবীর পূজা করে বাড়ির বাইরে বেরোতেন ।মন্ত্র তন্ত্র ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করত লোকে। রাধা পুস্প

শরের আঘাতে চেতনা হারালে কৃষ্ণ ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে তার চেতনা ফিরিয়ে আনে।"ধেআন করিআঁ করে ঝাড়ে বনমালী।"

সেসময় নারী পুরুষ সকলেই কিছু কিছু গয়না পরত।

"পাএ মগর খাড়ু হাতে বলয়া

মাথে ঘোড়াচুলা..."

মেয়েরা হাতে বালা ,পায়ে নুপু কানে কুন্ডল ,গলায় হার পড়তো ।সিঁথিতে সিঁদুর দিত।পরিপাটি করে খপা বাধত। প্রেমের উপকরণ হিসেবে থাকতো ফুলের মালা, ফুল, কর্পূর বাসিত তাম্বুল। চর্যাগীতিতেও প্রেমের উপকরণ হিসেবে এসবের কথা বলা আছে।

"হিঅ তাঁবলা মহাসুহে কাপুর খাই

সুন নিরামনি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পহাই।।"

বারবার রাধা মাতুলানী সঙ্গে ভাগিনার সম্পর্ক গর্হিত বলে কৃষ্ণকে নিরস্ত করতে চেয়েছে। স্ত্রীবধ অপরাধের কাজ ছিল।

"শতেক ব্রাহ্মণ আর মায়িলে গকুল।

যে পাপ সেহো নহে তিরিবধ তুল।।"

পাপ পুণ্যের বোধ সেই যুগেও ছিল-

"পুন্য কইলে স্বগগ যাইএ   নানা উপভগ পাইএ

পাপেঁ হএ নরকের ফল।।"

সমাজে নারী-পুরুষের কলহ গালাগালি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সবই কবি চিত্রিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদিও প্রেম মূলক কাহিনী তবুও এই কাব্যে সমাজচিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। সচেতনভাবে না হলেও কবির অজান্তেই এ চিত্র কাব্যের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

৮.৯। কাব্য মূল্য

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বহিপ্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং গানই সাহিত্য। এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় জীবন চরিত্র ও মানব চরিত্র সাহিত্যকে কালজয়ী করে তার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে কবির আপন মনের মাধুরী । কবি কখনোই তার স্বদেশ ও স্বকালকে উপেক্ষা করে কাব্য রচনা করতে পারেন না। পারেন না যুব রুচি ও ব্যক্তিগত জীবনকে তুচ্ছ করতে ফলে সাহিত্য জীবনের একথা আমাদের মানতে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আখ্যানবস্তু ও চরিত্র কল্পনায় বাস্তব জীবনের বিশ্বস্ত ছবি আছে যা ভাগবতীয় ঐতিহ্য বিচ্যুত কিন্তু জীবন রসে সমৃদ্ধ। এই কাব্যে পৌরাণিক পটভূমি জন্ম খন্ড এবং সমগ্র কাব্যে সামান্যতম উল্লেখিত তাতে অবশ্য পাঠক হিসেবে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি হয় আনন্দদান তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আমাদের সেই চাহিদা পূরণ করেছে। রাধা নামের পল্লীর যে বধূটি কৃষ্ণ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছে তার সতীত্ব রক্ষার আকুল চেষ্টায় সে যুগের নারীর সমাজ ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং তার পাশাপাশি অসহায়তার পরিচয় প্রকাশিত। আর কৃষ্ণ পুরুষশাসিত সমাজের স্বেচ্ছাচারী পুরুষ। তুর্কি আক্রমণের উশৃংখল কামাতুর জীবনবোধের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এই কাব্যে নয় জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেছেন কবি। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা চিত্রণ এর মধ্য দিয়ে সে যুগের সমাজের ছবি পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথাবস্তু সামান্যই পুরাণ থেকে গৃহীত বাকি সব পুরান বহির্ভূত দেশে প্রচলিত রাধা কৃষ্ণের কাহিনী ও সমাজচিত্র কবি কল্পনাকে অধিক উজ্জীবিত করেছে।

সে যুগে পুরুষশাসিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান স্বাধীন ছিল না। শ্বশুর বাড়ি, স্বামী, শাশুড়ি, ননদি কে মান্য করে চলতে হতো তবে সমাজের কোন কোন স্তরে মেয়েদের আর্থিক প্রয়োজনে পথে বেরোতে হতো।

সাধারণভাবে বেচা-কেনার ক্ষেত্রে করি ব্যবহার করা হতো হাটে পণ্য বিক্রয়কারী কে শুরু করে দিতে হতো নদী পারাপারে অর্থ দিতে হতো। গোয়ালা ছাড়া ঘাটিয়াল দাণী ভারবাহক তেলি যোগিনী বা ভিক্ষুক কুমোর, নাপিত প্রভৃতি বৃত্ত ধারী মানুষদের বসবাস ছিল। সমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ছিল জন্মান্তর কর্মফলবাদ যুগের মানুষের গভীর বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস ছিল মন্ত্র-তন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকে। এছাড়া অন্ধ কুসংস্কার ও তার মেনে চলত। যাত্রাকালে হাঁচি টিকটিকির ডাক বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বলে ধরা হতো। শূন্য কলসি শৃগালের গমন শুকনো ডালে বসে কাকের ডাক ইত্যাদি ছিল অমঙ্গলসূচক ও অশুভের সংকেতবাহী। নারী হত্যা ছিল নিন্দনীয় কর্ম আর সেইসঙ্গে গোহত্যা ও ব্রাহ্মণ এর হত্যা গর্হিত কর্ম বলে বিবেচিত হত। সমাজে সোনা-রূপা হীরে-মানিক সম্ভবত সুলভ ছিল। মেয়েরা ও পুরুষেরাও এইসব ধাতুর মূল্যবান অলঙ্কার পড়তেন। এছাড়া পড়তেন ফুলের অলংকার পোশাক ও প্রসাধন ছিল জৌলুস পূর্ণ। পট্টবস্ত্র ব্যবহার ছিল। এ যুগের মতই মেয়েদের গৃহকর্ম নিপুনা ও রন্ধন পটীয়সী হওয়া জরুরী ছিল। গান বাজনা আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল।

এই জীবন চিত্রগুলি অনাড়ম্বর। কবে যে বাস্তব জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন তারই সজীব ও প্রাণবন্ত চিত্র কাব্যে প্রকাশ করেছেন। নিপুণ পর্যবেক্ষন শক্তির বলে, মজুরি কিভাবে ভারদণ্ড প্রস্তুত করে যেমন তার দৃষ্টি এড়ায়নি তেমনি মাঝ নদীতে তুফান উঠলে নৌকা ও তার যাত্রীদের কি অবস্থা হতে পারে তারও বিশ্বস্ত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। রাধা যেহেতু কুলবধূ , তার উপরে প্রেমানুভূতির গভীরতা অন্য যে কোন নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাই তার অন্তর্দহন , "উয়ে যেন কুম্ভারের পনী" ছাড়া আর কি হতে পারে? বাস্তব থেকে উপমা চয়ণের আরো অজস্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। প্রকৃতির পটভূমিতে চিত্র ব্যাকুলতার সুন্দর ও বিশ্বস্ত ছবিতে কাব্য পূর্ণ রাধাকৃষ্ণ ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্ত মূলক সংলাপ ও বিশেষ করে বাকচাতুর্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যত্র বিরল। নারীর নিজস্ব বাকভঙ্গি চরিত্রগুলির বিশ্বাসযোগ্যতার পটভূমি গড়েছে। বাকযুদ্ধ এর পাশাপাশি ঘটনা গত ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিতেও কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার মধ্যে অন্যতম গুণী বর্তমান ছিল সংস্কৃত শ্লোক ও

কাব্যের স্থানে বিবৃতিমুখীতা আছে, সে সঙ্গে আছে আশ্চর্য সব নাটকীয় মুহূর্ত ।
দণ্ডক,লগনি,চিত্রক ইত্যাদির উল্লেখে নাটকীয়তার মাত্রাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এর রাধা চরিত্রটি। তার মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব প্রতিবাদ প্রবণতা ও আত্মস্বতন্ত্রবোধের যে প্রকাশ ঘটেছে তা মধ্যযুগের আর কোন কাব্য লক্ষণীয় নয়। সর্বোপরি রাধা চরিত্রের বিবর্তন পুরাণে পরিণত হয় এবং চেতনার স্তর থেকে গভীরে শব্দটির উত্তরণে কবি একান্তভাবে বাস্তব পুষ্ট। সেইসঙ্গে সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ও প্রবহমানতায় বিশ্বাসী। মধ্যযুগের দেববাদ নির্ভর সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বড়ুচন্ডীদাস মানুষের কথা শুনেছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ও জীবন রসিক কবি হিসেবে পুরাণ প্রসঙ্গের অবতারণা এই কাব্যের বহিরঙ্গ নির্মাণ করেছেন তিনি আর সমগ্র কাব্যে রাধাকৃষ্ণের ছদ্মবেশে মানব-মানবীর মূল কাহিনী পরিবেশন করেছেন। মনে রাখতে হবে এখানে আছে মাটির গন্ধ আর আছে সৃষ্টির ইন্দ্রজাল।
এই সৃষ্টির ইন্দ্রজাল এই আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সাহিত্যিক মূল।

৮.১০। কবি পরিচয় ও চন্ডীদাস সমস্যা

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর রচয়িতার নাম চণ্ডীদাস। মধ্যযুগে চন্ডীদাস নামে আরও কবি ছিলেন বলে অনেকেই অনুমান করে।এই ধারণা দৃঢ় হয় মনীন্দ্র মোহন বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা থেকে দীন চণ্ডীদাসের গ্রন্থ আবিষ্কার করার পর ।শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর মধ্যে চন্ডীদাস ,বড়ু চন্ডীদাস্ ,অনন্ত,অনন্ত বড়ু প্রভৃতি ভণিতা আছে।কাব্যে প্রায় সর্বত্র বড়ু চন্ডীদাসের ভণিতা মিলেছে ২৯৮বার, চন্ডীদাস ১০৭ বার আর মাত্র সাতটি জায়গায় অনন্ত বা অনন্ত বড়ু চন্ডীদাসের ভণিতা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা প্রকৃত নাম চন্ডীদাস, তার উপাধি বড়ু ।কবির উপাস্য দেবী বাশুলী। বাসুলী শাক্ত দেবী ছিলেন। তার প্রমাণ গ্রন্থের ভেতরে পাওয়া যায় । বৈষ্ণব হলে কৃষ্ণকে নিয়ে এরকম আদিরসাত্মক কাব্য লিখে কৃষ্ণকে হয়তো ভক্তদের চোখেও হেয় করতে চাইতেন না। কবি দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে কবি চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন, তিনিই পরিণত বয়সে পদাবলী রচনা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে

চন্ডীদাসের নাম উল্লেখ করেছেন। সনাতন গোস্বামীর ' বৈষ্ণবতোষণী' সূত্রে কেউ কেউ মনে করেন চৈতন্যদেব চন্ডীদাসের পদ পাঠ করতেন আবার অনেকে এ কথা বিশ্বাস করেন না। কারণ চৈতন্যদেবের মধ্যে মহাপুরুষের পক্ষে এরকম রসআভাস দুষ্ট কাব্য পাঠ করা সম্ভব নয়। চৈতন্যদেব তাহলে হয়তো পদাবলী চণ্ডীদাসের পড়তেন। চৈতন্য পূর্ব যুগের দুজন চন্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয় একজন পদাবলীকার অন্যজন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার।

এসব জটিলতার পর পদাবলীর চন্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার চন্ডীদাস কে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এই কাজটি করেছেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার চন্ডীদাস সমস্যা শীর্ষক প্রবন্ধে ।তার সূত্র গুলি হল -

১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোথাও দীন চন্ডীদাস বা বড়ুচন্ডীদাসের ভনিতা নেই।

২) সর্বত্র গোত্র বা গাইল আছে কোথাও 'ভনে' বা 'কহে' ক্রিয়াপদ নেই।

৩) শ্রীমতী রাধার পিতা মাতার নাম সাগর ও পদুমা বলেছেন।

৪) রাধার সখিদের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বড়াই ছাড়া কোন সখিকে সম্বোধনই করেননি।

৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী।

৬) সর্বত্র প্রেম অর্থে 'নেহ' বা 'নেহা' ব্যবহার করেছেন এবং চারটি জায়গায় 'পিরীতি' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তার অর্থ 'প্রীতি' বা সন্তোষ।

৭) কৃষ্ণের কোন সখার নাম উল্লেখ করেননি চন্ডীদাস ।

৮) কোথাও রাধিকার বিশেষণে 'বিনোদিনী' বা শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'শ্যাম' শব্দ ব্যবহার করেননি।

৯) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার রাজকন্যা নয়, গোয়ালিনী।

১০) বড়ু চণ্ডীদাসের কাছে ব্রজবুলি ছিল অপরিচিত।

বড়ু চন্ডীদাস নামে যে একজন কবি ছিলেন যিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাশুলী উপাসক চন্ডীদাসের জন্মস্থান নিয়ে মতান্তর আছে । কারো মতে বাঁকুড়া ছাতনাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ,কারো মতে বীরভূমের নানুরে। তাছাড়া 'তালশিক্ষা' নামক পুঁথি দুটিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিছু আধুনিক রূপান্তর দেখা যায় ।তাও পাওয়া গেছে বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার ভাষার সঙ্গে এই কাব্যের ভাষার অনেক মিল পাওয়া গেছে। অনুনাসিক প্রবণতা প্রভৃতি বাঁকুড়ার আঞ্চলিক শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রমাণ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এর মধ্যে সংযোজনা করার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতেও কাব্যটির ভাষা পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুতরাং কবি যে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন একথা অনস্বীকার্য।

৮.১১ অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করে পুঁথির সময় নির্দেশ করো।

প্রশ্ন ২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খন্ড গুলির নাম উল্লেখ করে আখ্যানভাগ এর পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কোথাও গ্রন্থ নাম নেই, তবুও কেন এই নাম সার্থক হয়েছে- আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনী অবলম্বনে রাধা চরিত্র ও কৃষ্ণ চরিত্রের পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়াই চরিত্রটি আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমাজচিত্র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।

প্রশ্ন ৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে চন্ডীদাস সমস্যার স্বরূপ নির্দেশ করো।

৮.১২। গ্রন্থপঞ্জি

১. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভঃ চন্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ

মন্তব্য

৩. বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পরিমার্জিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন -বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত, মিহির চৌধুরী কামিল্যা

৫. বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণ কথার ক্রমবিকাশ, সত্যবতী গিরি, রত্নাবলী

একক ৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের - জন্ম খন্ড

বিন্যাস ক্রম

৯.১। উদ্দেশ্য

৯.২। জন্ম খন্ডের অবতারণা

৯.৩। বড়ু চন্ডীদাস ও তার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

৯.৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্ম খণ্ডের আলোচনা

৯.৪.১। ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের প্রভাব

৯.৪.২। খণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষায় জন্মখণ্ড

৯.৫। জন্মখণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা

৯.৬। অনুশীলনী

৯.৭। গ্রন্থপঞ্জি

৯.১। উদ্দেশ্য

১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিটি খণ্ডিত, সেই কারণেই এর কাল নির্ণয়ক সূত্র পাওয়া যায়না। তবে কৃষ্ণ কথাই এর সারবস্তু জেনে বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এর নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

মধ্যযুগের সম্পদ এই রাধা কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেম গাথা। পৌরাণিক কৃষ্ণের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক নানা গল্পকথার মিশেলে এক অপূর্ব প্রণয়নের কথা সেই সময়

প্রচলিত ছিল। তবে বৃন্দাবনের পবিত্র রসে গোলক বিহারী সর্বত্র বিরাজ করেছেন। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় এই পরম আস্বাদ্য নৈসর্গিক প্রস্তুত করেছিলেন একই প্রেরণায় হয়তো মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে বাঙালি কবি চন্ডীদাস রচনা করেন রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথা কিন্তু অন্য প্রাদেশিক সাহিত্যে এখানে লক্ষ্য করা যায় ।

বড়ু চন্ডীদাসের নায়ক কৃষ্ণ প্রাকৃত নায়ক। তার নায়িকাও ঐশ্বর্যময়ী নয়, সে একেবারেই গ্রাম্যবালিকা। অদৃষ্টের বশে তাকে নপুংসক আইহনের 'রানী' হতে হয়েছে। পরবর্তী জীবনে অবৈধ প্রেম সম্পর্কের জেরে প্রথমে কলঙ্কিনী পরে নির্যাতিতা এবং পরিতক্তার ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। সেখানে প্রবল পুরুষশাসিত সমাজের রাধার আখ্যানকাব্য স্থান পেয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ নাম ধারীদের চরিত্রটি আগাগোড়াই অনড় মানসিকতা যুক্ত সংস্কৃতি বর্জিত এবং অননুকরণীয় ভূমিকায় বিরাজ করেছেন। পূর্বসূরী জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'এর ছায়া একেবারে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে পড়েনি। বৃন্দাবন ও বিরহ খণ্ডের কিছু পদে এর ছায়াপাত দেখা গেলও, জন্ম খণ্ড বড়ু চণ্ডীদাসের আপন সৃষ্টি।

৯.২। জন্মখন্ডের অবতারণা

'জন্মখন্ড' প্রচলিত দেববাদকে কাব্যে প্রতিধ্বনিত করে জানালেন পৃথিবীতে কৃষ্ণের অবতার রূপে জন্মগ্রহণের কারণ -

পৃথুভার ব্যথাং পৃথ্বী কথায়ামাস নির্জরান।

ততঃ সরভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ।।

কবি কংসারি প্রশস্তি বন্দনা পূর্বক বর্ণনা দিয়েছেন অনির্বচনীয় সে জন্ম মুহূর্তের। অঝোর ধারা বর্ষণ ঘন রজনীর মধ্যযামে কংসের কারাগারে বিজয় নাম শঙ্খের নাদে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন পতিত পাবন শ্রীহরি। খুলে গেছে কারাগারের দরজা। মস্তকে দামোদর ধারণ করে বসুদেব পার হয়েছেন যমুনা। এদিকে যমুনাও উত্তোলিত সাক্ষাৎ নারায়ণকে স্পর্শের অভিলাষে। তারপর গোকুলে নন্দ রায়ের নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মজকে রেখে বসুদেবের মথুরায় প্রত্যাবর্তন। এই অদৃষ্টপূর্ব শিশু পরবর্তীকালে সৌন্দর্যে,মেধায় গোকুলবাসীর মন প্রাণ হরণ করে কৃষ্ণ নামে পরিচিত হন। এই

মদনমোহনের কাম চরিতার্থের জন্য শ্রীলক্ষ্মীর মর্তে আগমন। তিনি সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদুমার কন্যা রাধা নামে পরিচিত হন। কৃষ্ণের ঘোষণা আছে পুরানে।সে স্বকীয়া নয়, শাস্ত্র নিষিদ্ধ পরকীয়া তার প্রিয় আস্বাদ্য রস।রাধিকা হয়তো এই জন্যেই আইহনের রানী হয়েছে। বড়ু চন্ডীদাস এই পর্যন্ত পুরাণের কথা বলেছেন কিন্তু তারপরই তিনি তার সুর বদল ঘটিয়েছেন।

অপরূপ রূপসী কন্যা রাধা ভবিষ্যতে আইনের প্রতি কতখানি একনিষ্ঠ থাকবে এই প্রশ্ন ,এই আশঙ্কা থেকে আইহনের মা বৃদ্ধা বড়াইকে রাধার প্রহরী নিযুক্ত করেছেন। রাধা মথুরায় চলে দুধ দধির পশরা নিয়ে। কিন্তু সবসময় সঙ্গে থাকে বড়াই।

৯.৩। বড়ু চণ্ডীদাস ও তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত শ্লোক সংখ্যা ১৫১ টি। বেশিরভাগ শ্লোকই অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। বড়ু চন্ডীদাস কাহিনীর সংযোগ রক্ষা করার জন্য এই শ্লোকগুলো রচনা করেছিলেন। পালাগানে অধিকারীর বিবৃতি দানের মধ্যে যেমন ঘটনার একটা আভাস পাওয়া যায়, কবির শ্লোকের সাহায্যে সেই কাজই করেছিলেন। অন্যান্য মগধীয় ভাষাতেও এই রীতি লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ৪১৫ টি পদের মধ্যে বড়ু চন্ডীদাসের ভণিতা রয়েছে মাত্র ৪৩ বার। মোট ৩২ টি রাগের নাম রয়েছে।

জন্মখণ্ডের কাহিনী

কংসের জন্য সৃষ্টির বিনাশ হচ্ছে।তাই বসুন্ধরা স্বর্গের দেবতার কাছে এসে তার দুঃখের কথা বললেন। তখন দেবতাগণ সকলে মিলে স্বর্গের মধ্যে একটা সভা করলেন। সেই সভায় স্থির হল সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে কংস বধ করা প্রয়োজন। এর পরই প্রশ্ন উঠল তাকে বধ করা যায় কি উপায়ে। তখন সকলে ব্রহ্মাকে এই কথা জানালেন। ব্রহ্মা নারায়ণের কাছে সকলকে নিয়ে গেলেন। দেবতাদের অভিযোগ শুনে নারায়ন হেসে একটি শ্বেতকেশ ও একটি কৃষ্ণকেশ তাদের হাতে দিয়ে বললেন বসুদেবের গৃহে দৈবকীর উদরে এই দুইটির একটি হলধর বলরাম রূপে আরেকটি কৃষ্ণ বনমালী রূপে আবির্ভূত হবে।

দেবতাদের মন্ত্রণার কথা শুনে নারদ মুনি কংসের সভায় উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন দেবকীর অষ্টম গর্ভে যার জন্ম হবে সেই মহাবলী বীর তার কালস্বরূপ। নারদের কথা শুনে কংস স্থির করলেন এখন থেকে দেবকীর যখনই যে সন্তান হবে তাকে বিনষ্ট করা হবে। সেখান থেকে নারদ বসুদেবের কাছে এলেন এবং তাকেও কংসের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়ে নিরন্তর সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেলেন। কংসের হাতে দেবকীর পরপর ছয়টি গর্ভ নষ্ট হল। সেই সময় একদিন দেবতারা সকলে মিলে দেবকীর উদরে নারায়ণ প্রদত্ত কেশ দুটি সংবিষ্ট করে দিলেন। যে শ্বেত কেশটি উদরে প্রবিষ্ট হল তাই মহা পরাক্রমশালী বলভদ্র রূপ গ্রহণ করল। ইনি জননীর গর্ভপাতের ছল করে রোহিণীর গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দৈবকীর উদরে অবস্থিত কৃষ্ণ কেশটি শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিল। দৈবকী অষ্টম গর্ভ জেনে কংস তাকে বধ জন্য উদ্যত হলেন।রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত অষ্টম তিথিতে এক ঘন বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রির কৃষ্ণের জন্ম হলো। দেবতার সহায়তায় বসুদেব সেই রাত্রেই গোকুলে গিয়ে নিদ্রাভিভূত যশোদার কোলে কৃষ্ণকে রেখে তার সদ্যোজাত শিশু কন্যাটিকে গৃহে নিয়ে আসলেন। এই কন্যা সন্তান দেবকীর মনে করে কংস তাকে পাথরে আছড়ে হত্যা করলেন। তখন সেই কন্যা অন্তরীক্ষ থেকে বলল, তোমাকে যে বধ করবে সেই বালক নন্দ গৃহে বাড়ছে। কংস এটা শুনে তাকে হত্যার উদ্যোগ করতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কংসের দ্বারা প্রেরণ করা পুতনা, যমলার্জুন, কেশী প্রমূখ সকলকে সংহার করল।

শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য দেবতারা স্বর্গ থেকে রাধা রূপে লক্ষ্মীকে প্রেরণ করলেন।সাগরের ঘরে পদুমার উদরের অপূর্ব সুন্দরী শ্রী রাধার জন্ম হলো। দেবগনের ইচ্ছাতেই রাধাস্বামী হলো নপুংসক আইহন। আইনের কথা মত তার মা রাধার পরিচর্যার জন্য পদ্মার কাছ থেকে এক বৃদ্ধকে নিয়ে আসলেন। এই বৃদ্ধা পদ্মার পিসি, শ্রীরাধার বড়াই ।

৯.৪ । জন্মখন্ড আলোচনা

৯.৪.১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের প্রভাব

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির ওপর বিভিন্ন পুরাণ কাহিনীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে কাব্যের অন্তর্গত 'জন্মখন্ড' বিশেষভাবে মূল্যবান। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর মূল কাহিনীর সঙ্গে এর বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয় খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড থেকে রাধা কৃষ্ণ লীলা কাহিনী শুরু হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে রাধা কৃষ্ণের জন্ম কথা কবি বর্ণনা করেছেন জন্ম খণ্ডে। পৃথিবীতে কংসের অত্যাচার, দেবতার কাছে বসুন্ধরা নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, প্রভৃতি কাহিনী পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেখা প্রয়োজন জন্ম খণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন পৌরাণিক প্রসঙ্গ কবি পুরাণ থেকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্কৃত শ্লোক

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথায়ামাস নির্জ্জর্ন।

ততঃ সরভসং দেবাঃ কংসধ্বংস মনো দধুঃ।।

এই প্রসঙ্গটি বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ ,ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে। এই সকল পুরাণে বর্তমান প্রসঙ্গটি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে

এতস্মিন্নেব কালে তু ভূরিভারাবপীড়িতা।

জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম।।

স ব্রক্ষকান সুরান প্রণিপ্রত্যাহ মেদিনী।

কথায়ামাস তৎ সর্বং খেদাৎ করুণভাষিণী।।

এই সময় পৃথিবীর বহুতর ভারে নিপীড়িত হয়ে সুমেরু পর্বতে দেবগনের কাছে গমন করলেন। ব্রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত দেবগন কে প্রণাম করে পৃথিবী করুন ভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। এটি পদ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে-

শৃণু রাজন প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ

পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্তা ভবতে কথায়াম্যহম।।

পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎকংসাদিনৃপপীড়িতা।

স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা।।

ভাগবতে এই একই বর্ণনা পাওয়া যায়-

ভূমিদৃপ্তনৃব্যাজ দৈতানীকশতাযুতৈঃ।

আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মানং শরণং যযৌ।।

বিষ্ণুপুরাণের মত পদ্মপুরাণে ও ভাগবতে কংস কর্তৃক নিপীড়িত বসুন্ধরা চিত্র আঁকা হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রে বসুন্ধরা ব্রহ্মাকে স্মরণ করেছে। চন্ডীদাস তার কাব্য রচনায় পুরাণের বর্ণনাগুলিকে অনুসরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি পুরাণ কাহিনীকে কখনোই পরিবর্তন করেননি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে' এই পদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাও ভাগবত, পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। যেমন ভাগবতে আছে-

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।

জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ।।

জগন্নাথ দেব পৃথিবীর ভার পীড়িতা। বহু রাক্ষস জগতে রয়েছে। জরাসন্ধ কংস প্রলম্ব ধেনুক প্রভৃতি দুরাত্মা জগতের সকল মানুষকে উৎপীড়িত করছে। তাই আপনি পৃথিবীর ভার গ্রহণ করুন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে-

এহি শুনী ঈসত হাসিআঁ ততিখনে।

ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।।

এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।

হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে।।

তাহার হাতে হৈবে কংসাসুরের বিনাশে।

হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে।।

কংসাসুরকে বধ করার জন্য নারায়ণ দেবতাদের হাতে শুভ্র ও কৃষ্ণ বর্ণের দুটি কেশ প্রদান করেছিলেন সে কথা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত আছে।

বড়ু চন্ডীদাস কৃষ্ণ বনমালী এবং হলধর বলরামের জন্ম কাহিনী বর্ণনায় পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের কাহিনীকে অনুসরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্ম খণ্ডের বিবরণের সঙ্গে এক্ষেত্রে পদ্মপুরাণ এর কাহিনী মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। পদ্মপুরাণে আছে-

হিরণ্যাক্ষস্য ষটপুত্রান সমানীয়াবনীতলে।

বসুদেবস্য প্তন্যাস্ত দেবক্যাং সন্নিবেশয়।।

পরমেশ নারায়নী মায়াকে বললেন, তুমি হিরণ্যাক্ষের ছয় পুত্রকে অবনী তলে এনে বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে স্থাপন করো। হে শুভ দর্শনে দেবকীর সপ্তম পুত্র অনন্তের অংশ, সেই অনন্ত অচিরেই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করবে। তাকে তুমি রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করবে। অষ্টম গর্ভে আমার অংশ থেকে উৎপন্ন হবে ।নন্দ পত্নী যশোদার গর্ভে তোমার অংশভূতা মহানিদ্রা আবির্ভূত হবেন। এ সকল অংশ পাঠ করলে বোঝা যায় বড়ু চন্ডীদাস কাব্যের নায়ক কৃষ্ণের জন্ম কথা বর্ণনায় পুরাণকে অনুসরন করেছেন।

জন্ম খণ্ডে অন্তর্গত নারদীএকটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক চরিত্র। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে নারদের আবির্ভাব ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদের রূপ বর্ননায় দেখা যায়-

আয়িলা দেবের সুমতি শুনি।

কংসের আগক নারদ মুনী।।

পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ ।

বামন শরীর মাকড় বেশ।।

পুরাণ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরবর্তী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নারদকে যেভাবে দেখা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার থেকে অনেক বিকৃত রূপে সে আবির্ভূত হয়েছে । মূল

এবং অর্বাচীন পুরাণে নারদের বর্ণনা আছে। রামায়ণ-মহাভারতেও নারদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ু চন্ডীদাস জন্ম খন্ডে নারদের যে রূপ দেখেছেন তাতে এই চরিত্রটি পুরাণ ভিত্তিক নয়। হরিবংশে নারদের নৃত্যের কথা আছে, কিন্তু জন্মখন্ডের নারদ ও হরিবংশের নারদের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন মিল পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব তার নবজাতক পুত্রকে যমুনা পরপারে নন্দ যশোদা ঘরে রেখে যশোদার সদ্যজাত কন্যাকে সকলের অলক্ষ্যে গৃহে নিয়ে আসে। অতঃপর কৃষ্ণ গোকুলে ক্রমেই বড় হতে থাকে এবং কংস যেকোন উপায়ে কৃষ্ণকে বধ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কংসের প্রেরিত পূতনাকে কৃষ্ণ স্তন্যপানের ছলে সংহার করে। একে একে যমল অর্জুন কেশীর মত অসুর আসতে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণ তার প্রচন্ড শক্তিবলে সকলকে হত্যা করে। এই কাহিনীও পুরাণের প্রসঙ্গ অনুসারী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যমলার্জুনের ঘটনা কিছুটা অন্যরূপে দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ভাগবতে যমলার্জুন বৃক্ষ রূপে বর্নিত।কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে অর্জুন গাছে পরিণত হয়। তাদের শাপমুক্তি ঘটে কৃষ্ণের স্পর্শে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যমলার্জুন দুটি অসুর বিশেষ। কৃষ্ণ নিধনের জন্য কংস তাদের প্রেরণ করে এবং কৃষ্ণের একটিমাত্র আঘাতেই দুজনের মৃত্যু ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত পুরাণ অনুসরণে হলেও রাধার জন্ম কাহিনী পুরাণকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠেনি। প্রাচীন পুরাণে রাধার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়না। ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণে রাধার প্রসঙ্গ নেই ।অপরদিকে পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধার কাহিনী পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে রাধার মাতার নাম কীর্তিকা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণনা অনুযায়ী রাধা বৃষভানুর মহিষী কলাবতী গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। রাধা কৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল এমন কথা কোন পুরাণে নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ সম্ভোগের জন্য স্বর্গের দেবতারা লক্ষীকে ভূমিতে অবতরণ করার নির্দেশ দেয়। তাই রাধা পৃথিবীতে নতুন করে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেটি বৃষভানু, কলাবতী বা কৃত্তিকার ঘরের নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার পিতার নাম সাগর এবং মাতার নাম পদুমা বা পদ্মাবতী।

কাহ্নাঞিঁ সম্ভোগ করণে। লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।।

আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার।থির হউ সকল সংসার।। আল রাধা।।

তেকারণে পদুমা উদরে।উপজিলা সাগরের ঘরে।। ল ।। আল রাধা।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী স্বতন্ত্র নয়। রাধারই আরেক নাম রাধা চন্দ্রাবলী।

৯.৪.২। খন্ডের অখন্ডতা রক্ষায় জন্ম খন্ড

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র কাব্যটি একই কবির রচনা। খন্ডগুলি যে বিচ্ছিন্নভাবে সংকলিত নয়, প্রক্ষিপ্ত নয়, একটি খণ্ডের সঙ্গে অপর খণ্ডের কাহিনী ঘটনাগত ভাবে যুক্ত এবং তার মধ্যে যে ধারাবাহিকতার লক্ষ স্পষ্ট।কাব্যটি সতর্কভাবে পাঠ করলে তা বোঝা যায়।

জন্ম খণ্ডে কংস নিধনের জন্য মর্তে কৃষ্ণ রূপে নারায়ন এর আবির্ভাব এবং কৃষ্ণের বিলাস এর জন্য লক্ষ্মীর রাধা নামে নপুংসকের পত্নীরূপে পৃথিবীতে অবতরণ। এইখণ্ডে আইহন,তার জননী, বড়াইয়ের কথা আছে। প্রতিটি খণ্ড শেষে সংযোজক সংস্কৃত শ্লোক গুলি দুটি খন্ডের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সাহায্য করেছে ।এদিক থেকে সংস্কৃত শ্লোক গুলি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

৯.৫। জন্ম খন্ডের বিস্তারিত বর্ণনা

জন্মখণ্ডে প্রস্তাবনা অংশে কংসের অত্যাচার থেকে জগতকে রক্ষা করার জন্য দেবগনের প্রার্থনার কথা বর্ণনা করা আছে। বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে বসুদেবের অষ্টম পুত্ররূপে ধরায় অবতীর্ণ হবেন। কংস নারদের কাছে অবগত হলেন যে বসুদেব পত্নী দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তার নিধন হবে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মী রাধা রূপে সাগরের ঘরে পদুমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন। দেবতাদের অভিপ্রায় অনুসারে নপুংসক আইহন হলেন রাধার স্বামী। পুরাণ থেকে গৃহীত হয়েছে এই অধ্যায়।এখানে পদ সংখ্যা ৯।ভাগবত পুরাণ অনুসারে বড়ু চণ্ডীদাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণ প্রদান করেছেন।

১। বস শঙ্ক।।৬

সভাপতি আর সব সভাসদ জন।আলপমতীঞঁ তোহ্মাতে শরণ।।৭

... ...।গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।।৮

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথায়ামাস আমার নির্জ্জরান।

ততঃ সরভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ।।

পৃথিবী তার গুরুভার জনিত দুঃখের কথা তাদেরকে যখন বললেন তখন দেবতারা তাড়াতাড়ি কংসের বিনাশে মনোযোগী হলেন।

২। কোড়ারাগ।।যতি।।দণ্ড।।

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে। কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাসে।।১

ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ। সহ্মেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ।।২

ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।।৩

তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলেঁ অসুরের খএ।তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ।।৪

হেন শুনী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।।৫

এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে। হলি বনমালী নাম দৈবকী উদরে ।।৬

তাহার হাথে হৈবে কম কংশাসুরের বিনাশে ।হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে।।৭

সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।গাইল বড়ু চন্ডীদাস বাসলীগণ।।৮

অর্থাৎ সকল দেবতা মিলে স্বর্গে সভা করলেন ।কংসের জন্য সৃষ্টি বিনষ্ট হচ্ছে। কি উপায়ে এবার তার মৃত্যু হবে সকলে এই চিন্তা করে ব্রহ্মার কাছে আবেদন জানালেন। ব্রহ্মা দেবগনকে নিয়ে সাগরে গেলেন। জল মধ্যে অবস্থিত হরিকে তার এইরূপ স্তব করে তুষ্ট করলেন। তুমি নানাভাবে অসুর বিনাশ করলে, তোমার লীলায় কংসের বধ হতে পারে। এই কথা শুনে নারায়ণ ঈষৎ হেসে একটি শ্বেত ও একটি কৃষ্ণ কেশ তাদের হাতে দিলেন এবং বললেন বসুদেবের ঘরে দেবকীর উদরে এই দুটির একটি হবে বলরাম, একটি হবে কৃষ্ণ বনমালী। তার হাতেই কংসের বিনাশ ঘটবে। এই বর

পেয়ে দেবগণ নিজের স্থানে ফিরে গেলেন এবং উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

৩। বরাড়ীরাগ।।ক্রীড়া।।

আয়িলা দেবের সুমতি শুণী। কংসের আগক নারদ মুনী।।

পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ।।১

নাচএ নারদ ভেকের গতী।বিকৃত বদন উমত মতী।।

খণে খণে হাসে বিণি কারণে। খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে।।

নানা পরকারে করে অঙ্গভঙ্গ।তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ।।২

লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে।।

উঠিআঁ সব বোলে আনচান। মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।।৩

মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।।

দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।বাসলী বন্দী গাইল চন্ডীদাস।।৪

এখানে নারদের বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ উঠে অসংলগ্ন কথা বলতে লাগলেন এবং অহেতুক ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন। বোকা পশুর মতো বারবার জিহ্বার অগ্রভাগ বের করে বিচিত্র শব্দ করতে শুরু করলেন।

৪। বরাড়ীরাগ।।একতালী

কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস। নাহিঁ জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ।।

যে হৈবেক দৈবকীর গর্ভ অশুম।অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।।১

কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোহ্মার ঠাএ । এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ।।

মন্তব্য

হেন সব শুনী কংস হৈল সচকীত।সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তির হীত।।

এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ভ হএ। মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।।২

আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে। সকল কহিল তত্ব বসুদেব থানে।

এঁবে দৈবকীঞঁ যত গর্ভ ধরিব। পাপ দুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব।।৩

আষ্টম গর্ভ হৈব দেব নারায়ণে। সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখণে।।

সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে। গাইল বড়ু চন্ডীদাস বাসলীগণে।।৪

কংসকে নারদ জানালেন দেবকীর অষ্টম গর্ভে যার জন্ম হবে সেই মহাবীর তার কাল স্বরূপ। নারীদের কথা শুনে কংস স্থির করলেন এখন থেকে দৈবকীর যে সন্তান হবে তাকেই বিনষ্ট করা হবে। নারদ সেখান থেকে বসুদেবের কাছে এলেন এবং তাকে কংসের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়ে নিরন্তর সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৫। কহুগুজ্জরীরাগ।।রূপক।।

নারদের মুখে শুনী কংস মহাবীর।একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ভ দৈবকীর।।১

সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে।।২

পুর্ব্বে ছয় গর্ভ তার মায়িল কংশাসুরে।তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে।।৩

দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল।।৪

মাএর গর্ভপাত ছল করিআঁ। আপনে রহিলা রোহিণীগর্ভ গিআঁ।।৫

যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে।।৬

তাহাক আষ্টম গর্ভ জাণী দৈবকীর। আবেক্ষন দিল লোক কংশ মহাবীর।।৭

সুপুরুষ গর্ভ ধরল অনুরুপ।দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ।।৮

ক্রমে দৈবকীর গর্ভ হৈল দশ মাস।বাসলী শিরে বন্দী গাইল চন্ডীদাস।।৯

এখানে বলা আছে কংসের হাতে দেবকীর পরপর ছয়টি গর্ভ বিনষ্ট হল। সেই সময় একদিন দেবতারা সকলে মিলে দেবতা নারায়ণ প্রদত্ত কেশ দুটি সংবিষ্ট করে দিলেন। যে শ্বেত কেশটি দৈবকীর উদরে প্রবিষ্ট হল তাই মহাপরাক্রমশালী বলভদ্রের রূপ গ্রহণ করল। তিনি জননীর গর্ভপাতের ছল করে রোহিণীর গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নিলেন । দেবকীর উদরে অবস্থিত কেশটি শ্রীকৃষ্ণ রূপ লাভ করল এবং দৈবকীর রূপ দিনে দিনে বাড়তে থাকল। ক্রমে দশ মাস অতিক্রান্ত হল। এটি দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান জেনে কংস তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য রক্ষী নিয়োগ করেছিল।

৬। কোড়ারাগ। ।লঘুশেখর। ।দণ্ডক। ।

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে। নিশি অন্ধকার ঘন বারি বরিষে। ।

হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী। ।১

রোহিণী আষ্টমী তিথি ল।জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ। ।

দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাণিল । নিন্দে আকুল গোকুলের লোক [৪/২] ভৈল। ।

যশোদার কন্যা সেই খনে উপজিল । নিন্দভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জাণিল। ।২

বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে । কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে। ।

কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল । পার হআঁ বসুল নন্দের ঘর গেল। ।৩

যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী । বসুল আণিল ঘরে যশোদার বালি। ।

তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল । দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল। ।৪

কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ । কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ। ।

নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে । শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে। ।৫

প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল । তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল। ।

তার পাছে যমল আর্জুন পাঠাইল । একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল। ।৬

কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনান্তরে । তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে ।।

হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর।।৭

অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত অষ্টমী তিথিতে এক ঘন বর্ষণমুখর অন্ধকারে কৃষ্ণের জন্ম হলো। দেবতাদের সহায়তায় বসুদেব সেই রাত্রে গোকুলে গিয়ে নিদ্রারত যশোদার কাছে কৃষ্ণকে রেখে তার সদ্যোজাত শিশু কন্যাটিকে গৃহে নিয়ে এলেন।তাকেই দেবকীর সন্তান মনে করে কংস তাকে পাথরে আছড়ে ফেলে হত্যা করলেন। তখন সেই কন্যা অন্তরীক্ষ হতে বলল, তোমাকে যে হত্যা করবে সেই বালক নন্দ গৃহে বড় হচ্ছে। কংস তা শুনে তাকে হত্যার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কংস প্রেরিত পুতনা, যমলার্জুন,কেশী সকলকেই হত্যা করলেন। পুতনাকে নাকি স্তনপান ছলে সংহার করেছিল কৃষ্ণ। যমলার্জুন কৃষ্ণের এক আগাতেই মারা গিয়েছিল।কৃষ্ণ তার বিশাল বাহু কেশীর মুখের উপর রেখে তাকে হত্যা করেছিল। এভাবেই গোকুলে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকলো কৃষ্ণ।বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত কৃষ্ণ কে শাসনে রাখার জন্য যশোদা দড়ি দিয়ে কৃষ্ণের বেঁধে রাখতেন। সেজন্য কৃষ্ণ দামোদর নামে খ্যাত ছিলেন।

৭। কোড়ারাগ।।একতালী।।

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ।।

চন্দনতিলকেঁ আতি শভিত কপালে। দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।।১

[৫/১]সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালি।অবতার করি করে ধরণীত কেলী।।

সুরেখ সুপুত নাসা নয়ন কমল। কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল।।

ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর। কন্নযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল।।২

ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।করকরুবিন্দ মণি নির্ম্মিত কমলে।।

মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল।।৩

মানিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তি। সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী।।

বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরির।কংসের বধ কারণ আতি মহাবির।।৪

নানা মণি অলংকার শোভিত শরীর।পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে।।

নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।।৫

কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। তার কুঞ্চিত ঘন কমল সুদীর্ঘ কেশরাশি রয়েছে। সেখানে মনোহর ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাচ্ছে। চন্দন তিলক তার কপালে শোভা পাচ্ছে।তার কপালের দুপাশ লঘু এবং মধ্যস্থল উন্নত ও প্রশস্ত। দেবগনের অনুরোধে কৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করবেন।তার নাক এবং চোখ দুটি সুন্দর সুগঠিত। ভ্রূ দুটি ধনুকের মত বাঁকা। ওষ্ঠ ও অধর যুগ্ম প্রবালের মতো। কর্ণযুগ বরুনের জালের মত শোভা পাচ্ছে। আজানুলম্বিত কর দুটি করিকর সদৃশ।করকমল কুরুবৃন্দ মণি নির্মিত। বক্ষস্থল মরকত মণি ফলকের মত।কটিদেশ সুখম,জংঘা দুটি রামরম্ভার মত।নখ পংক্তি মাণিক্য খচিত।কংস বধের উদ্দেশ্যে বত্রিশ রাজ লক্ষ্মণ সমন্বিত কৃষ্ণ এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছেন। তার দেহ সুসজ্জিত। তার পরনে পীত বস্ত্র,হাতে বাঁশী।কৃষ্ণ প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়ে গোরক্ষা করে থাকেন।

৮। ধানুষীরাগ।।লঘুশেখর।।

কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে। লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।।

আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার। থির হউ সকল সংসার।। আল রাধা।।১

তেকারণে পদুমা উদরে। উপজিলা সাগরের ঘরে।।ল।।আল রাধা।।

তীনভুবনজনমোহিনী।রতিরসকামদোহনি ।।

শিরীষকুসুমকোঁঅলী। অদভুত কনকপুতলী।।২

দিনে দিনে বা[৫/২]ঢ়ে তনু লিলা।পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা।।

দৈবেঁ কৈল কাহ্নু মনে জানী।নপংসক আইহনের রানি।।৩

দেখি রাধার রূপ যৌবনে।মাঅক বুয়িল আইহনে।।

বড়ায়ি দেহ এহার পাশে। গাইল বড়ু চন্ডীদাসে।।৪

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য দেবতারা স্বর্গ থেকে লক্ষ্মীকে রাধা রূপে সাগরের ঘরে প্রেরণ করে। পদুমার উদার এই সুন্দরী শ্রীরাধিকা জন্মগ্রহণ করেন। দেবতাদের ইচ্ছাতেই রাধার স্বামী হয় নপুংসক আইহন ।আইহনের কথামতো তার মা রাধার পরিচর্যার জন্য পদ্মার কাছ থেকে এক বৃদ্ধাকে নিয়ে আসেন। এই বৃদ্ধা পদ্মার পিসি, রাধার বড়াই।

৯। গুজ্জরীরাগ।।যতি।।

আইহনের মাত্ত গুণী মনে। আল। ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে।ল বড়ায়ি।।

চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই। তার পিসী রাধার বড়ায়ি।।১

নিয়োজিলী নানা পরকারে।আল।।হাট বাটে রাধা রাখিবারে।।ল বড়ায়ি।।

শেত চামর সম কেশে।কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে।।

ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্নু দেখি।কোটর বাটুল দুঈ আখি ।।২

মাহা পটু নাশা দণ্ডহীনে।উন্নত গণ্ড কপোল খীনে।।

বিকট দন্ত কপট বাণী।ওঠ আধর উঠক জিণী।।৩

কাঠী সম বাহুযুগলে।নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে।।

কুটিল গমন ঘন কাশে।গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।।৪

কবি বলতে চেয়েছেন আইহনের মা মনে মনে চিন্তা করে পদ্মার কাছ থেকে বৃদ্ধাকে চেয়ে আনলো । এই বৃদ্ধা পদ্মার পিসি রাধার বড়াই। রাধাকে হাটে বাটে নানাভাবে রক্ষা করার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হলো । এরপর রয়েছে বড়াই এর রূপ বর্ণনা।

তার চুল শ্বেত চামরের মত সাদা। দুপাশে কপাল বসে গেছে। ভ্রূ দুটি দেখে যেন দুটো চুনের রেখা বলে মনে হয়। আর চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। নাকের মাঝখানটা বসানো গালের হাড় দুটো উঁচু। দাঁত গুলো বীভৎস। ঠোঁট দুটো উটের ঠোঁটে চাইতেও বিকৃত। আর কথাবার্তা কপট। তার দুই বাহু কাঠির মত সরু।স্তন দুটি নাভি পর্যন্ত লম্বিত।পায়ে তার বল নেই বলে সে একে বেঁকে হাঁটে।

অভিমন্যুজনন্যাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।

রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ।।১

ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা।

তদেহি যামি মথুরাং মথুরাচারকোবিদে।।২

এখানে বড়াই বলছে ,হে রাধা অভিমুন্যর জননী তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। অতএব হৃষ্ট মনে আমার সঙ্গে মথুরা চলো। এরপর রাধা উক্তি করেছেন, বৃদ্ধা তুমি মধুর ব্যবহারে সুনিপুণ।তুমি যে আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়েছে এটা আমার সৌভাগ্য।চলো মথুরা যাই।

৯.৬। অনুশীলনী

প্রশ্ন ১। জন্ম খণ্ডের কাহিনি বর্ণনা করে এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

প্রশ্ন২। জন্ম খণ্ডে বিভিন্ন পুরাণের প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

৯.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র,অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

২। চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী

একক ১০। রাধাবিরহ

বিন্যাস ক্রম

১০.১। উদ্দেশ্য

১০.২। ভূমিকা

১০.৩। রাধা

১০.৪। কৃষ্ণ

১০.৫। বড়াই

১০.৬। রাধা বিরহ প্রক্ষিপ্ত কিনা

১০.৭। রাধা বিরহের গীতিধর্মিতা।

১০.৮। অনুশীলনী

১০.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১০.১। উদ্দেশ্য

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যটি তেরটি খণ্ড নিয়ে গঠিত। যদিও কবি বড়ু চণ্ডীদাস ‘রাধাবিরহ’কে খণ্ড বলতে চাননি। রাধাবিরহ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। একে আবার অনেক সমালোচক প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। যদিও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের এই শেষতম অংশটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় নি। তবুও রাধার একান্ত বিরহের করুন আর্তি নিয়ে খণ্ডটি পাঠক সমাজে সমাদৃত। রাধারসে বেদনা ছিল অতলান্ত সমুদ্রের ন্যায় গভীর, সচেতন শিল্পী কুশলী মানসিকতার সুগভীর বোধ নিয়ে ধী-শক্তির মাধুর্যে মনোরম ভঙ্গিতে কবি তাবোই আলোচ্য অংশে পরিবেশন করেছেন।কৃষ্ণ সামাজিক

প্রেক্ষাপটকে উল্লঙ্ঘন করে কামের চাতুরিতে যাকে সংসার বিমোচন করেছিলেন, সমস্ত খন্ডের শেষে সেই রাঁধার বিরহ তাপিত হৃদয়ে একাকীত্বে দিন অতিবাহিত হয়েছে।বিরহের শোকে সাধারন মানুষের মত রাধা কুল-মান-ত্যাগ করে যোগী বেশ ধারন করেছে। সেক্ষেত্রে অনেক না বলার মাঝে লুকিয়ে আছে রাধার ঐকান্তিক নিঃসীম শুন্যতাময় একাকীত্ব।'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' –এর রাধার যেখানে শেষ, 'বৈষ্ণবপদাবলীর'-র রাধার সেইখান থেকেই সূচনা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ রাধার শেষপর্যায়ে যে বিরহ বেদনার জ্বালাময় তাপিত-মূর্তি অস্ফুটভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে – তারই চূড়ান্ত পর্যায়ক্রম পরিনতি 'বৈষ্ণবপদাবলী'তে রাধার সৌন্দর্য মাধুর্যময় মূর্তিতে উদ্ভাসিত।এখানেই আলোচ্য মডিউল পাঠের উদ্দেশ্য নিহিত ।

১০.২। ভূমিকা

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে 'রাধাবিরহ' একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ। 'শ্রীকৃষ্ণ এর প্রেমে আকুল হয়ে যে নারী একদিন সমাজ-লোকলজ্জা, ত্যাগ করেছিল – সেই রাধাই প্রেমের অতলান্ত গভীরে নিমজ্জিতা হয়ে প্রেমের শতদলে পরিণতা হয়েছেন। আলোচ্য মডিউলে তারই এক সংক্ষিপ্ত ভুমিকা প্রদান করা হয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ত্রয়োদশ খন্ডের মধ্যে শেষ খন্ডটি হল 'রাধাবিরহ'। যদিও কবি 'রাধাবিরহ' কে খণ্ড বলে উল্লেখ করেননি। কেন করেননি সে বিষয়ে মতান্তর আছে। আমরা সে আলোচনায় পরে আসছি। মত কথা, 'রাধাবিরহ' এই কাব্যের শেষতম অংশ।এবং এটি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ রাধাবিরহের "শকতী না কর বড়ায়ি বলো মো তোহ্মারে"।শীর্ষক পদটিতে কাব্যটি খণ্ডিত।সুতরাং কাব্যের উপসংহারে কী ছিল তা জানা যায় না।তবে সমগ্র রাধাবিরহ রাধার বিরহ বেদনার করুন গীতি। কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেছেন। আর রাধার জীবনে নেমে এসেছে বিরহের অন্ধকার। একদিন যে রাধা সমাজসংস্কার ও কুলমর্যাদা রক্ষার জন্য কৃষ্ণের প্রেমপ্রস্তাবে তীব্র অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন, রাধা বিরহে তিনিই একান্তভাবে কৃষ্ণগতপ্রাণা। অবশ্য 'বংশীখন্ড' থেকেই রাধা এইরূপে প্রকাশিত। এই খন্ড থেকেই

কৃষ্ণকে বাইরে হারিয়ে তিনি তার প্রেমের স্বরূপ অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীর রাধার মত শুধু অন্তরের সাধনাতেই তৃপ্ত থাকতে পারেননি। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উন্মেষ দেহচেতনার পথ ধরে। বৈষ্ণবপদাবলী'র "কাম গন্ধ নাহি তায়" প্রেমের সন্ধান এখানে পাওয়া যায় না।'তাম্বুলখন্ডে' রাধার কাছে বড়াইয়ের মাধ্যমে প্রেমপ্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কৃষ্ণ মিলনের আকুল আগ্রহে। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে বড়াইয়ের সহায়তায় 'দানখণ্ডে' 'যেন তেন প্রকারণে' রাধার দেহসম্ভোগের চেষ্টায় তিনি রত হন এবং নির্জন প্রান্তরে বলপূর্বক রাধার যৌবন লুণ্ঠন করেন।

এ মিলনে রাধার সমর্থন ও ভালোলাগা কোনোটাই ছিল না। বরং তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ, অসন্তোষ, বিরক্তি, আত্মগ্লানি ও লজ্জা তার মধ্যে বর্তমান ছিল।অথচ 'নৌকাখন্ডে' দেহমিলনের মধ্য দিয়েই তার মানে প্রেমচেতনার অঙ্কুরোদগম হয়। ধীরে ধীরে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রেম পূর্ণ পরিণত রূপ পরিগ্রহ করে। 'বংশীখন্ডে' আছে তারই বর্ণনা। সেখানে বংশীবাদক কৃষ্ণকে খুঁজে ফিরেছেন রাধা। কারণ, বনমালী আড়ালে বসে বাঁশী বাজান, রাধার কাছে আসেন না। তাই 'বংশীখন্ডে'ও রাধার বিরহবেদনার সুর শ্রুত হয় –

"কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ী কালিনী নই কূলে।

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ী এ গোঠ গোকুলে ।।"

বংশীখন্ডে বড়ায়ির মধ্যস্থতায় রাধা কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হলেও মিলনের সম্ভাবনা ছিল না। রাধা কৃষ্ণকে বিনীত নিবেদনে বলেন, 'আজি হইতে চন্দ্রাবলী হইল তোর দাসী'। এবং

"বিরহে আকুলী যবে চাহো মো তোহ্মারে।

তখন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে"।

কিন্তু ঈশ্বর রাধার সেই ইচ্ছারও কোনো মূল্য দেন না। কারণ রাধাবিরহ-এর প্রথম থেকেই তিনি অনুপস্থিত। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়, রাধা কৃষ্ণের পথ চেয়ে বসে থাকেন। ফলে তার বিরহ-দগ্ধ অন্তর তখন পূর্বস্মৃতি রোমন্থনে ব্যাকুল।কানু ছাড়া তার

ধন-যৌবন সবটাই অসাড়। সাজসজ্জা ত্যাগ করে যোগিনী হয়ে তিনি দেশান্তরে গমন করবেন রাধা বারবার বড়াইকে অনুরোধ করেন কৃষ্ণের সন্ধান নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু বড়াই তাকে এখন পাবে কোথায়... কৃষ্ণের প্রনয় উপহার একদিন রাধা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।দূতী বড়াইকে চড় মেরেছিলেন। এখন কৃষ্ণের জন্য কাঁদলে কৃষ্ণ এসে আর ধরা দেবেন না । রাধা তার পূর্ব কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হচ্ছে- এসব কথা বড়াইয়ের কাছ থেকে রাধা কে শুনতে হয়। রাধা নিজ অপরাধ সব স্বীকার করে করে নিয়ে বলে, তিনিও তো তার দূর্দান্ত স্বামী ও শাশুড়ী ননদীর গঞ্জনা উপেক্ষা করে কৃষ্ণের প্রেম আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন। তাছাড়া কৃষ্ণের প্রেম-প্রত্যাখ্যান তার অপরিণত বুদ্ধির কাজ। কৃষ্ণ-প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির পর তিনি ত তার প্রতি-ই সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত চিত্ত। অবশেষে বড়াইকে রাধা অনুরোধ করেন কানুর সন্ধান নিয়ে আসার জন্যে।কিন্তু বড়াই জানায়, সে অতি বৃদ্ধা, এত ঘোরার শক্তি নেই। রাধা নিজেই চন্ডির পূজা করে কৃষ্ণ অন্বেষণে যাক। শেষপর্যন্ত বড়াইয়ের উপদেশ ও আশ্বাসে মিলনপ্রত্যাশী রাধা পরিপাটি বেশভূষা পরিধান করে কদম তলায় কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বসে থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণ আসেন না। বিরহ-দুঃখে রাধার দিন কাটে। একদিন বড়াই সন্ধান দিল কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতে বাজাতে বৃন্দাবনের দিকে গেছেন। বড়ায়ির কথা মত রাধা সেখানে গিয়ে দেখেন কানাই গরু চড়াচ্ছেন। রাধা আনন্দে মূর্ছা গেলেন। বড়াই শুশ্রূষা দ্বারা রাধাকে সুস্থ করে তোলে এবং রাধা কৃষ্ণের কাছে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু কানাই রাধা-কৃত পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহনে বদ্ধপরিকর। রাধার শত অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে তিনি ধ্যানযোগী হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত জানালেন ও নিজ বীরত্ব এবং দেবত্বের কথা বলে রাধাকে গৃহে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস

তেজহ আক্ষার আস।

তাছাড়া রাধা পরস্ত্রী। পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম-বন্ধনে পাপ অবশ্যম্ভাবী। অসুরবধের জন্য তিনি মর্ত্যে জন্মগ্রহন করেছেন। অনেক বাক -বিতণ্ডার পর বড়াইয়ের মধ্যস্থতায় রাধার সঙ্গে মিলনে সম্মত হন কৃষ্ণ। কিন্তু মিলনে পরিতৃপ্ত রাধা ক্লান্ত হয়ে কানুর ক্রোড়ে শয়ন করে নিদ্রামগ্ন হলে কৃষ্ণ তাকে বড়াইয়ের হাতে সমর্পণ করে মথুরায় চলে যান। নিদ্রাভগ্নে আকুল রাধা কৃষ্ণের অন্বেষণে রত হন এবং বড়ায়িকে বারবার কানুর সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন। মাসের পর মাস, দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণের দেখা মেলে না। রাধা তাকে স্বপ্নে দেখেন এবং যথারীতি বিরহ ভারাতুর হন। কারন বৈষ্ণবপদাবলীর রাধার মতো স্বপ্নমিলনে বিরহাবসানের মনোভঙ্গী বড়ুচন্ডীদাস তার রাধার মধ্যে চিত্রিত করেননি। তার রাধা একান্তভাবে বাস্তব পৃথিবীর নায়িকা। রক্তমাংসে সম্পৃক্ত জীবন্ত নারী-প্রতিমা। সপ্নের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক দেখে তিনি আমাদেরই মতো বেদনাহত হন। রাধার চতুরমাস্যার বর্ণনায় প্রকৃতির পটভুমিতে তার বিরহ-ব্যথা তিব্রতর রুপ লাভ করেছে।কৃশতনু রাধার পক্ষে বেঁচে থাকাই এখন কঠিন।তিনি কাতর হয়ে বড়াইকে পুনরায় অনুরোধ করেন কৃষ্ণের সন্ধান নিয়ে আসার জন্য। বড়ায়ি সেই অনুরোধ তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না। তাই ছুটে যায় মথুরায় এবং কৃষ্ণকে তাঁর ব্যাবহারের জন্য তিরস্কার পর্যন্ত করেন। কিন্তু এতে ফল হয় না কিছুই। কারন কানাই তার সিদ্ধান্তে অচল; রাধার নাম শুনে আর তার সেখানে যেতে ইচ্ছা করে না। এর জন্য তিনি রাধার পূর্বকৃত আচরণের কথাই পুনরায় উল্লেখ করেছেন। তিনি তার বর্তমান কর্তব্য-কর্মের কথাও বড়াইকে জানিয়েছেন –

মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস ।

মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ।।

কাব্যটি এখানেই খন্ডিত। এরপর কী হয়েছিল অর্থাৎ এর পরবর্তী ঘটনা গ্রথনে কবির কোন অভিপ্রায় ক্রিয়াশীল ছিল তা জানা যায় না। তবে ঘটনার গতি ও চরিত্রের মানসিক পরিবর্তন ও প্রকৃতি বিচার করে একথা অবশ্যই মনে হয় যে, রাধাকৃষ্ণের মিলন আর সংঘটিত হয়নি; সেরকম সম্ভাবনা জাগিয়েও রাখেননি কবি। তাই কাব্যটি বিয়োগান্তক।

১০.৩। রাধা চরিত্র

বিরহ যন্ত্রনায় যিনি দগ্ধ হন, তিনি জানেন বিরহ কতখানি যাতনাময়। ভালোবাসা মাত্রই যাতনাময়। অবৈধ প্রেম সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে মরুপথে হারিয়ে যাবে জেনেও রাধা শ্যামকে ভালবাসলেন। তার জন্য প্রতিনিয়ত অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হন। সমাজ-সংসারের কাছে কলঙ্কিনী আখ্যা পান। পদাবলীর চণ্ডীদাসের রাধা অবশ্য বলেছেন যে, 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পড়িতে সুখ'। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির পিছনে কণ্টকময় পথচলার ইতিবৃত্ত আছে। বড়ু চন্ডীদাসের রাধা হাসি দিয়ে চোখের জল লুকোতে জানেন না, দুঃখ পেয়েও বলতে পারেনা, সুখে আছেন। তাই রাধা বিরহের প্রায় প্রতিটি পদে রাধা বিরহের হাহাকার শ্রুত হয় ।

স্বপ্নের সঙ্গে রোমান্টিক অনুভূতি ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। কিন্তু স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখে রাধা তৃপ্তি হয় না। তৃপ্তি না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ বড়ু চন্ডীদাসের রাধা মর্ত পৃথিবীর রক্ত-মাংসের সাধারন মানবী। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য তিনি বোঝেন। তাই রাধা বিরহের প্রথম পদেই দেখি কৃষ্ণের দীর্ঘ বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে রাধা বড়াই কে বলছেন-

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন   চিত্তে না পড়ও আশ।

তাক পাঅবোঁ কমন পরকারে।।

এখন বসন্তকাল। প্রকৃতি নব সাজে সেজে উঠেছে। কিন্তু কানু ছাড়া রাধার মন বৃন্দাবন আজ শূন্য।

আইল চৈত মাস   কি মোর বসতী আশ

নিফল যৌবনভারে।।

তাম্বুলখন্ডে এমনই এক বসন্তকালে কৃষ্ণ রাধার জন্য আকুল হয়েছিলেন। আর রাধাবিরহে বিরহ- যাতনা একা রাধার ই। একদিন রাধা কৃষ্ণের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন-

বড়ার বৌহারি আহ্মে বড়ার ঝি।

মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কি।।

কিন্তু রাধাবিরহ সেই রাধা-ই কৃষ্ণ ছাড়া তার জীবন যৌবন নিষ্ফল বলে মনে করেছেন। একদিন সমাজ-সংসারের ভয় রাধা শ্যামের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেননি। পর পুরুষের প্রেমপ্রস্তাব তাকে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই কৃষ্ণ প্রেরিত পান পত্র পদদলিত করেছিলেন তিনি। কিন্তু নৌকা খন্ডে তার মনে যে প্রেমের অঙ্কুরোদগম হলো তাই ধীরে ধীরে বিকশিত ও পল্লবী তো হয়েছে বংশী খণ্ড ও রাধা বিরহে। রাধার কাছে তার সমাজ, স্বামী ও আত্মীয়, পরিজন ও লোকলজ্জা- সবই তুচ্ছ হয়ে গেছে। একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছে প্রেম। অথচ এখন কৃষ্ণের মনোভঙ্গী এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে, তিনি বর্তমানে রাধার প্রতি সম্পূর্ণরূপে গততৃষ্ণ । রাধা এর কারণ বোঝেন না। তাই নিজেকে অপরাধী ভাবেন। ভাবেন, তার পূর্বের ব্যবহারের জন্য বুঝি আজ শ্যাম তাকে ত্যাগ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মনের এই অপরাধবোধ স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়ে তাকে আরো বেশী ব্যথিত ও অনুতাপ দগ্ধ করে। বড়ায়ীকে রাধা বলেন-

তাম্বুল না লৈলোঁ করে তোক মাইলোঁ চড়ে

তেসি কাহ্নু আসুখিল মোর।।

তাহলে এবার,

দ্যুতি ধরো তোর পাএ হের মোর প্রাণ যাএ

কহ মোরে জীবন উপাএ।।

কৃষ্ণকে বাইরে হারিয়ে আজ তার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন বলেই রাধার অন্তর আকুলতা বেদনার ভাষা হয়ে ঝরে পড়েছে। মন বিকাশের পথ ধরেই রাধার চরিত্রটি বিকশিত হয়েছে। তিনি তার পূর্বের ব্যবহারের জন্য নিজেকে যতই অপরাধী ভাবুক না কেন; তার সত্যিই অপরাধ কতখানি ছিল তা ভেবে দেখার বিষয়। মধ্যযুগীয় সমাজ পরিবেশে কোনো নারীর পক্ষেই অবৈধ প্রণয় আহবানে সাড়া দেয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মনেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে। যে সামাজিক ও পারিবারিক

পরিবেশ ও শিক্ষার মধ্যে রাধা বড় হয়েছেন, সেখানে আজন্ম- লালিত সংস্কার ও পাপ-পুণ্য বোধের ধারণা গড়ে উঠেছে।সেটাও একরকম বাধা। রাধা নিজেকে যতই দোষী ভাবুক না কেন, রাধার আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

রাধা বিরহে বসন্ত ঋতুর পটভূমিতে রাধার বিরহ -বেদনা ব্যাপ্তি লক্ষণীয়। একদিকে ঐশ্বর্যময় বসন্ত, অন্যদিকে রাধার ব্যর্থ জীবনের রিক্ততা। এই বৈপরীত্য সমগ্র রাধাবিরহ রাধার বিরহ ব্যাকুলতা কে সুস্পষ্ট ও তীব্রতর রূপ দান করেছে। প্রকৃতি রাজ্যে বসন্ত এলো সেই বসন্ত রাধার চিত্ত আলোড়িত করে অন্যভাবে।

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণি। আল বড়ায়ি গো।

সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানী।।

অর্থাৎ কৃষ্ণ যেদিকে গেলেন বসন্ত সেইদিক জানে না ।তাই রাধার মন এখন দগ্ধ হয়-

এবেঁ মোর মনের পোড়ণী। আল বড়ায়িগো ।

যেন উয়ে কুম্ভারের পনী।।আল।।

নদী, গিরি, গুহা পার হয়ে বড়াইকে তিনি কৃষ্ণের সন্ধান নিয়ে আসার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু বড়াই জানে না কোথায় যাবে।

তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃন্দাবনে।

কেলি করে সেহি গোপীগণে।।

ষোলহ সহস্র গোপী লয়িআঁ।

বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ।।

নানা রসে বসে বনমালী।

তোক্ষাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী।।

একথা শুনে শ্যাম বিরহিণী রাধা বেদনা বিদুর হয়েছে। বঞ্চিত হওয়ার দীর্ঘশ্বাসে চোখে

জমেছে অভিমানের কালো মেঘ। তখনই প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বে জর্জরিত শ্রীমতি প্রেম-লব্ধ অধিকারবোধের জায়গা থেকে কিছুটা ঈর্ষাতুর হয়েছেন, সেই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে অনুশোচনার গভীর খেদোক্তি।বড়াই অবশ্য কানুর দর্শন প্রাপ্তির আশা দিয়েছে রাধাকে। কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়েছে রাধার সঙ্গে কানুর সাক্ষাৎ হয়নি। গভীর আক্ষেপে তিনি বলেছেন-

উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ.

তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন রাধা। কিন্তু আবেগ কম্পিত হয়ে মূর্ছা গেছেন। মূর্ছা ভঙ্গে চলেছে অনুনয়, অনুরোধ, আত্মসমালোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা। কৃষ্ণের বিদ্রুপে ক্ষতবিক্ষত রাধা সংযমের শাসনে নিজেকে বেধেছেন। নিজ প্রেমিকের মুখ থেকে তাকে শুনতে হয়েছে-

ছাড় হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।

রাধার নবজাগ্রত যৌবনকে পর্যন্ত কৃষ্ণ ধিক্কার জানিয়েছে-

এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন ।

পোটলি বান্ধিএঁা রাখ নহুলী যৌবন।।

একদিন রাধার অস্ফুট যৌবন যিনি লুণ্ঠন করেছিলেন, আজ সেই কৃষ্ণ ই রাধাকে তার যৌবন পোটলা বেঁধে রাখতে পরামর্শ দিচ্ছেন। এরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে রাধা বারবার দগ্ধ হলেন। তথাপি তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন না। কারণ এখন তার চোখের তৃষ্ণা, বক্ষে তৃষ্ণা; শুধু কি তাই? চোখেও তার জল। একদা যে রাধার চোখে ছিল আগুন, এখন সেই চোখে তার শুধুই অশ্রু। কৃষ্ণ কে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের ওপর দোষী নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন তিনি। এই ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা বৃহৎ ও মহৎ প্রেমেরই দৃষ্টান্ত।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বড়াইর মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হয়। বাসকসজ্জিকার মতো লজ্জা ভীরু পদক্ষেপে কৃষ্ণের কাছে উপনীত হন তিনি। তাম্বুলরাগে অধর তার রঞ্জিত। লাজবেশে রতি ভাবে কাহ্নের পাশে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেন। স্বামীর জন্য তিনি এখন কৃশতনু। এতই দুর্বল যে প্রায় চলৎশক্তি রোহিত। তবু মিলনে তিনি কোনোভাবেই অনাগ্রহী নন। অবশ্য মিলনান্তে শান্তিতে তার দুচোখ বুজে

এসেছে। নিদ্রামগ্ন হওয়ার পূর্বে নিজের মনের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন কৃষ্ণের কাছে

তোহ্মাকে ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতি।

এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতি।।

এই আত্মসমর্পণ ও স্বীকারোক্তিতে ও শ্যামের হৃদয় আর্দ্র হয়নি। রাধা পরম নির্ভরতায় রতিক্লান্ত হয়ে কানুর উরুতে মাথা রেখে নিদ্রামগ্ন হলে কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে যেতে মনস্থ করেছেন।বড়াইয়ের উপর রাধার দায়িত্ব অর্পণ করে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন । কৃষ্ণ আর ফিরে আসেননি। তবে যাওয়ার আগে বড়াই কে তিনি বলেছেন

তাক রাখিহ যতনে

আপণ আন্তরে।

নিদ্রাভঙ্গ আকুল হয়ে রাধা বিলাপ করেছেন--

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপাল

তার উরে দিল মো সিয়রে।

এই হাহাকারের অবধি নেই। তা অসীম অনন্ত অশেষ। রাধার সকল অনুরোধ, অনুনয় যে হেলায় ভেসে যেতে পারে, তা তার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু বড়ায়ি তাকে সে কঠিন সত্য কথাটা শুনিয়েছে-

বিষম পুরুষ জাতি কপট পুরিত মতি

নানা বলে সে তিরিক রঞ্জে।

ফলে বর্ষার দিবস-রজনীতে রাধার বিরহ ব্যথা আরো তীব্রতা পায়। তিনি আকুল কণ্ঠে বলেন-

কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বরিষা চারি মাস।

এ ভোর যৌবন কাহ্ন করিলে নিরাস।।

রাধার জীবনকুঞ্জে যখন নবযৌবন সমাগত, যখন তা নিবেদনের ব্যাকুল আগ্রহে উন্মুখ,

উদগত; তখন কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করেন। বহু চেষ্টাতেও প্রিয়তম কাহ্নাঞি ফিরে আসেন না। রাধা তার বড়ায়িকে পুনরায় অনুরোধ করেছেন-

চরণে ধরোঁ তোহ্মারে কাহ্ন দেহ একবার।

রাধার অনুরোধে বড়ায়ি মথুরায় ছুটেও গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন-

আর তার মুখ না দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।

রাধার মুখ দর্শন এর কোন ইচ্ছা আর কানুর নেই। এমনকি রাধার নাম শুনতে তার ইচ্ছা করে না। ফলে কানু প্রেমবঞ্চিত অনন্ত বিরহ ই রাধার জীবন পরিণাম।

দেখা গেল-

১. রাধা বিরহে রাধার বিরহ বেদনারই ব্যপ্তরূপ প্রকাশিত। সেই সঙ্গে তার প্রেম উৎকর্ষতা ও প্রেমের গভীরতা দিকটিও পরিস্ফুট।

২. স্বপ্ন দর্শনে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের পার্থক্য রাধার বিরহ যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তুলেছে।

৩. কৃষ্ণের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে গৃহসুখ পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছেন তিনি। ঠিকভাবে গৃহকর্ম সমাপনও তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

৪. কৃষ্ণের বিদ্রুপ উক্তিতে তিনি দগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। রঙ্গ রস, ছলা কলা- এসব এখন তার জন্য নয়, তার জন্য আছে শুধু চোখের জল।

৫. রাধা বিরহের রাধার সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রূপের পরিবর্তে কৃষ্ণপ্রেমে একনিষ্ঠ তার পরিচয় ই লক্ষ্য করা যায় ।

৬. সহিষ্ণুতার বড় পরিচয় কাব্যের এই অংশে তিনি রেখেছেন।

৭. তিনি পদাবলীর রাধার মতোই সরলা। তাই সরল বিশ্বাসে স্বামীর কোলে মাথা রেখে নিদ্রামগ্ন হয়ে তার চির প্রস্থানের অভিসন্ধি পূরন সহজ করে দিয়েছেন

৮. কৃষ্ণকে অনাসক্ত জেনে তিনি অভিমানাহত হয়েছেন এবং বনমালীর বঞ্চনার প্রতিবাদ না করে আত্ম অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন।

৯. রাধার বিরহ মূর্তি এই অংশের শ্রেষ্ঠ সম্বল।

বড়াইয়ের মতো বিচক্ষণ প্রবীণার পক্ষেও রাধার প্রতি গততৃষ্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ বোঝা সম্ভব হয়নি।

১০.৪। কৃষ্ণ চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ রয়েছেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন। কামনা-বাসনায় উদ্দাম মানব চরিত্র। বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণিত হলেও বৈকুণ্ঠের মহিমা তার নেই।

তাম্বুলখন্ডে কৃষ্ণকে দেখা যায় বনভূমিতে গোচারণে নিযুক্ত অবস্থায়। বড়াই এর মুখে মনমোহিনী রাধার রূপ বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু বড়াই এর মাধ্যমে প্রেরিত কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এই প্রত্যাখ্যান নীরবে মেনে নেওয়া যৌবন ধর্মের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন কৃষ্ণ। তাই ছলে-বলে-কৌশলে রাধা কে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। রাধার দেহসম্ভোগ এর জন্য মহা দানি সেজেছেন, খেয়া নৌকার নাবিক হয়েছেন, ভার বহনের জন্য মজুরিয়া হয়েছেন । কালীয় নাগ দমন করে কালীদহের জল বিষ মুক্ত করেছেন । দান খন্ড যে ভাষায় রাধার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ করেছেন কৃষ্ণ তা নিঃসন্দেহে রুচিবিগর্হীত । এছাড়া নৌকা খন্ড ও তার আচরণ শালীনতার মুখ রক্ষা করেনি। যমুনা খন্ডে রাধা ও তার সখীদের বস্ত্র লুকিয়ে রেখে কৃষ্ণ বিবস্ত্রা রাধার প্রতি যে আচরণ করেছেন তাও পাঠকের সমর্থন পায় না। বান খন্ডে তার ব্যবহার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। বংশী খণ্ড আর রাধা বিরহ এ রাধার প্রতি গত তৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ফলে বড়ুচন্ডীদাস কৃত কৃষ্ণচরিত্র পাঠক ও সমালোচক সকলের কাছেই মোটের ওপর ধিক্কৃত হয়।

রাধা বিরহের প্রথমে দেখি কৃষ্ণ রাধার কাছে আসেন না। ফলে বিরহবেদনায় রাধার দিবস-রজনী অতিবাহিত হয়। আসলে বংশী খণ্ড থেকে কৃষ্ণের ব্যবহারের এই পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

নব সৃজিত বাঁশি কৃষ্ণ নেপথ্যে বসে বাজান, রাধাকে দর্শন দেন না। ফলে বহু কৌশলে বড়াইয়ের তৎপরতায় রাধাকৃষ্ণের দর্শন মেলে। বড়াই কানাই কে নিদ্রাউলি মন্ত্রে ঘুম

পাড়ালে রাধা সেই অবকাশে শ্যামের বাঁশি চুরি করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের ক্রন্দন আকুল অবস্থা সহ্য করতে না পেরে বড়াই পরামর্শে রাধা কানু কে তার বাঁশি ফিরিয়ে দেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে পাশে ফিরে পেয়ে কৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, রাধার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন না। কিন্তু পূর্ববর্তী অন্যান্য খন্ড গুলিতে আমরা এর বিপরীত চিত্র দেখেছি। সুতরাং বংশী খণ্ডের পরবর্তী রাধাবিরহ কৃষ্ণের গত কৃষ্ণ রুপ ই অনিবার্যভাবে আমাদের প্রত্যক্ষীভুত হয়েছে। সহজভাবে বললে বলা যায় বংশীখন্ডে কৃষ্ণের আচরণ মানসিক পরিবর্তনের রেশ রাধাবিরহেও সঞ্চারিত হয়েছে এবং রাধার বিরহ বেদনা কে আরও তীব্র করে তুলেছে ।

রাধাবিরহ এর প্রথম থেকে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা না গেলেও পরোক্ষভাবে তিনি উপস্থিত রাধার স্বপ্নে, তার স্মৃতিচারণায়, বড়াইয়ের সঙ্গে শ্যাম প্রসঙ্গের অবতারণা ও আলোচনায়। সুতরাং তিনি অনুপস্থিত থেকে উপস্থিত এবং এই খন্ডের কাহিনীর গতি ও চরিত্রগুলির প্রকৃতি পরিস্ফূটন ও নিয়ন্ত্রণের তার ভূমিকা ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিরহ ব্যাথা রাধা এই খন্ডের একাধিক পদে কৃষ্ণের কথা ব্যক্ত করেছেন বড়াই এর কাছে। সুতরাং কৃষ্ণ রাধা বিরহের মধ্যমণি তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আচরণ ও সিদ্ধান্তের ওপরই রাধার ভাগ্য নির্ভরশীল। রাধার তীব্র ব্যাকুলতার উত্তরে বড়াই বলেছে, কৃষ্ণের গায়ের রং কালো, মন তার কঠিন। অনুরোধ করলেও তিনি তোমার কাছে আসেন না। তোমার প্রেম লাভের জন্য অনেক দুঃখ পেয়ে তিনি বৃন্দাবনে চলে গেছেন। নিজের মনকে শান্ত করে থাকো। নিজের মানে রেখে কৃষ্ণ নিজের জায়গায় ফিরে গেছেন। তাকে আর কি করে পাবে।

কাল কাহ্নঞিঁ কঠিন তার অন্তরাল

বোলেঁ চালেঁ না আইসে তর থানে।।

তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ

গেলা বৃন্দাবনে।।

বড়াই এর এই মন্তব্যে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী কৃষ্ণের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। তার প্রস্থানের কারণ স্বরূপ রাধাকে অভিযুক্ত করারও চেষ্টা আছে। আসলে পূর্বের সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার এবং ঔচিত্য-অনৌচিত্য বোধের জায়গা থেকে রাধা কৃষ্ণের প্রেম আহবানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিতে পারেননি।পরে অবশ্য সেই প্রেমকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি কালিয়দমন খন্ডে সর্বসমক্ষে কানাই কে ' পরাণপতি 'বলে উল্লেখ এর মধ্য দিয়ে । বৃন্দাবন খন্ডে নিজে রাধা মিলনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এখানে ভালোবাসার সঙ্গে তার মনে অধিকারবোধের ও প্রকাশ দেখি। শ্যামকে অন্য গোপীদের সঙ্গে বিলাসরত দেখে তিনি অভিমানাহত হয়েছেন । অবশ্য এই খন্ডে কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জন এর যে চেষ্টা করেছেন তাতে তারও রাধানুরাগ অস্পষ্ট থাকেনি । কিন্তু সমস্যা তৈরি হলো যমুনাখন্ডে (বস্ত্রহরণ খন্ড)। কৃষ্ণ রাধা ও অন্য গোপীদের বস্ত্রহরণ করে লুকিয়ে রাখলেন এবং রাধাকে বিবস্ত্র অবস্থায় করোজোড়ে বস্ত্র প্রার্থনা করতে বললেন। উপরন্তু রাধার হার লুকিয়ে রেখে তার পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি করলেন। ফলে রাধাকে যশোদার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণ কে হার চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন তিনি। স্বেচ্ছাচারী পুরুষের আত্মসম্মান আহত হলে তারা বোধহয় নিষ্ঠুরতার শেষ সীমায় পৌঁছে যান। কারণ, তারা নিজেদের মান মর্যাদা নিয়ে যতটা ভাবেন, অন্যেরটা নিয়ে ততটা মাথা ঘামান না। নইলে কৃষ্ণ বুঝতেন একদিন তার দ্বারা রাধার নারীত্ব ও সম্মান কি ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং সমস্যার কোন জায়গা থেকে রাধা তাঁর হার ফিরে পেতে চাইছেন। তাই রাধার দুর্ব্যবহারে পটু - এমন একটা সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন এবং বড়াইও তাকে সমর্থন করেছে। তাই বানখন্ডে রাধা কে উচিত শিক্ষা দেওয়ার এত তোড়জোড় এবং রাধাবিরহ কৃষ্ণের উদাসীন ও অনুপস্থিতির জন্য রাধা কে দায়ী করার চেষ্টা। ফলে রাধার মধ্যে অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি জাগ্রত হয়েছে। আরোপিত দোষ সবই মেনে নিয়েছেন তিনি এবং নিজেও কৃতকর্মের কথা বারবার উল্লেখ এর মধ্যে দিয়ে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন । বড়াই কৃষ্ণের সন্ধান জানতো। তাই রাধাকে বলেছে - বনমালী তোমাকে ছেড়ে গেছেন। তিনি বৃন্দাবনে ষোল সহস্র গোপী নিয়ে নানা রঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন -

যোলহ সহস্র গোপী লয়িআঁ।

বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ।।

নানা রসে রসে বনমালী।

তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী।।

লঘু পাপে গুরু দণ্ড বলে একটা কথা আছে। রাধার প্রতি কানুর আচরণ অনেকটা সেইরকম। শেষ পর্যন্ত বড়াইয়ের উদ্যোগে রাধা শ্যাম এর দেখা পান এবং নিজের পূর্বের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে ক্ষমা করেন না। বরং রূঢ় ভাষায় বলেন

চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী

ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী।।

অর্থাৎ যাও যাও গোয়ালিনী ঘরে গিয়ে পতি সেবা করো । আমার প্রতি মন রেখো না। এখন আমি তোমার যৌবনকে অবহেলা করি। তোমার প্রতি আমার আর অনুরাগ নেই। বলা বাহুল্য, রাধা যে পূর্বে কৃষ্ণ কে বলেছিলেন, ঘরে তার সর্বাঙ্গসুন্দর পতি আছে (ঘরের সামী মোর সর্বাঙ্গসুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা), কৃষ্ণের উক্তি তারই প্রতি তীব্র কটাক্ষ। একদিন রাধার যৌবন সম্ভোগের তীব্র কামনায় কৃষ্ণ সমাজ-সংসারের কথা ভাবেন নি, পাপ পূণ্য বোধের দ্বারা চালিত হননি। কিন্তু রাধাবিরহ রাধার প্রতি বিতস্পৃহার জায়গা থেকে তিনি ব্যঙ্গোক্তি করেছেন -

এবে গোআলিনী কেহ্নে পোড়ে তর মন

রাধা কৃষ্ণকে বলেছিলেন -

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভান্ডার

অর্থাৎ রাধার নবযৌবনের দ্বার এখনো উদ্ঘাটিত হয়নি। তখন কৃষ্ণ কিন্তু রাধার সমস্ত বক্তব্য অবহেলা করে ভোগ বাসনায় মত্ত হয়ে বল পূর্বক তাকে সম্ভোগ করেছিলেন। রাধা যখন তাকে মামী-ভাগিনার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়েছেন, তখন কাঁহাঞি বলেছিলেন -

নহসি মাউলানি রাধা সম্বন্ধে শালী

অথচ আজ রাধাকে তীব্রভাষায় বিদ্রুপ করে কৃষ্ণ বলছেন -

এবেসি জানিল ভৈল কলি অবতার

সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।।

অর্থাৎ,এতদিনে বুঝলাম কলিকাল এসেছে। তাই এত লোক থাকতে তুমি ভাগিনাকে অবৈধ রূপে কামনা করছ। রাধার পূর্বের ব্যবহারের শাস্তি প্রদানের জন্য এ কৃষ্ণের এই আচরণ। রাধাকে এড়াবার তাগিদে তিনি নিজের যোগসাধনার কথাও কৃষ্ণ বলেছেন। কৃষ্ণ এখন দিনরাত যোগ সাধনায় মগ্ন। রাধার মোহে ভুলেও তিনি আচ্ছন্ন হবেন না ।

অথচ বড়াই প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এই কৃষ্ণ এখন -

হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞাঁ

কাহ্নু রতি ভুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে।।

অন্য যুবতীদের নিয়ে যে কানাই কুঞ্জে কুঞ্জে রতি-ক্রীড়ায় মতো আছেন তিনি রাধাকে যোগ সাধনার কথা বলে মিথ্যাচারিতা ও বাকচাতুর্য এরই পরিচয় রেখেছেন। তাছাড়া যোগীর নির্লিপ্তি যদি তার মধ্যে সত্যিই থাকতো, তাহলে রাধাকে তিনি বিদ্রূপ বানে বিদ্ধ করতেন না, বা তার পূর্বের ব্যবহারের কথা বারবার মনে করিয়ে রাধাকে বিব্রত করতেন না। রাধা অপরাধী হোক বা না হোক তাকে তিনি ক্ষমা করতেন। তাছাড়া যোগীর তো অহমবোধশূন্য হওয়ারই কথা! কিন্তু কানাই একেবারে অহমশুন্য নন। বরং তিনি আত্মপ্রচারে উন্মুখ -

"রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম

আহ্মার শুন তোহ্ম এ কথা।"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বড়াই সনির্বন্ধ অনুরোধে কানু রাধার সঙ্গে মিলনে সম্মত হন, এবং এই সম্ভোগচিত্রে রতিক্রিয়ায় পারদর্শী কৃষ্ণ কে একবারও যোগী বলে মনে হয় না। তবে মিলনের অবসানের আধার গভীর আত্মনিবেদন উপেক্ষা করে নিদ্রামগ্ন রাধাকে

বড়াইয়ের হাতে সমর্পণ করে তিনি চিরদিনের জন্য মথুরায় গমন করেন। যাত্রার পূর্বে রাধাকে জানিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না। এমনকি রাধার কাতরোক্তি -

তোমাকে ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী

তবুও কৃষ্ণের কাছে কোন মূল্য পায় না রাধা। তবে যাত্রার পূর্বে কানু বড়ায়ি কে বলেন-

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে ।
এবেঁ মেলিনী দেহ আহ্মার।।

বড়াইয়ের অনুরোধ রক্ষার জন্যই এই মিলন ! কানুর নিজের ইচ্ছায় নয় । তাই অনুরোধ রক্ষার পরই বিদায় গ্রহণের তোড়জোড়। ভাবতে অবাক লাগে, রাধার প্রতি এতটাই বিতস্পৃহ কৃষ্ণ। ভালোবাসা কবে এমন উপেক্ষায় পরিণত হল ? নাকি রাধার প্রতি তার কোন ভালবাসায় ছিল না, যা ছিল তা শুধুই দেহাসক্তি ? অবশ্য বিদায় নেওয়ার পূর্বে বড়ায়িকে তিনি বলেছেন -

তাকে রাখিহ যতনে আপন আন্তরে
যাইবো আহ্মে মথুরা নগরে ।।

কৃষ্ণের এই উক্তিতে অনেকেই তার প্রেমিকসত্তার সন্ধান পেয়েছেন। বলেছেন কৃষ্ণ হৃদয়হীন নন। তার দায়িত্ববোধ তাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু কিছু পূর্বে যার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন কাহ্নাঞি তার প্রতি এই মমতা বচন সত্যিই অবিশ্বাস্য। তাছাড়া রাধার চোখের জল, আত্মনিবেদনের ভাষা,সমর্পনের ভঙ্গি দেখে কৃষ্ণ কেমন করে ভাবলেন তাকে বাদ দিয়ে রাধাকে আর কারোর পক্ষে ভালো রাখা সম্ভব। এরমধ্যে চালাকি আছে, প্রেম ও দায়িত্ববোধ নেই। যদি তা থাকবেই, তাহলে বড়াই যখন বিরহাতুরা রাধার বার্তা নিয়ে কৃষ্ণের কাছে ছুটে গেছে, তখন কৃষ্ণ এমন রূঢ় বচনে কখোনই বলতেন না -

"জায়িতে না ফুরে মন নাম শুনি তারে" ।

- একজন প্রেমিকা সম্বন্ধে প্রেমিকের এই ঘোষণায় সম্পর্কের মিথ্যাটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য এতে নারীর প্রেম লাঞ্ছিত হয়। কৃষ্ণ যখন বলেন-

"আর তার মুখ না দেখে সুন্দর কাহ্নাঞি "

শুনে বড়াই প্রতিবাদীর স্বরে বলে

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞি তোহ্মার চরিত।

রাধা কৃষ্ণের প্রেমের সব ঘটনাই যে প্রত্যক্ষ করেছে তার তো অবাক হওয়ারই কথা। কথায় বলে নারীদের মন দেবতারাও জানেন না ! আর পুরুষের চরিত্র তাও কি বোঝা সম্ভব? আবার সেই পুরুষ যদি দেবতা হন !

তাই বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের জন্ম খন্ড কৃষ্ণের জন্মের কারণ এবং কাব্য শেষে সেই কারণের ফলসিদ্ধির যে সম্ভাবনায় ব্যক্ত হোক না কেন, মানুষ বা দেবতা কোন হিসাবে কৃষ্ণ চরিত্রটি মহিমান্বিত হয় না। বিরহ সম্বল করে যে বেঁচে রইল সেই রাধাই পাঠকের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে।

১০.৫। বড়াই চরিত্র

বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র বড়াই। কাব্যের প্রথমে সে আইহনের ইচ্ছায় তার জননী কর্তৃক রাধা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। রাধা শাশুড়ি তাকে রাধার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। সে সম্পর্কে রাধার বড় আই মানে তার মায়ের পিসি। সুতরাং রাধা তার আদরের নাতনি। তার সঙ্গেই রাধা সহ অন্য গোপ যুবতীরা মথুরার হাটে দুই দুধ বিক্রি করতে যায় ।অর্থাৎ প্রবীণা বড়াই অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানের সঙ্গে এইসব যুবতীদের তত্ত্বাবধান করে। কিন্তু এরই মাঝে একদিন রাধা বালিকাসুলভ চাপল্যের কারণে রঙ্গ রসিকতা করতে করতে বন মাঝে পথ হারালে বড়াই চিন্তান্বিত চিত্তে তা অনুসন্ধানে রত হয় এবং গোচারণ কৃষ্ণের দেখা পেয়ে তার কাছে রাধা সন্ধান জিজ্ঞাসা করে। এই সন্ধান পাওয়ার জন্য বড়াইকে স্বাভাবিক কারণেই রাধার চেহারার বর্ণনা দিতে হয়েছে, আর তা শুনে কানাই

রাধাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে বড়াইকেই অনুরোধ করেছেন রাধার সঙ্গে তার প্রেম বন্ধন সাধনের জন্য। কানুর প্রতি স্নেহলীলা বড়াই তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি এবং নাতি সম জ্ঞানে কানাইয়ের আবদার রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া বড়াই কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত ছিল। সে জানতো, রাধার স্বামী আইহন নপুংসক এবং কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। সুতরাং এই ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হলে রাধার জীবন যৌবন সফল হবে। তাই রাধার কাছে কৃষ্ণ প্রদত্ত কর্পূর তাম্বুল সহ প্রেমপ্রস্তাব সে বহন করে নিয়ে গেছে। কিন্তু আজন্মলালিত সতীত্বের সংস্কারের কারণে রাধা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বড়াই বারবার রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি সদয় হবার অনুরোধ জানালে রাধা তাকে তিরস্কার ও চপেটাঘাত পর্যন্ত করেছেন, যা বড়াইর আত্মসম্মানবোধকে আহত করেছে। ফলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার ব্যবহার এর প্রতিশোধ গ্রহণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে সে। এসব ঘটনা ঘটেছে তাম্বুল খন্ডে। অর্থাৎ এই খন্ড থেকে বড়াই কৃষ্ণের দূতীতে পরিণত হয়েছে এবং ছলে-বলে-কৌশলে কৃষ্ণের রাধা সম্ভোগের উদ্দেশ্য সংসাধন এর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বান খন্ডে রাধার উদ্দেশ্যে পঞ্চশর নিক্ষেপ করার জন্য কৃষ্ণ কে বারবার উজ্জীবিত করেছে বড়াই। কিন্তু কৃষ্ণের নিক্ষেপিত বানে রাধা চেতনা হারালে উদ্বিগ্ন বড়াই এই কাজের জন্য কাউকে দোষারোপ করেছে। এখানে রাধার জন্য তার হৃদয়ে স্নেহ সুধা ক্ষরিত হয়েছে এবং বংশী খণ্ড ও রাধা বিরহে মূলত রাধার সহমর্মী রূপেই আমরা তার উপস্থিতি লক্ষ্য করি। বংশী খন্ডে রাধার মনোবেদনা শ্রবণের একমাত্র শ্রোতা বড়াই। তাঁরই উদ্যোগে রাধার পক্ষে কৃষ্ণের বাঁশি চুরি সম্ভব হয়েছে এবং দীর্ঘ ও দর্শনের পর উভয় এরই সাক্ষাৎ ঘটেছে।কৃষ্ণের অনুসন্ধানে রাধার অনুরোধে ব্যাপৃত হয়েছে বড়াই রাধার প্রতি মমত্ব ও সহানুভূতির কারণেই। রাধা সম্বন্ধে কানুর মানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটেছে তা সম্ভবত বড়াই জানতো। তাই রাধা বিরহ 'বিরহশরাতুরা রাধা'র মনোবেদনা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে সে। রাধাকে আত্মসংযমের উপদেশ দিয়েছে,কৃষ্ণের প্রতি তার পূর্ব ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে চিত্ত নিবৃত্তির পরামর্শ দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বলেছে- " তবে কাহ্নাঞি লাআ বৃন্দাবনে/ কেলি করে সেহি গোপিগণে ।। ষোলহ সহস্র গোপি লয়িআ।/

বৃন্দাবন মাঝত বসিআ।/ নানা রসে বসে বনমালী/ তোহ্মাক বঞ্চিআ চন্দ্রাবলী"।

বাকচাতুর্যে অসাধারণ বড়াই উপস্থিত বুদ্ধিতেও অসামান্য ছিল। তার এই দুটি গুণের কাছে কৃষ্ণ, রাধা, আইহন ও আইহন জননী ও মাঝেমাঝেই হার মেনেছে। তাই তার কথায় বিশ্বাস করে মথুরার হাটে যাওয়ার সময় রাধা কৃষ্ণের কবলে পড়েন এবং পূর্বপরিকল্পনা মত বড়াই অন্যত্র কিছুটা অন্তরালবর্তী হয় ও কৃষ্ণ বলপূর্বক রাধা সম্ভোগে লিপ্ত হন। দানখণ্ডে বড়াই ও কৃষ্ণের যৌথ ষড়যন্ত্রে রাধার যৌবন কৃষ্ণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হল। নৌকাখন্ডে দেখি একই আয়োজন।

চাতুর্যময়ী বড়াই রাধার কাছে এমন নির্লিপ্তির অভিনয় করেছে যে, রাধার পক্ষে বড়াইয়ের ভূমিকা বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। বড়াই সুযোগ পেলেই রাধাকে উপদেশ দিয়েছে- যৌবন সাগরে তোর কাহ্নাঞি ভেলা। বলাবাহুল্য একদিন এই দেহ মিলনের মধ্য দিয়ে মানব মনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী রাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়েছে। তখন রাধার ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কাজ করেছে বড়াই। তবে দানখন্ড পর্যন্ত মূলত সে কৃষ্ণের দূতী রূপে নিজের পরিচয় রেখেছে।

বাকচাতুর্যে অসাধারণ বড়াই উপস্থিত বুদ্ধিতেও অসামান্য ছিল। তার এই দুটি গুণের কাছে কৃষ্ণ, রাধা, আইহন ও আইহন জননী ও মাঝেমাঝেই হার মেনেছে। তাই তার কথায় বিশ্বাস করে মথুরার হাটে যাওয়ার সময় রাধা কৃষ্ণের কবলে পড়েন এবং পূর্বপরিকল্পনা মত বড়াই অন্যত্র কিছুটা অন্তরালবর্তী হয় ও কৃষ্ণ বলপূর্বক রাধা সম্ভোগে লিপ্ত হন। দানখণ্ডে বড়াই ও কৃষ্ণের যৌথ ষড়যন্ত্রে রাধার যৌবন কৃষ্ণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হল। নৌকাখন্ডে দেখি একই আয়োজন।চাতুর্যময়ী বড়াই রাধার কাছে এমন নির্লিপ্তির অভিনয় করেছে যে, রাধার পক্ষে বড়াইয়ের ভূমিকা বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। বড়াই সুযোগ পেলেই রাধাকে উপদেশ দিয়েছে- যৌবন সাগরে তোর কাহ্নাঞি ভেলা। বলাবাহুল্য একদিন এই দেহ মিলনের মধ্য দিয়ে মানব মনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী রাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়েছে। তখন রাধার ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কাজ করেছে বড়াই। তবে দানখন্ড পর্যন্ত মূলত সে কৃষ্ণের দূতী রূপে নিজের পরিচয় রেখেছে। এতে রাধার বিরহ যন্ত্রণা প্রশমিত হয় নি। ফলে বড়াই কৃষ্ণের

সন্ধানে প্রবৃত্ত হবার জন্য পুনরায় রাধা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছে। রাধা এই মানসিক বিপর্যয়ের সময় বড়াই ই তার একমাত্র সঙ্গী। প্রয়োজনমতো বুদ্ধি-পরামর্শ রাধা বড়াইয়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। কৃষ্ণের মনের গতি ও পরিবর্তন জানা ছিল বলে বড়াই রাধাকে তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। কখনো বা তিরস্কারও করেছে। রাধার প্রেম পরিণতি পাবে না- একথা অনুভব করে সে রাধাকে স্বামী-সংসারের মনোসংযোগের অনুরোধ করেছে। বংশী খন্ডে বাঁশি ফিরে পাওয়ার জন্য কানাই কে রাধার কাছে হাত জোড় করতে হয়েছে। এটিও তার কাছে মনে হয়েছে অপমানকর । বড়াই তাও জানিয়েছে রাধাকে-

তকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী
যোড়হাথ করী বনমালী।
তাত বড় পাইল অপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্নু।।

বোঝাই যাচ্ছে যে কাব্যের রাধা বিরহ অংশে কৃষ্ণের গতিবিধি সম্বন্ধে বড়াই অবগত। কিন্তু কৃষ্ণের আচরণ তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, তারপরও শারীরিক অক্ষমতাও বড়াইয়ের তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করেছে। তাই রাধা কৃষ্ণের দর্শন ও মিলন সাধনের অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারছে না। তথাপি রাধার অনুরোধে সে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করেছে, এক মুহূর্তের জন্য রাধার সঙ্গ ছাড়া হয়নি, এমনকি কৃশ তনু রাধার বার্তা নিয়ে ছুটে গেছে কৃষ্ণের কাছে-

তনের উপর হারে
আল মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয় খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে।।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'এই কথা উচ্চারিত হলেও বড়াই এক্ষেত্রে সুখী সুলভ মমত্ব পূর্ণ আচরণ-ই করেছে। কথা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করার ক্ষমতা তার বরাবরই ছিল। এবারও সে ব্যর্থ হয়নি। তার ঐকান্তিক চেষ্টায় কানাই রাধার ই সঙ্গে মিলনে

সম্মত হয়েছেন। বড়াই কৃষ্ণের মুখচুম্বন করে মাথায় হাত বুলিয়ে তার হাত ধরে কাতর অনুনয় করেছে বলেই

"ঈসত হাসিআ কাহ্নু হৃদয়ত গুণী ।

বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী ।।"

অর্থাৎ বড়াই না থাকলে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলনে কোন আগ্রহী প্রকাশ করত না। সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ বড়াই এরপর পরম যত্নে রাধাকে অভিসারিকার বেশে সজ্জিত করেছে । ফলে রাধার অনুপম রূপ দর্শনে কৃষ্ণের হৃদয় চঞ্চল হয়েছে। মিলনের পর রতিশ্রান্ত নিদ্রামগ্ন রাধাকে ত্যাগ করে মথুরা যাওয়ার সময় কানাই বড়াইয়ের উপরই রাধার দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন এবং বলেছেন যে বড়াইয়ের অনুরোধেই তিনি রাধার সঙ্গে রতিবিলাস করেছেন।

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে ।

এবেঁ মেলিনী দেহ আহ্মার।।

বড়াইয়ের কথাকে কানাই মূল্য দেন। তবে কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর বড়াইয়ের হয়েছে উভয় সংকট। রাধার মনোবেদনা প্রশমন এর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে সে। রাধার চতুরমাসের দুঃখ-বেদনার সহমর্মী হয়েও কোন সমাধানে পৌঁছতে পারিনি সে। উপায়ন্তর না দেখে রাধাকে 'পাপ মতি না বাসসি লাজে' (পাপ বুদ্ধি সম্পন্না, তোমার লজ্জা নেই) বলে তিরস্কার পর্যন্ত করেছে। আবার রাধার অশ্রুজল আখি প্রত্যক্ষ করে তারও দৃষ্টি নয়ন জলে সিক্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে রাধার বার্তা নিয়ে মথুরায় কৃষ্ণের কাছে গেছেও । কিন্তু এবার চাতুর্যময়ী বাক্ পটিয়সী বড়াইয়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কৃষ্ণ এই প্রথম বড়াইয়ের অনুরোধ অস্বীকার করেছেন। তার কাছে ব্যক্তিগত প্রেম অপেক্ষা কর্তব্য বুদ্ধি এতটাই বড় হয়ে উঠেছে যে, বড়াইকে তিনি বলেছেন -

মথুরা আইলাহোঁ তেজি গকুলের বাস।

মন কৈলোঁ করিবোঁ ম কংসের বিনাস।।

কৃষ্ণের এই যুক্তির কাছে শুধু বড়াই কেন, সকলেরই হার মানতে হয়। কিন্তু তার আগে যে যুক্তি গুলির অবতারণা করেছে সে তা কানুর প্রতি স্নেহশীলা বড়াইয়ের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কৃষ্ণের রাধার প্রতি তীব্র বিতরাগ- " আর তার মুখ না দেখে সুন্দর কাহ্নাঞি " - বড়াই সমর্থন করতে পারেনি, যদিও সে একাধিকবার কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার দুর্ব্যবহারের সমালোচনা করেছে।

কাব্যের এই অংশে সে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। রাধার সমালোচনা করলেও সে জানে শ্যামের প্রতি রাধার যথার্থ অনুরাগ এর কথা। তাছাড়া ,লঘু পাপে গুরু দণ্ড কেই-বা সমর্থন করে? যে কানু একদা রাধার জন্য ব্যাকুল আকুল ছিল, এখন তিনি তাঁর প্রতি এতটাই বীতশ্রদ্ধ যে অনায়াসে বলতে পারেন-" জায়িতে না ফুরে মন নাম শুনী তারে।"

কাহ্নাঞি ব্যবহারের এই পরিবর্তন বড়াইকে হতাশ, ব্যথিত ও বিস্ময়বিহ্বল করে। তাই কৃষ্ণের সমালোচনা করে সে স্পষ্ট ভাষায় বলে - " বুঝিতে না পারো কাহ্নাঞি তোহ্মার চরিত"। কানুর চারিত্রিক সমস্যার মূল জায়গাটায় নাড়া দেয়।

ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে ।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদবাহ কেহ্নু।।

এতদিন যে রাধার জন্য কানাই ভাত খায়নি, আজ শাকর খাওয়ার জন্য সে তবে এত উন্মুখ কি কারনে। বাস্তব থেকে উপমা চয়ন করে কৃষ্ণের চরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছে বড়াই । সোনার ঘর ভাঙলে জোড়া যায়, উত্তমজনের প্রেম তেমনি। কিন্তু যে জন অধম, যার অন্তর কাপট্যে পূর্ণ তার প্রেম ভাঙলেও জোড়া লাগে না। কানুর প্রেম যে এই দ্বিতীয় শ্রেনীর দলে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়েও দিয়েছে বড়াই।

কৃষ্ণ কে সে এতটাই বিশ্বাস করেছিল যে রাধার প্রতি তার আচরণ তাকে বিস্ময়বিহ্বল করেছে। কানাইয়ের অন্তর কঠিন এ কথা পড়ে বুঝলেও রাধার প্রতি তার অনুরাগ এইভাবে চূড়ান্ত বীতরাগে পৌঁছে যাবে তা সে ভাবেনি। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রথম পর্যায় সমালোচনা করেছে বড়াই। এর মূলে নাতি কানাই এর প্রতি তার ভালবাসা এবং তার দেবরের প্রতি আস্থা- দুই-ই ছিল। তাই রাধা কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত

হয়ে তার জীবন যৌবন সার্থক করুক- এমনটা সে চেয়েছে। কিন্তু দেবতা যে এত নিষ্ঠুর হতে পারেন তা বড়ায়ির জানা ছিল না। যখন জেনেছে তখন নাতনির রাধার প্রতি তার মন সহানুভূতি ও মমত্ব পূর্ণ হয়ে গেছে । তখন স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণের সমালোচনাও সে করেছে। রাধা ও কৃষ্ণের মেলবন্ধনে সমগ্র কাব্যে যার তৎপর ও সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়, রাধা বিরহে তারই কণ্ঠে খেদোক্তি ও অসহায়তা ধ্বনিত হয়, যখন কানাই কে সে বলে -

রাধিকা থাকিলা বসই আপনার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে।।
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণ।।

এই অসহায়তা শুধু তার আসা যাওয়ার কষ্ট সংক্রান্ত নয়, এর মূলে আছে কৃষ্ণ রাধার চিরস্থায়ী প্রণয় বন্ধনে তার অকৃতকার্যতা। পুরুষের কপটতার কাছে হেরে গিয়েছে বড়াই। পারিনি রাধার বেদনা ব্যথা প্রশমিত করতে। অথচ তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। সমগ্র রাধাবিরহে রাধার সহমর্মী, সখি ও পরামর্শদাত্রীরূপে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি তারই পরিচায়ক।

১০.৬। রাধাবিরহ - রাধাবিরহ কি প্রক্ষিপ্ত ?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অন্তিম খন্ড রাধাবিরহ-এ খন্ড কথাটি যুক্ত নেই। এই অনুপস্থিতির কারণে কেউ কেউ মনে করেন কাব্যের এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত; আবার কারও মতে তা আদৌ প্রক্ষিপ্ত নয়। এই বিষয়ে যেসব যুক্তি ও আলোচনার অবতারণা হয়েছে সেগুলি হল -

প্রথমতঃ রাধাবিরহ কে স্বতন্ত্র একটি কাব্য বলা উচিত; তাই তা খন্ড নয়। ভাবের গভীরতা ও মূলত রাধা চরিত্রের সমান উন্নতির গুনে এটি অন্য খন্ড গুলি থেকে পৃথকরূপে স্বতন্ত্র কাব্য হয়ে উঠেছে, যা বড়ু চন্ডীদাস কৃত বলে মনে হয়না।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বে ' দানখন্ডে' কড়ি হিসেবে লেখা ছিল নবলক্ষ কড়ি, কিন্তু রাধা বিরহের রাধার উক্তি, 'শত পল সোনা বড়াই, লআ সে মেল। প্রানো নাথ উদ্দেশ্যে চল '

তৃতীয়তঃ রাধা বিরহ অংশ পড়ে মনে হয় না এর আগে রাধা কৃষ্ণের মিলন ঘটেছে।

চতুর্থতঃ রাধা বিরহের ভাষা পূর্বের খন্ড গুলির ভাষার চেয়ে অনেক আধুনিক ।

পঞ্চমতঃ যে বরাই পূর্ব ভূখণ্ড গুলিতে কৃষ্ণের দূতী ছিল, এই অংশের রাধার প্রতি সে স্নেহপরায়ণা।

ষষ্ঠতঃ রাধা বিরহ অংশে ব্যবহৃত ভনিতা গুলি," গাইল বড়ুচন্ডীদাস বরে ল," " বাসলী শিরে বন্দী চন্ডিদাস গা এ।" ইত্যাদি পূর্ববর্তী খণ্ডে ব্যবহৃত হয়নি।

এইসব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে রাধাবিরহ অধ্যায়ের সঙ্গে 'খন্ড' শব্দটি যুক্ত হয়নি বলেই এই অধ্যায়টি কে প্রকৃত বলে চিহ্নিত করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। প্রাচীন কাব্যে অনেকক্ষেত্রেই লিপিকর দের অসাবধানে এইভাবে বিশেষ শব্দের ছাড় পড়তে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে কালিয়দমন খণ্ড এর পরবর্তী খন্ড টির নাম ছার পড়েছে। যমুনা অন্তর্গত বস্ত্রহরণ খন্ড বসন্ত রঞ্জন এর হাতে শুধুমাত্র যমুনা খন্ড নামেই চিহ্নিত হয়েছে। রাধা বিরহের শেষ পৃষ্ঠাটি পাওয়া গেলে হয়তো এত সমস্যা হতো না। সেখানে খন্ড শব্দটি উপস্থিত থাকলেও থাকতে পারতো। কাব্যটির দান খন্ড অংশ থেকে বিভিন্ন খণ্ডের সমাপ্তি বাক্য-ইতি দান খণ্ড সমাপ্ত, ইতি যমুনা অন্তর্গত কালিয়দমন খণ্ড সমাপ্ত, ইতি বান খন্ড, ইতি বংশী খণ্ড সমাপ্ত, ইত্যাদি। কিন্তু রাধা বিরহের শেষ পৃষ্ঠাটি না থাকায় সমাপ্তিতে কি ছিল জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু রাধাবিরহ খণ্ড কথাটি পাওয়া যাচ্ছে না বলে এটি কাব্য বহির্ভূত এমন ভাবার বলিষ্ঠ কোন যুক্তি নেই। বড়াই শুধু রাধা বিরহেই রাধার প্রতি সহানুভূতিশীল নয় বান খন্ড ও বংশী খণ্ডে ও তার এই সহানুভূতির পরিচয় আমরা পেয়েছি। বান খন্ডে রাধাকৃষ্ণের প্রশ্নবাণে মূর্তি তাহলে বড়াই রাধার জন্য আকুল হয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেছে, আর বংশী খন্ডে বড়াই এর তৎপরতায় রাধা শ্যাম এর বংশী চুরি করে তার দর্শন লাভ করেছে। সুতরাং রাধাবিরহে রাধার প্রতি বড়াইয়ের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। রাধা বিরহের বহুস্থানে ই পূর্ব মিলনের কথা বা প্রসঙ্গ আছে, কখনো তা স্মৃতিবাহিত, কখনো প্রাসঙ্গিক সূত্রে উল্লেখিত। কেমন রাধাবিরহ দ্বিতীয় পদটি --

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী

সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে

এখানে কৃষ্ণের রাধা বদন-চুম্বন, আড় বাঁশি বাজানো এবং প্রতিদানে রাধার অসম্মতিতে পূর্ব স্মৃতি স্বপ্নে ফিরে এসেছে মনস্তত্ত্বে স্বাভাবিক পথে। এছাড়া তাম্বুল খন্ড রাধার কাছে প্রেম প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার জন্য রাধা বড়াই কে চড় মেরেছিল। সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে রাধা বিরহে রাধা নিজে বলেছেন-

দুতা দিআঁ পাটায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুল।।

দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কা।

আন্তরে পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে।।

দানখন্ডে কৃষ্ণ রাধাকে যেমন পাওয়া দান হিসেবে নবলক্ষকড়ী চেয়েছে, বিরহ অংশে তেমনি 'শতপল সোনা' উপহার দিতে চেয়েছে। শুধু 'কড়ি' শব্দের অনুল্লেখে রাধাবিরহ পৃথক কাব্যে পরিণত হয়েছে এমন ভাবার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। রাধা বিরহ অংশে রাধা যেমন বড়াই কে ৪০০ ভরি সোনা উপহার দিতে চেয়েছে, তেমনি বান খন্ডে রাধা বড়ায়িকে 'লাখেকের মুদড়ী' দিতে চেয়েছে। মুদ্রা হিসেবে কড়ির ব্যবহার থাকলেও স্বর্ণ উপহার প্রসঙ্গে অস্বীকার করা যায় না। রাধা বিরহে ব্যবহৃত ভণিতা প্রসঙ্গে সমালোচকদের সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, রাধাবিরহ যে আটটি ভনিতায় ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি অন্য খন্ডে ব্যবহৃত হয়নি - একথা ঠিক নয়। ওই ৪ টির মধ্যে পাঁচটি ভনিতা অন্যান্য খন্ডেরও অঙ্গীভূত হয়েছে। এমনকি কোনো বিশেষ ভনিতা -

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ

পূর্বের খন্ড গুলিতে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে । রাধাবিরহ ভাষায় আধুনিকতার লক্ষণ আছে এমন মন্তব্যও ভিত্তিহীন। কারণ এখানেও আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার লক্ষণ স্পষ্ট। উদাহরন- আহ্মি,তথাঁ,কাহ্নাঞিঁ,সেবিঞাঁ,দোঁষ্পাইঞাঁ প্রভৃতি।

কাব্যের কায়া- গঠনের দিক দিয়েও রাধাবিরহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খণ্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন

নয়। কাহিনী গ্রন্থনার পারম্পর্য, চরিত্র-নির্মিতি ,ভাষা বা ভনিতা, সংস্কৃত শ্লোক এর ব্যবহারের পদের ভাগের বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখ রাধাবিরহ অংশটি পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে গভীরভাবে সাদৃশ্য যুক্ত। রাধার কৃষ্ণের জন্য আকুল হাহাকার বংশী খণ্ডে'ই শ্রুত হয়েছে । কৃষ্ণের রাধার প্রতি ঔদাসীন্য বংশী খণ্ড থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। তার গত তৃষ্ণ রূপটি বংশী খণ্ড বেশ স্পষ্ট। রাধাবিরহ ব্যাকুলতার কোন মূল্য তিনি দেননি। রাধাকে কাছে প্রিয় মিলনের আগ্রহ ব্যক্ত, বাঁশি ফিরে পেয়েই গৃহে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হয়েছেন। বংশী খন্ডে রাধাকে 'নটকী', গোআলী, ছিনারি, পামরি, বলে তিরস্কার করেছেন, আর রাধা বিরহে প্রায় অনুরূপভাবেই রাধাকে ব্যঙ্গ বিদ্ধ করে বলেছেন -

এবেঁ গোআলিনী কেহ্নে পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।।

কৃষ্ণের বাক-সংযম এর এই অভাব শুধু এই দুটি খন্ডেই নয়, সমগ্র কাব্য ছড়িয়ে আছে।

একাধিকবার একই নারী দেহ সম্ভোগে পুরুষের ক্লান্তি আসাটাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। দেহ কেন্দ্রিক প্রেমের এমন পরিনীতিই বোধহয় অনিবার্য। একটু অন্যভাবে দেখলে বলা যায়,কাব্যের প্রথমে কংস নিধনের জন্য ও সৃষ্টিরক্ষা নিমিত্ত নারায়ন মর্তে কৃষ্ণ রুপে জন্ম গ্রহণ করবেন- এমন প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত। কাব্যের শেষে তা রক্ষার্থেই কৃষ্ণের মথুরা গমন ও রাধা বিস্মরণ। ব্যক্তিগত প্রেমের বন্ধন ছিন্ন না হলে বৃহত্তর ও কর্ম ও কর্তব্যের আহবানে সাড়া দেওয়া যায় না। কৃষ্ণের প্রস্থানকে এই ইতিবাচক দিক থেকে দেখলেও রাধাবিরহ কে প্রক্ষিপ্ত বা পৃথক কাব্য বলা সঙ্গত নয়; বরং তা পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ ও ধারাবাহিকতা রক্ষার দিক থেকেও যথার্থ বলে মনে হয়।

১০.৭। রাধাবিরহ : গীতিধর্মিতা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই গেয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রাকচৈতন্য যুগের রচনা বলে তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন থেকে বহু দূরবর্তী। ফলে কাব্যের মানবিক আবেদন

চৈতন্য পরবর্তী পদাবলীর তুলনায় অনেক বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কিছুটা অমার্জিত হলেও মানবিক রসের দিক থেকে তার মূল্য অনস্বীকার্য। তাই প্রতিটি কাব্যের প্রতিটি পদের সূচনায় রাগরাগিণীর উল্লেখ লক্ষণীয়। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ কাব্যের মত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য গীত ও অভিনীত হতো কিনা- সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তের সন্ধান মেলে না। নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রচুর সম্ভাবনা এই কাব্যে ছিল। সংযোজক সংস্কৃত শ্লোক গুলি ঘটনাগত ধারাবাহিকতা রক্ষার দ্বারা নাটকীয়তার মাত্রাটিই স্পষ্ট করে তুলেছে। চরিত্রের আচরণ ও কথোপকথন উক্তি-প্রতুক্তি মূলক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। এছাড়া চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘটনাগত দ্বন্দ্ব (outer conflict inner conflict) কাব্য কাহিনীতে গতি সঞ্চারিত করেছে। ঘটনার নাটকীয় ধারাবাহিক ছাড়াও বেশ কিছু নাট্য মুহূর্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে অনেকে ঝুমুর গানের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কেউ বা এরমধ্যে ধামালির বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। তবে নিছক এজাতীয় রচনা হলে এই কাব্যে উচ্চশ্রেণীর রাগ রাগিনী থাকতো না, থাকতোনা সংস্কৃত শ্লোক এর পরিপাট্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মূল পরিচয়ে আখ্যানকাব্য হলেও নাটকীয় প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। কবি বিভিন্ন চরিত্রে পারস্পরিক সংলাপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এছাড়া জয়দেবের নাটগীতি ঠাট পুরোপুরি বজায় আছে কাব্যে। তবে গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে প্রচলিত অভিমত হলো এটি নাট্য লক্ষণাক্রান্ত হয়েও আখ্যানমূলক খণ্ডকাব্য। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আখ্যানকাব্য হয়েও নাটকি উপাদানে সমৃদ্ধ। কাব্যটি গীতি সংলাপ মূলক আখ্যানকাব্য হিসেবেই যে সার্থক হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে সম্ভবত কোনো দ্বিমত নেই। একে নাটগীতি বলার পক্ষপাতীও প্রায় সকলে। এইসব মতামত ও সমালোচনার আলোক আমাদের সিদ্ধান্ত হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয়তা ও গীতিধর্মিতা অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এরমধ্যে বংশী খণ্ড ও রাধাবিরহে গীতিকবিতার অন্তর্নিহিত ভাব উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানখন্ড পর্যন্ত কাহিনী গ্রন্থনা, সংলাপের তীক্ষ্ণতা, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা, ও আখানে গতিময়তায় নাট্য লক্ষণ প্রকটিত। বংশী কণ্ঠে রাধার বিচ্ছেদ বেদনা গীতিকাব্য সুষমা পেলেও তার অন্তর্দ্বন্দ্ব, কৃষ্ণের সঙ্গে

বাদানুবাদ ও বংশী চুরির ঘটনায় যথেষ্ট নাটকীয়তা ও বেশকিছু নাট্য মুহূর্ত আছে। তবে বিরহ অংশ সর্বপ্রকার নাটকীয় চাঞ্চল্য, ঘটনার অভিঘাত, বাকযুদ্ধ প্রভৃতি নাটকীয়তার থেকে মুক্ত হয়ে গীতি লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

কাব্যের প্রথম দিকে দানখন্ডে রাধার রূপ বর্ণনা কৃষ্ণের উক্তির মধ্যেও গীতিকাব্যের বর্তমান -

কালো ভ্রমরে কমল্বনে শো।
কালো কাজলে নারী জগজন মোহে।।

বংশী খন্ডের 'কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে', 'সুন্দর বাঁশির নাদ সুনিয়া বড়াই', - প্রভৃতি পদে আধ্যাত্মিক ভাব তন্ময়তা লক্ষণীয়।তা বিশেষ হয়ে ওঠে রাধার আত্মনিবেদনে-

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।

দাসী হআ তার পাএ নিশিবোঁ আপণা।।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন- "কালিন্দী নদী কূলে গোকুলের গোঠে অবিরত যে বংশীর ধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চন্ডীদাস বাঙালি জাতিকে তার দূরাগত পদধ্বনি শুনাইয়া দিয়েছেন, সেই বাঁশির শহরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্র কথা মিলিয়ে যায়। "

যে বংশী ধ্বনিত রণিত হয়েছে 'বংশী খন্ডে', যার প্রভাবে রাধা ঘরের আকর্ষণ ত্যাগ করে, কুলশীল, মানমর্যাদা উপেক্ষা করে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে সেই প্রেমের জয় ঘোষণায় সোচ্চার হয়েছেন, রাধা বিরহে দেখি তার ই ব্যপ্তি বংশী খন্ডে অন্তরালে বসে প্রতিনিয়ত বাঁশি বাজিয়ে যে কৃষ্ণ রাধার অন্তরে বিরহ ব্যাকুলতা জাগিয়েছেন রাধাবিরহে তা আরো ব্যাপ্তরূপ লাভ করে রাধার ব্যক্তিগত বেদনা অনুভব কে বিশ্ব কত রূপ দান করেছে।

স্বপ্ন দর্শনের সঙ্গে রোমান্টিক কবি কল্পনার নিবিড়সংযোগ বিদ্যমান, যা একই সঙ্গে গীতিকাব্য সুষমা বহন করে। রাধা বিরহে তারই প্রকাশ দেখি। রাধা বড়াই কে তার স্বপ্ন দর্শনের কথা বলেছেন-

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী

সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।

কিংবা, কানু সঙ্গহীনা রাধার কাছে নিজের ধন যৌবন সবই অসার- এই গভীর উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশে যখন বলেন-

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার।

ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার।।

তখন বিরহ ব্যাকুল রাধার আত্মনিষ্ঠ মন, মনন ও অনুভূতির দিকটি প্রধান হয়ে উঠে গীতিলক্ষণাক্রান্ত করে তোলে কাব্যের এই অংশকে। রাধা বিরহের আধার হৃদয় ভাব যে ভাবে প্রকাশিত তাতে পদাবলীর রাধার রবীন্দ্র- কথিত সেই চিত্র দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতার সুর ই ধ্বনিত। ফলে রাধা বিরহের বেশকিছু পদ পদাবলী শ্রেষ্ঠ পদের মত আধুনিক গীতি কবিতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে ।

বংশী খন্ডের চেয়ে রাধাবিরহ ঘটনার ভার আরও হ্রাস পেয়েছে এবং উক্তি ব্যক্তি মুখী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তবে শুধুমাত্র আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসই গীতিকাব্যের শেষ কথা নয় । তার আয়তন সংক্ষিপ্ত, প্রকাশ সুষমা এবং বক্তব্যের মধ্যে কল্পনার লীলা, তার উপমা ও চিত্রের মধ্যে কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা থাকা দরকার। রাধা বিরহে এমন পদের অভাব নেই। যেমন রাধা বলেছেন তার কাছে চন্দ্র ও সূর্য দুয়েরই উত্তাপ অসহ্য। বিরহের জ্বালায় দগ্ধমানা নারীর কাছে তেমন হওয়াই স্বাভাবিক, তার চোখেও ঘুম নেই। দেহের জ্বালা শান্ত করতে শীতল চন্দনের প্রলেপেও তার তনু শান্ত হয় না। তাই মৃত্যু কামনা ছাড়া তার আর গতি নেই। -

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে।

রাতি হোএ সুখ চান্দ।

কোকিলের সুমিষ্ট কুহুধ্বনি রাধার কাছে বজ্রাঘাতের মত নিদারুণ-

দালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাত্র।

যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ।।

কৃষ্ণ বিরহীনি রাধার একটি মুহূর্ত যেন এক যুগ এর সমতুল্য। প্রকৃতির পটভূমিতে বিচ্ছেদ কাতরা রাধার মনোবেদনা তীব্রতর হয়ে ওঠে। যে প্রকৃতি একদিন শ্যাম ও রাধার মিলনে সহায়ক হয়েছিল রাধাবিরহ সেই প্রকৃতিই বিরহের উদ্দীপনবিভাব রূপে ক্রিয়াশীল হয়ে রাধার অন্তর্গত বেদনার মুক্তি ঘটিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আখ্যানাশ্রয়ী নাট্যগুণসমন্বিত গীতিধর্মী কাব্য। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই - এই তিনটি চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এর নাট্যরস অভিব্যক্ত। তাছাড়া আদ্যন্ত কাহিনীর মধ্যে যে গতিশীলতা আছে তাও নাট্য প্লটের কথাই স্মরণ করায়। নাট্য ঘটনার স্থান পরিবর্তন, সংলাপের স্বাভাবিকতা, সংক্ষিপ্ততা ও যথোপযুক্ততা, নাট্য দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নাটকীয়তা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। তবে বংশী খণ্ড থেকে এই স্রোতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। কাহিনীর গতি মন্থর হয়ে এসেছে, কমে গেছে ঘটনা গত সংঘাত, অন্তরের আবেগ ও আকুলতা প্রাধান্য পেয়েছে এবং তা যথার্থরূপে একলা মনের কথা হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্য কাব্যের ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি দেখা গেছে বংশী খন্ডে। রাধা এখনো পরিপূর্ণ নারী- কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী। এখানেই রচিত হয়েছে climax তারপর অনিবার্যভাবে ঘটনার তীব্রতা কমে এসেছে এবং রাধা বিরহে শ্রুত হয়েছে রাধার বিলাপ। এ রাধা গভীর উৎকণ্ঠায় কানুর পথ চেয়ে বসে আছেন, বড়াই কে নিয়ে তার অন্বেষণে পথে-পথে ফিরেছেন। যদিও বা তার সন্ধান পাওয়া গেল, তাকে বেঁধে রাখা গেল না। বড়াইল হাতে রাধার দায়িত্ব অর্পণ করে কৃষ্ণ নিদ্রামগ্ন রাধাকে ত্যাগ করে মথুরায় গমন করলেন । বড়াই দ্বারা যে প্রেমের উন্মেষ, বড়ায়ির হাতেই তার সমাপন। কাব্যটির শেষাংশ খন্ডিত হলেও বংশী খন্ডে ঘটনার চরম অবস্থার পর নাটকের গতি রাধাবিরহে অবরোহে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং বলা যায়, নাট্য কৌশল এর দিক দিয়ে কাব্যটি পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে। কংসের বিনাশ উদ্দেশ্যে যার আরম্ভ, সেই সংকল্প রক্ষায় তার সমাপ্তি। জীবন তো এমনই নাটকীয়, কিন্তু জীবনের বেদনা গুলি যে সুরে অনুরণিত হয় তা একান্ত ভাবে গীতিধর্মী-" personal intense emotion" সজীব জীবনচিত্র সাহিত্যকে কালজয়ী করে। এই

জীবনে চিত্রে অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি থাকলেও তার দ্বারা যদি জীবনের প্রাণবন্ত স্বরূপটি উদঘাটিত হয় তাহলে তা চিরন্তন সাহিত্যে স্থান পায়। বাল্মিকী, বেদব্যাস তাদের কাব্যে যা দিয়েছেন তাতে জীবন আছে। এই জীবনের চিত্র অংকন এ বড়ুচন্ডীদাস সার্থক শিল্পী। তিনি অনাগত কালকে যুক্ত করেছেন তার কাব্যে, অনন্তের সম্ভাবনাকে প্রতিফলিত করেছেন, আর তারই চিত্রণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হয়ে উঠেছে গীতি লক্ষণাক্রান্ত।

বড়ু চন্ডীদাস মানব মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপকার। তিনি সার্থক জীবন শিল্পী। তাই মানব মনের ঘাত-প্রতিঘাত, চাওয়া-পাওয়া তার নখদর্পণে। তিনি জানেন জীবন স্বপ্ন নয়, কিন্তু স্বপ্নহীন জীবন সত্য নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ ও স্বপ্ন তত্ত্ব বিদদের মতো বাস্তবের মুখাপেক্ষী হয়ে তিনি রাধা স্বপ্ন দর্শনের চিত্র যেমন এঁকেছেন, যেমন রোমান্টিক কবি কল্পনার বশবর্তী হয়ে স্বপ্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। প্রকৃতির পটভূমিকে প্রেমের বেদনার প্রকাশক রূপে ব্যবহার করে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। রাধার অনুভূতির গভীরতা ও হৃদয়ের আবেগের প্রকাশে গীতিকাব্যিক সুষমায় মন্ডিত হয়েছে পদাংশটি।

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।

বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা বিরহ থেকে গৃহীত কৃষ্ণকে স্বপ্নের দর্শনে রাধা তার বিরহ আকুলতার কথা বড়াইয়ের কাছে জানালে, কৃষ্ণকে তার কাছে নিয়ে আসার কথা বললে ,বড়াই তাকে তিরস্কার সূচকেই উক্তি করেছে।

'রাধাবিরহ' রাধার বিরহ বেদনা গীতি মূর্ছনা। শ্যাম বিরহীনি রাধার জীবন যৌবন আজ শুন্য, মরুভূমির ধূসরতা সেখানে বিরাজিত। এতদিন রাধা তার ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির সঙ্গে সমাজ-সংসারের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নে শ্যামকে দেখে রাধার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা সমস্যা হয়েছে। নব যৌবনা রাধা মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বড়াই কে কৃষ্ণের সন্ধান নিয়ে আসার অনুরোধ করলে বড়াই মৃদু ভৎসনায় বলেছে- এখন কেন গোয়ালিনী তোমার মন ঘুষঘুষে পুড়ছে? তোমার নব যৌবন

পোটলা বেঁধে রাখো।

রাধাবিরহ আকুলতা ও বড়াই আশ্চর্য সংযম ও ধৈর্যের সঙ্গে তা নিবারণের তিরস্কার সূচক অদ্ভুত কৌশল- দুই-ই সুউদ্ঘাটিত হয়ে কবির চরিত্র-চিত্রন ও মানব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিপুণ অভিজ্ঞানের পরিচয় রেখেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, বড়াই কৃষ্ণের দূতী ও সমর্থক বলে রাধাকে এভাবে তিরস্কার করছে। রাধার এই বিরহ দশায় তার প্রতি এরকম বাক্য নিক্ষেপ বরের পক্ষে অনুচিত কর্মই হয়েছে। কিন্তু মানব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবীণা বড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই সে জানতো রাধার বেদনার তীব্রতা তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলে অধিক বর্ধিত হবে। এসব ক্ষেত্রে সহানুভূতি প্রদর্শন অপেক্ষা তিরস্কারই ভালো। তাছাড়া, বড়াই খুব একটা মিথ্যা তো বলেনি। একদা প্রত্যাখ্যাত পুরুষ মানুষ কিছুতেই পুরনো দুঃখ ভোলে না। সে সবসময় আত্ম ঘোষণা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনা করে। মধ্যযুগীয় পুরুষশাসিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একথা অভ্রান্ত ভাবে সত্য। তাই নব যৌবন কে শাসন করা ছাড়া রাধার বর্তমানে আর কিছু করার নেই। রাধার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিল বলেই বড়াই তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকে সুপরামর্শ দিয়েছে।

যতদিন কৃষ্ণ রাধার কাছে ছিলেন রাধা তার প্রেমের স্বরূপ সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। কখনো প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছেন, কখনো মিলনে অস্বীকৃত হয়েছেন, কখনো বা বাকযুদ্ধে কানুকে নিরস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন, আবার কখনো শ্যামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন । প্রেমের জন্য মন প্রস্তুত থেকে শুরু করে অবৈধ প্রণয়নের ক্ষেত্রে আত্ম অন্তরালে যে প্রচেষ্টা চলে রাধা সেই ক্রিয়ার বহির্ভূত ব্যক্তি নন। তথাপি এমন একটা সময় আসে যখন মন বলে- বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলা ও। অনেক মানসিক দ্বন্দ্ব আত্মবিশ্লেষণ এবং নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাবুঝি স্তর পেরিয়ে রাধা বিরহে রাধা নিজের সব কিছুর বিনিময় শুধু কাহ্নাঞিকেই কামনা করেছেন। বিরল অনলে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে তখন হৃদয় দর্পণে ভেসে উঠেছে একটি মুখচ্ছবি- যা কৃষ্ণের। অথচ কৃষ্ণ এখন তার প্রতি গত তৃষ্ণ। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এই দ্বন্দ্ব থাকে, তাকে পেয়ে হারানোর সম্ভাবনা, বেদনার তীব্রতা। এই বেদনার বৃন্তে ফুটে ওঠে হৃদয় শতদল, যেখানে বাইরের চাওয়া-পাওয়া ভুলে প্রণয় দেবতার আরাধনায়

চিত্ত-দীপ প্রজ্বলনের চেষ্টা চলে। রাধা তাই বড়াই কে বলেছেন, কানু কে না পেলে তিনি গজ মুক্তার হার ছিড়ে ফেলবেন, মাথার সিঁদুর মুছবেন এবং হাতে বালা ভেঙে চূর্ণ করবেন।

এখানে রাধার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। বাইরের চাওয়া-পাওয়া আজ অন্তরে স্থির উপলব্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। যেখানে সমাজ-সংসারের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে শুধু প্রেমের জন্যও হৃদয়ে জেগেছে। যে আবরণ ও আভরণ নারীর অঙ্গসজ্জার উপকরণ এখন সেই বহিরঙ্গ সাজসজ্জা রাধার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে। এক দিন এই রাধাই নিজের সিঁথির সিঁদুর এর অহমিকা করেছিলেন, সতীত্বের সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। কুলশীল মান মর্যাদা সম্পর্কেও তার অহমিকা বোধ ছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের সময় নিজের প্রিয় অলংকার গুলি রক্ষার তাগিদও তিনি অনুভব করতেন। অথচ রাধাবিরহে তিনি এসব অলংকার কে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। সকল অহংকার তার চোখের জলে ভেসে গেছে। নিজের রূপ ও যৌবন সম্পর্কে যে রাধা গৌরবান্বিত ছিলেন, কৃষ্ণ ছাড়া এ সবই যে মূল্যহীন এই উপলব্ধিতে অবশেষে তিনি পৌঁছে গেছেন। পরিমনি একনিষ্ঠ থাকার কারণে এবং প্রেম উৎকর্ষতা হেতু রাধা শুধু কৃষ্ণ প্রেমকেই সার বলে জেনেছেন । তার এই উক্তিতে বৈষ্ণব পদাবলীর মহাভাব শনি রাধার প্রতিবিম্ব ঘটেছে এবং ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতার ও প্রেমের উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি রূপে রাধার চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। প্রেমের পরিণত পর্যায়ে এই জাতীয় উপলব্ধির যে অধিকারী হওয়া যায় তা কবি জানতেন। তদুপরি বিতর্কিত চরিত্র হিসেবে রাধাকে চিত্রিত করে তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিদর্শন রেখেছেন।

বড়াই রাধাকে জানিয়েছেন যে, কৃষ্ণ কালো, তার অন্তর কঠিন। তিনি কোন কিছুই বোঝেন না, শত অনুরোধেও রাধার কাছে আসেন না। হয়তো তিনি রাধার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়ে অনেক দুঃখ পেয়ে রাধাকে ত্যাগ করে গেছেন।

মানব চরিত্র সম্বন্ধে বড়াইয়ের যথেষ্ট সচেতনতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কৃষ্ণ একদা রাধার প্রতি তীব্র অনুরাগী ছিলেন, তিনি এখন সম্পূর্ণ রূপে গত তৃষ্ণ। কানাইয়ের বহিরঙ্গ রূপের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মানসিকতার সম্বন্ধ নির্ণয় করেছে বড়াই।

কৃষ্ণকে তার চতুর বলেও মনে হয়েছে। নইলে রাধা আহবানে ও বড়াই এর অনুরোধে তিনি অবশ্যই রাধার কাছে আসতেন। এ প্রসঙ্গে বড়াইয়ের এও মনে হয়েছে যে, রাধার প্রেম চেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে কৃষ্ণ অভিমানাহত হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা, চতুরতা ও আত্মসম্মান আহত হলো অভিমান পূর্ণ মনের পরিচয় বড়াই উক্তিতে যথাযথরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বড়াই হয়তো কৃষ্ণ কে সমর্থন করছেন। কারণ রাধার কাছে প্রেম সে দুঃখ পেয়ে তিনি বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন। কিন্তু বড়াই এই উক্তি দ্বারা পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ই বিশ্লেষণ করেছে। পুরুষের কঠোরতা ও চাতুর্যের কথা বলে সে বেদনাহত রাধার মন পরবর্তী চিরস্থায়ী বিরহের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছে। এখানে তার বাকচাতুর্য-ই প্রকাশিত।

অপর একটি পদে দেখা যায়,

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী।আল বড়ায়ি গো।।
এ দিগেঁ কি বসন্ত না জানী।আল।।

উদ্ধৃতাংশ টি বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা বিরহ থেকে গৃহীত। এখানে বিরহিনী রাধা বড়াইয়ের কাছে তার মর্মবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। রাধার ভাগ্যে শ্যাম দর্শন মেলেনি। এদিকে বসন্তকাল সমাগত। এমন বসন্ত দিনে কতবার তাদের মিলন শয্যা রচিত হয়েছে। অথচ আজ বসন্ত বহির্জগতে পূর্ণতা ও প্রাচুর্য, কিন্তু রাধার জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছেদের চিরস্থায়ী অন্ধকার। মিলনের পূর্ব স্মৃতির রাধার দৃষ্টিকে বারবার অশ্রুসজল করে তুলেছে। তাই তার মনে হচ্ছে চক্রপাণি সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত ও বুঝি বিদায় নিয়েছে। রাধার মন তাই কুমোরের পোণের মতো ধিকিধিকি করে দগ্ধ হচ্ছে। এখানে কবি নারীমনস্তত্ত্বের নিপুন রূপকার। রাধার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রণে তিনি সফল শিল্পী। প্রকৃতির পটভূমিতে বিরহবেদনা যে ব্যাপ্তে ঘটে, ব্যক্তিগত বেদনা যে বিশ্বগতরূপ লাভ করে তা কবি সঠিকভাবে জানতেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিবিড় সংযোগ সাধনের ও মানব মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব অঙ্কনে বড়ুচন্ডীদাস এই অংশে অসামান্য নৈপুণ্যের

পরিচয় রেখেছেন। সেই সঙ্গে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ ও মুদ্রিত। কুমোরের পোণের সঙ্গে রাধার বেদনাকে উপমিত করেছেন কবি, যার দ্বারা রাধার বেদনার স্বরূপ যথাযথরূপে বোঝা গেছে। বহি প্রকৃতিতে বসন্তের সমারোহ ও রাধার অন্তরের রিক্ততা অপূর্ব বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। কুমোরের পোণের উল্লেখে সে যুগের এক শ্রেণীর বৃত্তিধারী মানুষের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে।

রাধাবিরহ রাধার বিরহের করুণ গাথা। যে কৃষ্ণ একদিন রাধা অনুরাগী ছিলেন, রাধাবিরহে তিনি একান্ত ভাবে রাধা বিতরাগী। রাধার প্রতি তার অন্তরের সকল তৃষ্ণা ও আকুলতা আজ অন্তর্হিত হয়েছে। বংশী খন্ডে সকলের সামনে করজোড়ে বাঁশি ফেরত চাওয়ায় তিনি অপমানিত; অসম্মানিত রাধার পূর্বকৃত ব্যবহারের জন্য। তাই রাধাকে ত্যাগ করে বড়াই এর উপরই তার দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি মথুরাবাসী হয়েছেন। লঘু পাপে গুরু দণ্ড তিনি রাধাকে দিয়েছেন তার দায় এখন বড়াইকে সামলাতে হচ্ছে। তাই কৃষ্ণ বিরহীনি রাধার কাছে স্বামীকে নিয়ে আসার জন্য তিনি মথুরায় ছুটে গেছেন এবং কানাই এর প্রতি নির্লিপ্তি ও ঔদাসীন্য প্রত্যক্ষ করে তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন- সোনার ঘট ভাঙলে জোড়া যায়, উত্তম জনের প্রেম তেমনই। যে ব্যক্তি অধম, যার অন্তর কপটতায় পূর্ণ তার প্রেম যেন মাটির ঘটের মতোই; অর্থাৎ ভাঙলে আর জোড়া যায় না।

ভাগিলেঁ সোনার ঘট যুড়ীবার পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী।।

আলোচ্য অংশে বাকচতুরতার পরিচয় স্পষ্ট । আলংকারিকতাপূর্ণ এই বাক্যে উত্তম জনের প্রেমকে সোনার ঘট এবং অধম জনের প্রেমকে মাটির ঘটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পদটি এক অর্থে কৃষ্ণের সমালোচনা। কৃষ্ণের রাধার প্রতি গততৃষ্ণ রূপ বড়াই কে এতটাই বিস্ময় বহ্বল করেছে যে, কানাই কে অত্যন্ত স্নেহ করলেও তার সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছে। কৃষ্ণের মানসিকতার এই পরিবর্তনে ব্যতীত বড়াই এইভাবে তাকে তিরস্কার করেছে। আসলে শুধু কৃষ্ণ নয়, বড়াইয়ের এ জাতীয় মন্তব্য মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমগ্র পুরুষ শাসিত সমাজে আলোচিত হয়েছে। এ করেও

শেষ রক্ষা হল। কৃষ্ণ রাধার ভাঙ্গা সম্পর্ক জোড়া দেওয়া সকল চেষ্টা তার ব্যর্থ হলো। কাপট্যপূর্ণ মানসিকতার অধিকারী যে ব্যক্তি তার ক্ষেত্রে সম্পর্ক হয় মাটির ঘটের মতোই, ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। অত্যন্ত সক্রিয়, তৎপর, বুদ্ধিমতী ও বাকপটু বড়াইয়ের ব্যর্থতার বেদনা এই পদাংশে যুক্ত হয়ে আছে।গীত মাধুর্য একই সঙ্গে এই পদগুলিকে কীর্তনের আঙ্গিক দিয়েছে এবং রাধা, কৃষ্ণ,বড়াই চরিত্রকে বাঙ্ময় করে তুলেছে।

১০.৮। অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. রাধা বিরহ অংশে কৃষ্ণ চরিত্রের পরিচয় দাও।

প্রশ্ন২. রাধা বিরহ অংশে বড়াই চরিত্র টি কিভাবে রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রের সূত্রধর হয়ে উঠেছে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৩. রাধাবিরহ অংশ প্রক্ষিপ্ত কিনা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৪. রাধাবিরহ অবলম্বনে বিরহিনী রাধা চরিত্র আলোচনা করো।

১০.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১. বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরিক্রমা , মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস , ক্ষেত্র গুপ্ত

৫. কৃষ্ণ কথার ক্রমবিকাশ ,সত্যবতী গিরি

একক ১১। চৈতন্যচরিতামৃতের সাধারণ আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ চরিত কাব্যের বৈশিষ্ট্য

১১.৩ কবি পরিচয়

১১.৪ রচনাকাল

১১.৫ অনুশীলনী

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১। উদ্দেশ্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চরিতসাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারার সংযোজন। শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবনকে আশ্রয় করে ষোড়শ শতকের পূর্বার্ধে এর সূত্রপাত। পরবর্তীকালে চৈতন্য অনুচর আদ্বৈতাচার্য ও বংশী বদন এবং চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণব মহন্ত নরোত্তম , শ্যামানন্দ , শ্রীনিবাস প্রভৃতির জীবনকথা ও সাধনা অবলম্বনে আরো কিছু চরিত কাব্য রচিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবীর জীবনকে কেন্দ্র করে চরিত কাব্য লেখা হয়েছে। এই চরিত কাব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় হিসেবে দেখা দিল ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য। দেব কথার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ বাস্তব ও ঐতিহাসিক মানব চরিত্র কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠল। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যথার্থ মানবিক জীবনরস সঞ্চারিত হল।

১১.২। চরিত কাব্যের বৈশিষ্ট্য

ক) সাধারন বৈশিষ্ট্য

মন্তব্য

১. চরিত কাব্যের মূল লক্ষ্য হল, ঐতিহাসিক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সামগ্রিকতা এবং চরিত্র রহস্য উদঘাটন। এই জন্য ব্যক্তি জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সুপরিকল্পিত এবং সুনির্বাচিত নিপুণ বিন্যাস সংগ্রহে থাকা প্রয়োজন । শ্রেষ্ঠ দুটি চৈতন্য চরিত কাব্য বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ।

২. জীবন সাধনা কীর্তির জন্য আলোচ্য কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিশিষ্টতা তার সম্যক পরিচায়ন প্রয়োজন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্য লীলার অন্তিম পরিচ্ছেদে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীচৈতন্যের জীবনসাধনার তাৎপর্য বিচার করা হয়েছে।

৩. মধ্যযুগের চরিত কাব্যগুলি আধুনিক লৌকিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে লেখা জীবনী সাহিত্য নয়। এগুলি মধ্যযুগীয় ইউরোপের সন্তজীবনীর মত। এর মধ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ আছে ।আধুনিক যুক্তিবাদী মন দিয়ে যা সম্পূর্ণ মানা যায় না। চৈতন্য ভাগবতে এর নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। মধ্যযুগের মানুষ মহাপুরুষদের জীবনের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেই মানসিকতা থেকেই মধ্যযুগীয় চরিতকাব্য গুলিকে বিচার করতে হবে।

৪. চরিত কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবন পটভূমি, কাল পরিবেশ ও সমাজ পরিবেশের পরিচয় দিয়ে তার প্রেক্ষাপটে ওই চরিত্রের আবির্ভাব ও জীবন তুলে ধরা চাই এই কাব্যে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' কাব্যের আদি খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় শাহী প্রশাসনে ত্রস্ত এবং ভক্তিবিহীন বাহ্য ঐহিকতায় মগ্ন নবদ্বীপসমাজে শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব এর গুরুত্ব ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

৫. চরিতকাব্য অলৌকিকতার আলোচনায় আলোচ্য ব্যক্তির মানব রূপ যেন ঢাকা না পড়ে যায়। চৈতন্য জীবনীকাব্য এবং মহান্ত চরিতকাব্যগুলিতে নানা অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলি চরিত্রদের মানবরূপ ঢেকে ফেলেনি। এখানেই কাব্য গুলির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য।

খ) চরিত কাব্য গুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য:

১. মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব চরিতকাব্যগুলিতেই প্রথম ঐতিহাসিক বাস্তব ব্যক্তিমানব কাব্য নায়কের পদে প্রতিষ্ঠা পেল। ধর্মগত আবেদন একটি মুখ্য হলেও, এর মানবিক আবেদন কিছু কম নয়। ফলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস সচেতনতা ও সমাজ চেতনা সঞ্চারিত হলো।

২. চরিত কাব্যগুলি একাধারে সামাজিক ইতিহাস, ধর্মীয় ইতিহাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের আকর গ্রন্থ হয়ে উঠলো।

৩. তথ্যসংকলন, সমাজ পরিবেশ বর্ণন ,দার্শনিক বিচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিতার ভাষা গদ্য ভাষায় প্রবন্ধ রচনা দায়িত্ব পালন করল।

৪. মধ্য যুগে শ্রীচৈতন্য ও তার অনুগামী বৈষ্ণব মহন্ত ছাড়া অন্য কারো চরিত কাব্য রচিত হয়নি। এই শ্রেণীর কাব্য এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। তবে রচনা সৌন্দর্য ও ভাষা লালিত্যের জন্য 'চৈতন্য ভাগবত' বৈষ্ণবগোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে ব্যাপকভাবে পাঠক সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

৫. মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চরিত কাব্যগুলি সাহিত্যে ভাবাবেগ সর্বস্বতার স্থানে মননের দীপ্তি নিয়ে এল।

৬. ধর্মীয় মহাপুরুষদের জীবনচরিত রচনার ধারা মুসলমান কবিদের প্রভাবিত করে। এই শ্রেণির ইসলামী রচনা মধ্যে 'নবীবংশ' এবং 'রসুলবিজয়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের লোকোত্তর জীবনকথাকে ঘিরে প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য , নাটক ও স্তব, গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে চৈতন্যপার্ষদ মুরারি গুপ্তের “ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম ' কাব্য , কবিকর্ণপূরের ‘ চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং ’ এবং চৈতন্যচরিতামৃতম্ কাব্য ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ‘ চৈতন্যচন্দ্রামৃতং ' স্তোত্রকাব্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

সংস্কৃতে রচিত চৈতন্য চরিত গ্রন্থ

(ক) মুরারি গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য

মুরারি গুপ্ত ছিলেন গুরু গঙ্গাদাসের টোলে শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী । তিনি শ্রীহট্ট থেকে এসে নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন । শ্রীচৈতন্যের বাল্য - কৈশোর - যৌবনলীলা তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানতেন । এর উপর ভিত্তি করে তিনি শ্রীচৈতন্যে প্রথম চরিতকাব্য রচনা করেন । কাব্যটির নাম ' শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম । এটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে বেশী পরিচিত। কাব্যটিতে আটাত্তর সর্গ, চার প্রক্রমে ভাগ করা । মোট শ্লোক সংখ্যা – ১৯০৬ । এই কাব্যটি পরবর্তী সমস্ত চৈতন্যচরিতসাহিত্যে প্রামাণিক তথ্যের আকর রূপে গৃহীত হয়েছে । কাব্যের রচনাকাল বিতর্কিত । কাব্যের পুথিতে রচনাকাল হিসেবে ১৪২৫ শক (১৫০৩ খ্রী) এবং ১৪৩৫ শক (১৫১৩ খ্রী উল্লিখিত হয়েছে । অথচ এই কাব্যে শ্রীচৈতন্যের জন্ম (১৪৮৬ খ্রী :) থেকে তাঁর অপ্রকটকাল (১৫৩৩ খ্রী .) পর্যন্ত সমগ্র জীবনের লীলামাধুরী বর্ণিত হয়েছে । মনে হয় মুরারি প্রথমে শ্রীচৈতন্যের জীবনের ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলীই বর্ণনা করেছিলেন পরে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার কাহিনি কাব্যের চতুর্থ প্রক্রমে যুক্ত করে ১৫৩৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কাব্যটি সমাপ্ত করেন । কাব্যের বর্ণনাভঙ্গী সরল, বর্ণনায় আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষদর্শীতার ছাপ সুস্পষ্ট । বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে মূলতঃ মুরারির কাব্যেরই বর্ণনাক্রম অনুসরণ করেছেন ।

(খ) কবিকর্ণপুর বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃতম' মহাকাব্য

কবিকর্ণপূর ছিলেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গপার্ষদ কাঁচরাপাড়ার শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠপুত্র। এর নাম ছিল পরমানন্দ । একাব্যে ২০ টি সর্গ এবং ১৯০০ এর বেশী শ্লোক আছে । কাব্যটি ১৪৬৪ শক বা ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় । কবির বয়স তখন ১৭ - ১৮ বছরের বেশী নয় । এই কাব্যের প্রথম দিকের প্রায় সবটাই মুরারির কাব্য থেকে

গৃহীত । কিন্তু শেষদিকে কবি নিজের কল্পনা অনুসারে লিখেছেন । কাব্যপ্রকরণটি আলঙ্কারিক এবং একটু কৃত্রিম ।

(গ) কবিকর্ণপুরের ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের সমগ্র জীবনকথা অবলম্বনে তাঁর ‘ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং ' গ্রন্থটি রচনা করেন ।

চৈতন্যচরিতামৃতই একমাত্র পুর্নাঙ্গ চৈতন্যচরিতকাব্য ।

১১.৩। কবি পরিচয়

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে আবির্ভূত হন । জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে , কৃষ্ণদাস ১৪১৮ শকে বা ১৪৯৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৪ শকে বা ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে তিরোহিত হন । এই দুটি তারিখের কোনো প্রামাণিকতা নেই । বর্ধমান জেলার নৈহাটির কাছে ঝামটপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল সম্পন্ন পরিবারে । কৃষ্ণদাসের কবিরাজ উপাধি বৈদ্য জাতিসূচক নয় , তাঁর কবিত্বসূচক । সম্ভবতঃ সংস্কৃতে ‘গোবিন্দলীলামৃত’ কাব্য লেখার জন্য তিনি এই উপাধি পেয়েছিলেন। ড . সুকুমার সেন তাঁর ‘ চৈতন্যাবদান’ গ্রন্থে অনুমান করেছেন, কৃষ্ণদাস কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমণের সময় তাঁর তল্পিবাহক সঙ্গী ছিলেন । ' চৈতন্যচরিতামৃতে ' শ্রীচৈতন্যের এই দুই ভ্রমণের যে বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে , তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ওভাবে লেখা সম্ভব নয় । । কৃষ্ণদাস বাল্যাবধি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ভক্ত । ড . সুকুমার সেনের মতে , শ্রীনিত্যানন্দই কৃষ্ণদাসের দীক্ষাগুরু । একবার । ঝামটপুরে কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে সংকীর্তন মহোৎসবে তাঁর ভাই নিত্যানন্দের কিছু অযথা নিন্দা করেন । এতে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলে যান । সেখানে সনাতন , রূপ , রঘুনাথ ভট্ট , রঘুনাথ দাস , গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব — এই প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন । “ চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস প্রধানতঃ শ্রীরূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁর শিক্ষাগুরু বলেছেন

“শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস । ”

কৃষ্ণদাস সনাতন ও রূপের কুলদেবতা মদন গোপালের সেবার ভার পেয়েছিলেন । মদনগোপালের প্রসাদমালা পেয়ে , তাঁর আজ্ঞায় সুবৃদ্ধ বয়সে তিনি ' চৈতন্যচরিতামৃত ' রচনা করেন । কাব্য সমাপ্তির পর অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থের সঙ্গে ‘ চৈতন্যচরিতামৃত ও গৌড়ে পাঠানো হয়েছিল । নিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য , নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ । পথে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরে দস্যুদল পেটিকাসহ গ্রন্থগুলি অপহরণ করে । গ্রন্থের শোকে কৃষ্ণদাস প্রাণত্যাগ করেন বলে একটি কিম্বদন্তী আছে । কিন্তু তা সত্য নয় । কৃষ্ণদাসের শিষ্য মুকুন্দদাস গ্রন্থের অনুলিপি করে রেখেছিলেন । পরে তার থেকে আরো বহু অনুলিপি তৈরি হয় । কৃষ্ণদাস এর পরেও বেশ কিছুকাল জীবিত ছিলেন ।

১১.৪। গ্রন্থ রচনাকাল

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল নিয়ে মতবিরোধ আছে । কোনো কোনো পুঁথিতে এবং প্রায় সব ছাপা বইয়ের শেষে এই রচনাসমাপ্তি কালজ্ঞাপক শ্লোকটি আছে

“ শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে ।

সূর্য্যেহ হৃসিতপঞ্চমাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ।।”

অথাৎ , সিন্ধু , অগ্নি , বাণ , ইন্দু (= ৭৩৫১ , অথাৎ ১৫৩৭) শকাব্দে , জ্যৈষ্ঠ মাসে, রবিবার , কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে বৃন্দাবন মধ্যে এই গ্রন্থ পূর্ণতা পেল । ড . সুকুমার সেনের অভিমত , এটি গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ নয় , কোনো পুঁথির অনুলিখন সমাপ্তির তারিখ নেই। কোনা প্রাচীন পুঁথিতে এই তারিখ নেই । নানা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বিচার করে তাঁর সিদ্ধান্ত — “ বইটি রূপ গোস্বামীর তিরোভাবের পরে এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাবের আগে লেখা হইয়াছিল । ১৫৬০ - ৮০ অব্দ রচনাকালের গণ্ডি ধরিলে অন্যায় হইবে না । ” (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ’ – প্রথমখণ্ড , পৃ . ২৮০)

১১.৫। অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. চরিত কাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

প্রশ্ন ২. চরিত কাব্যের রচনাকাল ও সংস্কৃতে যেসব চরিত কাব্য আছে তার পরিচয় দাও।

১১.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত -অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী

৩. শ্রী চৈতন্য চরিতের উপাদান-ড: বিমানবিহারী মজুমদার

একক ১২। চৈতন্যচরিতামৃতের কাব্য পরিকল্পনা

বিন্যাস ক্রম

১২.১ পরিচ্ছেদ বিভাগ

১২.২ উৎস

১২.৩ কাব্যের বিষয় বিন্যাস

১২.৪ কবিত্ব

১২.৫ ভাষা

১২.৬ আদি লীলার চতুর্থ ও মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ এর গুরুত্ব

১২.৭ অনুশীলনী

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১। লীলা ও পরিচ্ছেদ বিভাগ

'চৈতন্যচরিতামৃত' বৃহৎ গ্রন্থ । এর এক তৃতীয়াংশ সংস্কৃত প্রমাণশ্লোক এবং কবিরাজ - গোস্বামীর স্বরচিত শ্লোকে পূর্ণ । বাকি দুই - তৃতীয়াংশ বাংলা । ছত্রসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার । এই গ্রন্থ আদি, মধ্য ও অন্ত্য - তিনটি লীলায় সম্পূর্ণ । প্রত্যেক লীলা কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । আদিলীলায় সতের পরিচ্ছেদ , মধ্য লীলায় পঁচিশ এবং অন্ত লীলায় বিশটি পরিচ্ছেদ মিলে মোট বাষট্টী পরিচ্ছেদে গ্রন্থের বিষয় গ্রথিত । প্রত্যেক লীলার শেষ পরিচ্ছেদে সেই লীলায় বর্ণিত বিষয়ের অনুবাদ ' , অথাৎ ' সূচী দেওয়া আছে ।

১২.২। কাব্যের উৎস

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথ্যাভিজ্ঞ কবি । তিনি ' চৈতন্যচরিতামৃতে ' র তথ্যাদি আহরণ করেছিলেন বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ষড় গোস্বামীর কাছ থেকে। এ ছাড়াও প্রয়োজনে

বৃন্দাবনদাসের ' চৈতন্যমঙ্গল ' (চৈতন্যভাগবত ') কাব্য থেকেও তথ্যাদি নিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক ও তাত্তিক তথ্যাদি দিয়ে সেগুলি যাচাই করে নিয়েছেন । বৃন্দাবনদাসের কাব্যে গৌরাঙ্গের বাল্য , কৈশোর ও প্রথম যৌবনলীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হওয়ায় তিনি ঐ গ্রন্থের মর্যাদা রাখতে মহাপ্রভুর এই লীলাগুলি সংক্ষেপে সেরেছেন । চৈতন্যের শেষ আঠারো বছরের দিব্যোম্মাদলীলা বর্ণনা করতে কেউ সাহস করেননি । ফলে চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ববর্তী সমস্ত চৈতন্যচরিতগ্রন্থ অপূর্ণ। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস একাজে অগ্রসর হয়েছেন এবং অপূর্ব দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে তা সম্পন্ন করেছেন । এই লীলার তথ্যাদি তিনি পেয়েছেন লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা স্বরূপ দামোদরের কড়চা গ্রন্থ এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শোনা বিবরণ থেকে ।

সংস্কৃত বিদ্যায় কৃষ্ণদাসের অগাধ অধিকার ছিল । তিনি ' চৈতন্যচরিতামুতে যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি তুলেছেন তার অর্ধেক শ্রীমদ্ভাগবত থেকে নেওয়া । অপর গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — গীতা , কৃষ্ণকর্ণামৃত , ব্রহ্মা সংহিতা , গীতগোবিন্দ , পদ্যাবলী (রূপের) , ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (রূপের) , উজ্জ্বল নীলমণি (ঐ) , লঘুভাগবতামৃত (ঐ) , বিদগ্ধমাধব (ঐ) , ললিতমাধব (ঐ) , দানকেলিকৌমুদী (ঐ) , নাটকচন্দ্রিকা (ঐ) , স্তবমালা (ঐ) , স্তবাবলী (রঘুনাথ দাস) , হরিভক্তিবিলাস (সনাতন) , ভগবৎসন্দার্ভ (শ্রীজীব) , শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (ঐ) , গাোবিন্দলীলামৃত (স্বরচিত) , চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং (কবি কর্ণপুর) , চৈতন্যচরিতামৃতম (ঐ) , আর্যাশতক (ঐ) , জগন্নাথবল্লভনাটকং (রায় রামানন্দ) , স্বরূপ দামোদরের কড়চা, ভাবার্থ দীপিকা (শ্রীধরস্বামী) , মহাভারত , রামায়ণ , যাোগবাশিষ্ঠ , বিষ্ণুপুরাণ , কূর্মপুরাণ , পদ্মপুরাণ , নৃসিংহপুরাণ , যামুনাচার্যস্তোত্র , বৃহদগৌতমীয় তন্ত্র , অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (কালিদাস) , রঘুবংশম্ (ঐ) , কিরাতাজুনীয় (ভারবি) , মহাবীরচরিতম্ (ভবভূতি) , নৈষধ চরিত (শ্রীহর্ষ) , কাব্যপ্রকাশ (মম্মট ভট্ট) , সাহিত্যদর্পণ (বিশ্বনাথ) , অমরকোষ , বিশ্বপ্রকাশ , পাণিনিসূত্র , হরিভক্তি সুপাোদয় ইত্যাদি । সংস্কৃত উদ্ধৃতির বিপুল পরিমাণ ও বৈচিত্র্য থেকে কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য ও

অধিগত বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় । বস্তুত তাঁর কাব্যে এত বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ধৃতি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনার গভীর বিচার , ভাগবত ’ ও ‘ গীতা ছাড়া আর সব গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রকে একপ্রকার অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে ।

১২.৩। কাব্যের বিষয়বিন্যাস

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ‘ চৈতন্যচরিতামৃতে ’ শুধু পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যজীবনী রচনা করেননি , গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন , তত্ত্ব ও সাধনারও বিস্তৃত এবং গভীর পরিচয় দিয়েছেন । কাব্য রচনাকালে সুবৃদ্ধ জরাতুর কবির আশঙ্কা হয়েছিল যে তিনি হয়তো জীবৎকালে চৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনা সম্পূর্ণ করে যেতে পারবেন না । তাই কাব্যের মাঝেই শেযলীলা সূত্রাকারে বলে নিয়েছেন ।

কাব্যের আদিলীলার প্রথম বারো পরিচ্ছেদ মুখবন্ধ । বন্দনা , মঙ্গলাচরণ , চৈতন্য - নিত্যানন্দ - অদ্বৈত তত্ত্ববর্ণনা । ভক্তভাব ভক্ত - ভক্তশক্তি ইত্যাদি পথহতত্ত্বের নিরূপণ। চৈতন্যবৃক্ষের মুল স্কন্ধ ও দুই প্রধান শাখার বর্ণনা – এই হ’ল মুখবন্ধের বিষয় । তত্ত্ববর্ণনায় কৃষ্ণদাস স্বরূপ দামোদরের কড়চা ' র রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিবৃতি . . . ' ইত্যাদি এবং শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা ইত্যাদি দুটি শ্লোক অনুসরণ করেছেন । ঐ শ্লোকদুটি অনুসারে শ্রীচৈতন্য একই তনুতে রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি নিয়ে আবির্ভত । শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলিত বিগ্রহ । দ্বাপরে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অপূর্ণ বাঞ্ছা পূরণের জন্যই কলিতে তাঁর নবদ্বীপে আবিভাব । এই তত্ত্বটি চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে । পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ তত্ত্ববর্ণনার শেষ প্রসঙ্গক্রমে কবি তাঁর । বৃন্দাবনে গমনের এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে গ্রন্থরচনার উপলক্ষ্য বিবৃত করেছেন । আদিলীলার শেষ পাঁচ পরিচ্ছেদে চৈতন্যের বাল্য , কৈশোর ও প্রথম যৌবনলীলার বিবরণ যথাক্রমে খুব সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে ।

মধ্যলীলার প্রথম দুই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের শেষলীলার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তৃতীয় থেকে যষ্ঠ পরিচ্ছেদে তার সন্ন্যাস গ্রহন থেকে নীলাচলে উপস্থিতি পর্যন্ত বর্ণিত । তারপর তিন পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিশদ বিবরণ আছে। এদের মধ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদে রাজমহেন্দ্রীতে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্য -

সাধন তত্ত্বের গভীর আলোচনা । দশম পরিচ্ছেদে তাঁর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ও গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলন । একাদশ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদের মধ্যে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রকে অনুগ্রহ , বেড়া - সংকীর্তন , গুন্ডিচামার্জন , রথাগ্রে নৃত্য ও হোরা পঞ্চমীযাত্রা ইত্যাদি উৎসবলীলা । পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিদায় ও বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে ভোজন । ষোড়শে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীর - পথে গৌড় পর্যন্ত । গমন এবং সেখান থেকে শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন । সপ্তদশে ঝারিখণ্ডের বনপথ ধরে বৃন্দাবনে গমন । অষ্টদশে বৃন্দাবন - ভ্রমণ । উনবিংশে বৃন্দাবন ও মথুরা থেকে প্রয়াগে আগমন , রূপ ও অনুপম - বল্লভের সঙ্গে মিলন , রূপকে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব উপদেশ এবং মহাপ্রভুর কাশী - গমন । বিংশে গৌড়ের বন্দীশালা থেকে সনাতনের পলায়ন ও কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলন । একবিংশ থেকে চতুবিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনকে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব বিধি শিক্ষাদান ও তত্ত্বোপদেশ - দান । পঞ্চবিংশে কাশীতে ভক্তিপ্রচার , নীলাচলে প্রত্যাগমন ও মধ্যলীলার অনুবাদ বা বিষয়সূচী । মধ্যলীলা ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর থেকে ছয় বছরের বিবরণ ।

অন্ত্যলীলাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক অজানা তথ্য ও তত্ত্বের খনি । এর প্রথম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর পার্ষদ শিবানন্দ সেন ও পথের কুকুরের কাহিনি , রূপের নীলাচলে আগমন , তাঁর নাটক রচনার শুরু এবং গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাত্রা । দ্বিতীয়ে শিবানন্দ সেন এবং ছাোট হরিদাস কীর্তনিয়ার কথা । তৃতীয়ে যবন হরিদাস ঠাকুরের কথা । চতুর্থে সনাতনের নীলাচলে আগমন ও বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন । পঞ্চম প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা । বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের চৈতন্যজীবনী নাটকের কথা ও বিবিধ তত্ত্বকথা । ষষ্ঠে রঘুনাথ দাসের অপূর্ব বৈরাগ্যসাধনের কথা । সপ্তমে বল্লভ ভট্টের নীলাচলে আগমন ও মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন । অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর কথা । নবমে রামানন্দ রায়ের ভাই গোপীনাথ পট্টনায়কের বিপদ ও উদ্ধার । দশমে রাঘব পণ্ডিত ও তাঁর বোন দময়ন্তীর খাদ্যপূর্ণ ঝালির কথা এবং পরিমুণ্ডা ’ (বেড়া) নৃত্য । একাদশে যবন হরিদাসের তিরোভাব , মহাপ্রভুকর্তৃক তাঁর শেষকৃত্য - সাধন ও মহোৎসব । দ্বাদশে

জগদানন্দ পণ্ডিতের অভিমানকাহিনি । এয়োদশে জগদানন্দের বৃন্দাবন - গমন এবং রঘুনাথ ভট্টের কথা । চর্তুদশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গম্ভীরালীলায় মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদ (সেই ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ ') ও বিলাপ । অষ্টাদশে মহাপ্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণবিরহোনম্মদে সমুদ্রে পতন ও জেলের জালে উদ্ধার । উনবিংশে শ্রীচৈতন্যের প্রগাঢ় কৃষ্ণবিরহবিকার ও বিলাপ । বিংশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু রচিত শিক্ষাষ্টরে আটটি শ্লোক আস্বাদন এবং অবশেষে অন্ত্যলীলার ' অনুবাদ ' বা ' বিষয়সুচী ।

১২.৪। কবি কবিত্ব

' চৈতন্যচরিতামৃত ' কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবিত্বশক্তির পরিচায়ক । এই গ্রন্থ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মৌলিক মহাকাব্য এবং কবিরাজ - গোস্বামী মহাকবি । তাঁর ' চৈতন্যচরিতামৃতে ' দার্শনিকের মনন ও প্রজ্ঞা , ঐতিহাসিকের তথ্যনিষ্ঠা ও বিচারশীলতা এবং কবির ভাবসৌকুমার্য ও কল্পনালীলা একত্রে মিশেছে । বস্তুতঃ এরকম মহাকাব্য বাংলা ভাষার পরম গৌরব । ষোড়শ - সপ্তদশ শতকের অপরিণত বাংলা ভাষায় কৃষ্ণদাস অবলীলাক্রমে পয়ার পঙক্তি সজ্জায় দর্শন ও ইতিহাসের বিষয়কে কাব্যে মননঋদ্ধ প্রবন্ধের রূপ দিয়েছেন । বস্তুতঃ এ কাব্য সে যুগে মননপ্রধান গদ্যের অভাব মিটিয়েছে । আবার গভীর ভক্তিভাব ও বিনয়প্রকাশে এই কাব্যে সঞ্চারিত হয়েছে গীতিকবিতার মাধুর্য ও স্নিগ্ধতা। কৃষ্ণদাসের কবিত্বের সবচেয়ে জোর স্বল্পাক্ষরে গভীর তত্ত্বালোচনায় , সেই দার্শনিক সুলভ প্রজ্ঞার পরিচয় মিলবে নীচের পয়ার ছত্রগুলিতে -

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান ।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ।।

কাব্যের অন্ত লীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে -

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।।
দেহের স্বভাবে করে স্নানভোজনকৃত্য।

কবির মনে যখনই আবেগের সঞ্চার হয়েছে তখনই ত্রিপদীর আশ্রয় নিয়েছেন। এই ভাবনা পরম আস্বাদ্য । যেমন-

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্যদাগে
শুল্ক বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।।

কবিরাজ গোস্বামী দূরূহ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যার সময় যথাসম্ভব পরিমিত স্বল্পাক্ষর গাঢ়বন্ধ সংস্কৃতির আশ্রয় নিয়েছেন।

১২.৫। ভাষা

চৈতন্য চরিতামৃত বাংলা ভাষার প্রথম পাঠকাব্য কাব্য ,গেয় কাব্য নয়। পাঠকাব্য বলেই এর ভাষায় কিছু কাঠিন্য আছে কিন্তু দুর্বোধ্যতা নেই। আপাতদৃষ্টিতে যেটুকু দুর্বোধ্য বলে মনে হয়,সেটা ভাষার দুর্বলতা নয়। বিষয় গভীরতা ও তত্ত্বের কাঠিন্য। এজন্য তিনি ভাষায় কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য অবলম্বন করেছিলেন। এতে অনেক জায়গায় পয়ার ছন্দের মাত্রা ঠিক থাকে নি , কিন্তু প্রকাশে শৈথিলতা নেই । কৃষ্ণদাস দীর্ঘকাল ব্রজবাসী ছিলেন । ফলে তাঁর ভাষায় হিন্দী ব্রজ ভাষার কিছু শব্দ , হিন্দীবাহিত ফার্সী শব্দ এবং ইডিয়াম অবলীলায় ঢুকে পড়েছে । যেমন - যৈছে , তৈছে , যেই , কোই , ইহা , মহা , উহা , মহি , বহি : চানা ইত্যাদি । সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুচারটি সংস্কৃত পদ কবির লেখনীতে এসেছে।

"নিগ্রন্থ হইয়া ইহাঁ অপি নির্ধারণে ।
রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে । ।
চ শব্দ অনবাচয়ে অর্থ সহে আর ।
বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয় যৈছে প্রকার । । "

ডঃ সুকুমার সেন এ - প্রসঙ্গে সঙ্গত মন্তব্য করেছেন – “ চৈতন্যচরিতামত শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়াছে । ” (' বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - প্রথম খণ্ড , পৃ , ১৮৩)

' চৈতন্যচরিতামৃত ' মহাকাব্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের অসামান্য মনীষার পরিচায়ক । ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য করেন - “ এই মহাগ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজের উপনিষদরূপে আজ তিনশত বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধাভরে পথিত হইতেছে।কিন্তু সম্প্রদায়গত প্রভাব ছাড়িয়া দিলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এ গ্রন্থ অবিস্মরণীয় কীর্তি বলিয়াই গণ্য হইবে- বাঙালীর মনন , দর্শন , তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধের এরূপ বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগের গ্রন্থেও সুলভ নহে।" কৃষ্ণদাস কবিরাজের অসামান্য মনীষার জয়স্তম্ভ । অন্য সমস্ত চৈতন্যচরিতগ্রন্থ এই মহাগ্রন্থের আসিতকমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উৎকলন করে এ-কাব্যের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা যেতে উপনিষদরূপে আজ তিনশত বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধাভরে পঠিত হইতেছে । কিন্তু । সাহিত্যে এ গ্রন্থ অবিস্মরণীয় কীর্তি বলিয়াই গণ্য হইবে – বালীর সাধের এরূপ বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগের গ্রন্থেও খুব সুলভ নহে । " (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - দ্বিতীয় খণ্ড , পৃ . ৪৪০ - ৪৪১)

১২.৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থপরিচ্ছেদের এবং মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ এর গুরুত্ব ও উপযোগিতা

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত এই দুটি হচ্ছে শ্রীচৈতন্যজীবন পরিচয়ের পরম গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস গোস্বামীকে চৈতন্যজীবনের ব্যাসদেব বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখে একইরকম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

এই দুটি গ্রন্থের সিদ্ধান্ত দুইপ্রকার। যেখানে দাসগোস্বামী মনে করেন- যুগধর্মনামসংকীর্তন-প্রবর্তন ও প্রচার হচ্ছে শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের মুখ্যকারণ। সেখানে কবিরাজ গোস্বামী মনে করেন শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের মুখ্য কারণ হচ্ছে ভগবানের নিজস্ব

রসাচ্ছাদন বাঞ্ছা- পরিপূরণ এবং রাগানুগা ভক্তির উপদেশও প্রচার। একটিতে নামসংকীর্তন ও অন্যটিতে পরকীয়া প্রেমবিষয়বস্তু ও সিদ্ধান্ত হিসেবে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রত্যেক লীলাবর্ণনার প্রথমে বস্তু নির্দেশ করে তাতে বলা হয়েছে-

তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দেশ
যাহা হইতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ।
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ
সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণ চৈতন্য-প্রসাদ,
সেই শ্লোকে কহি বাহ্য অবতার কারণ
পঞ্চ, ষষ্ঠ শ্লোক এ কহি মূল প্রয়োজন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক দুটি শ্রীচৈতন্য অবতার এর কারণ হিসেবে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু কর্তৃক বিভিন্ন দেশ পরিক্রমার সময় রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর মিলন, ইষ্টগোষ্ঠী ও সাধ্যসাধন তত্ত্বের আলোচনা আছে।তাহলে দেখা যাচ্ছে আদিলীলার চতুর্থপরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতার এর অন্তরঙ্গ কারণ এবং ওই গ্রন্থের মধ্যলীলা অষ্টমপরিচ্ছেদে রাগানুগামার্গের সাধনমাধ্যমে ইষ্টপ্রাপ্তি - এই দুটি মূল্যবানও গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা তথা আলোচনা থাকায় এই অধ্যায় দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মান ও মর্যাদা লাভ করেছে । শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত না হলে এবং এই আবির্ভাব ও আবার কোন বিশেষ অন্তরঙ্গ কারণসম্মত না হলে এবং সেই অন্তরঙ্গ কারণ কি ভাবে সার্থক হবে তার পথনির্দেশ না থাকলে চৈতন্য-জীবনী রচনাই বৃথা হয়ে যেত। গ্রন্থের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা থাকায় সেই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা সার্থক হয়েছে। ভগবানের আবির্ভাব হয় দুই প্রকারে-(১) কখনো তিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হনএবং (২) কখনও বা স্বয়ং রূপে অর্থাৎ পূর্নভগবান অবতারী রূপে আবির্ভূত হন। যখন তিনি পূর্ণভগবৎ স্বরূপে আবির্ভূত হন, তখন অন্যান্য অবতাররা ও ভুভারহরন এর মত কাজের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে এবং একই দেহে অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ তখন

অবতার ও অবতারী অভিন্ন ভাবে যুগপৎ অবতীর্ণহন। ফলে দুটি কাজ একই সঙ্গে সিদ্ধ হয়- ভূভারহরণাদি এবং পুর্ণভগবানের স্বকীয় প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়। যেমন বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে প্রেমরস এবং রাগমার্গ ভক্তি প্রচার করেছেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে অসুর-নিধন করেছেন।

শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবেরও অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ কারণআছে। আগে যে মঙ্গলাচরণের কথা বলা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে এই লীলায় শ্রীহরিপুরট-সুন্দরদ্যুতি শ্রীশচীনন্দনরূপে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি সম্পদ দান করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে প্রকট হয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলেছেন-

"চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কইল সার
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার।"
* * *

তারপরেইবলেছেন-

"সত্য এই হেতু কিন্তু এহ বহিরঙ্গ
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ"
* * *
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গভক্তিলোক করিতে প্রচারণ
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম কারণ
এই দুই ইচ্ছা হইতে ইচ্ছার উদ্গম।

অর্থাৎ দুইটি ইচ্ছা-প্রেমরসআস্বাদন ও রাগমার্গভক্তির প্রচার আদিলীলা ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। অতএব এই পরিচ্ছেদ যে এই গ্রন্থে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করবে এবং করেছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সমগ্র অধ্যায়টিতে এই একই তথ্য বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও সিদ্ধান্তিত হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে কি সেই পরমধন যার পরিতৃপ্তির জন্য স্বয়ং ভগবানকে দেহ ধারণ

করতে হয়েছিল? কি সেই সুখ যা শ্রীভগবান অন্যান্য প্রকট লীলায় আস্বাদন করতে পারেন নি।এই প্রশ্ন ও তার উত্তর এই পরিচ্ছেদে শাস্ত্র সাহায্যে প্রতিপাদিত হয়েছে। এরপর মধ্যলীলা অষ্টমপরিচ্ছেদ এর কথা।এই পরিচ্ছেদের মূল বিষয়বস্তু হল শ্রী মন্মহাপ্রভু ও রায়রামানন্দ- সংবাদবাসাধ্য-সাধনতত্ত্ব। এই সাধ্য-সাধনতত্ত্বই পরকীয়া প্রেমের মূলভিত্তি ও প্রাণবস্তু। বৈধী ভক্তি থেকে রাগানুভক্তিতে উত্তীর্ণ হবার জন্য যে সাধনা পরম্পরা অবলম্বন করতে হয় মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ তার বিস্তৃত বিচার করেছেন।

সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনা কালে মহাপ্রভু রামানন্দকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয় করতে বললেন-

“প্রভু কহে-পঢ়শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।

রায় কহে-স্বধর্ম চরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়-”

প্রথমে বৈধী ভক্তিকে অবলম্বন করে সাধ্য-সাধনতত্ত্বের আলোচনা শুরু হল এবং প্রভুর জিজ্ঞাসার সঙ্গে উত্তরোত্তর উপযোগিতা রক্ষা করে রামানন্দ রায় ধীরে ধীরে রাগানুগাভক্তির আলোচনায় উপনীত হলেন এবং তারপরেই বললেন যে রাগানুগাভক্তির মধ্যেও কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার এবং তার মধ্যেও “রাধারপ্রেম সাধ্যশিরোমণি”।

এই প্রসঙ্গে রামানন্দ রায় বললেন-

“কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়”; সেই উপায় গুলি হচ্ছে-নিজ নিজ ভাব অনুসারে সাধন করে ইষ্টলাভ চেষ্টা। ভাব পাঁচ প্রকার- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই পাঁচটি ভাবের মধ্যে যে ভক্তের যেভাবটি উপযোগী, তিনি সেই ভাবে সাধন করে সিদ্ধিলাভ করবেন। তবে তত্ত্বের ক্ষেত্রে কান্তাভাবই শ্রেষ্ঠ এবং এই কান্তাভাবের মধ্যেও “রাধারপ্রেম সাধ্য-শিরোমণি”-এইভাবেসাধ্য-সাধন তত্ত্বের আলোচনা শেষ হলে প্রভুর নির্দেশে রামানন্দরায় শ্রী কৃষ্ণতত্ত্ব ,শ্রীরাধাতত্ত্ব এবংসাধন তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করলেন এবং বললেন সখীর আনুগত্যে রাগানুগাভক্তিমার্গের ভজনই হচ্ছে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা সাধ্যপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব

দর্শনের মূল তত্ত্বাবলীর বিশদ আলোচনা থাকায় এই অধ্যায়টি ও অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে আলোচনার উপসংহার করা হচ্ছে-

"সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধ পুর
রামানন্দ চরিত তাহে খন্ড প্রচুর
রাধাকৃষ্ণ লীলাতাহে কর্পূর মিলন
ভাগ্যবান যেই, সেই করে আস্বাদন।

১২.৭। অনুশীলনী

প্রশ্ন ১.চৈতন্যচরিতামৃতের কাব্য পরিকল্পনা বর্ণনা করে পরিচ্ছেদ বিভাগ করো।

প্রশ্ন ২.কাব্যের বিষয় বিন্যাস করে উৎস নির্ণয় করো এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবিত্ব পর্যালোচনা করা।

প্রশ্ন ৩. চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ ও মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ এর গুরুত্ব আলোচনা করো।

১২.৮। গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত -অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী

৩. শ্রী চৈতন্য চরিতের উপাদান-ড: বিমানবিহারী মজুমদার

একক ১৩। আদিলীলাঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ কাব্য বিশ্লেষণ

১৩.২ বস্তু সংক্ষেপ

১৩.৩ রাধা তত্ত্ব

১৩.৪ রাধাতত্ত্ব কৃষ্ণ তত্ত্বের সঙ্গে গৌরাঙ্গ তত্ত্বের সম্পর্ক

১৩.৫ গোপী তত্ত্ব

১৩.৬ কৃষ্ণ তত্ত্ব

১৩.৭ অনুশীলনী

১৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

আদি লীলাঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ

১৩.১। কাব্য বিশ্লেষণ

১ম শ্লোকের ব্যাখ্যা

"শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন তদ্রূপাস্য বিনির্ণয়ম।

বালোহপি কুরুতে শাস্ত্রং দ্রষ্টা ব্রজবিলাসিন।" (১)

অর্থ করলে দাঁড়ায় যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজে আমাদের কৃপা করেন তবে নিতান্ত বালক যিনি, তিনিও শাস্ত্র আলোচনার মধ্যদিয়ে চৈতন্যতত্ত্বকে আলোচনা করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপ তত্ত্বকে নিরূপণ করতে সমর্থ হতে পারেন।

মূলবিষয়

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের শুরুতেই মোট সতেরোটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করেছেন। শ্লোকগুলি লেখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষাতে। চৈতন্যের মঙ্গল বন্দনা মূলক শ্লোকগুলি আছে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে আছে শ্রীচৈতন্য অবতার গ্রহণের কারণগুলির আলোচনা। বলা হয়েছে ভক্তিকে দান করার জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। শচী মায়ের ঘরে, শচী মায়ের কোলে জন্ম নিয়েছেন।

আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছদের বিষয়বস্তুই এই গ্রন্থের আদিলীলায় পঞ্চম শ্লোকটিতে উল্লেখিত হয়েছে। ষষ্ঠশ্লোকটিতেও তাই।

আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব তৃতীয় অধ্যায় শ্রীচৈতন্যের অবতার গ্রহণের কারণগুলি ব্যাখ্যা করার পরেও আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তাকে পুনরায় আলোচনা করলেন। কেনকরলেন? এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি নিজে এর উত্তর দিচ্ছেন এই ভাবে-

"চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।

প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার।।

সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।

অর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ।"

এইভাবেই চতুর্থপরিচ্ছেদে তিনি চৈতন্য অবতারের অন্তরঙ্গহেতুকে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। বর্ণনা করেছেন। এইভাবে একই ইচ্ছা নিয়ে তিনি পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে এই অন্তরঙ্গহেতুকে আঁকতে চেয়েছেন।

আদিলীলার সহজ অর্থকে আমরা একের পর এক আলোচনার চেষ্টা করি। এই লীলার প্রথম শ্লোকটির সাধারণ অর্থ হল—চৈতন্যদেব যদি অনুগ্রহ করেন তবে বালকও শাস্ত্র আলোচনার সাহায্যে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপের তত্ত্ব নিরূপণ করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপতো দুটি। প্রথম রূপ রাজাকৃষ্ণ। তিনি দ্বারকাবিলাসী। দ্বিতীয় রূপ প্রেমিকচূড়ামণি। তিনি ব্রজবিলাসী। চৈতন্যদেব এই ব্রজবিলাসী রূপেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। এহেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যের মূর্তিতে আবির্ভূত হওয়ার কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে যদি স্বয়ং চৈতন্যদেব অনুগ্রহ করে সেই স্বরূপকে বুঝতে সাহায্য করেন। যদি তিনি স্বয়ং অনুগ্রহ করেন তবে একটি ছোট্ট বালকও তাঁর আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করতে সম্ভব হবে।

এই শ্লোকের মধ্যে ধরা পড়েছে বৈষ্ণব সুলভ দীনতার ছবি। পরম পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। তবু তিনি এই শ্লোকটিতে পরম দীনতার মধ্য দিয়ে বলতে চাইলেন চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেছেন বা করবেন সে কথা শাস্ত্র নির্দেশিত। সে ঘটনা শাস্ত্রসম্মত। ‘শাস্ত্রংদৃষ্টাং’। এবং তাঁর আবির্ভাবকে বোঝা যাবে না, যদি তিনি না কৃপা করেন। আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের সূচনার শ্লোকটির মধ্য দিয়ে এই ভাবেই চৈতন্য অবতারের কারণকে ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

১ম পয়ারেরব্যাখ্যা

এরপর বললেন—

“জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ”। (পয়ার ১)

এর অর্থ হল শ্রীশ্রীল নিতাইচাঁদ, অদ্বৈত মহাপ্রভু সহ সমস্ত গৌরভক্ত বৃন্দ কে বিজয় ধ্বনি দিচ্ছেন। তাদের বন্দনা গেয়ে নিয়ে চৈতন্য অবতারের কারণকে ব্যাখ্যা করেছেন।

২য় পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর বলেছেন—

“চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।

শ্লোকের অর্থ শুণ ভক্তগণ।।” (পয়ার ২)

প্রশ্ন হল চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে কি কি বক্তব্য আছে সেটা একটু জানা দরকার। আদিলীলার চতুর্থ শ্লোকটি ছিল এইরকম—

“অনপিতিচরীং, চিরাৎ করুণায়বতীর্ণ কলৌ

সমর্পয়িতুমুন্ন তোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।”

এখানে বলা হল শ্রীহরি পূরট সুন্দরদ্যুতি শ্রীশচীনন্দনরূপে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী ভক্তিসমপৎ দান করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে প্রকট হয়েছেন।

৩য় থেকে ৫ম পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর বলছেন--

“পঞ্চম শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।

অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস”।

পঞ্চম শ্লোকের মূল অর্থকে প্রকাশ করার জন্য কবি একটি আভাস বা ভূমিকা তৈরি করতে চাইছেন। আভাস বা ভূমিকা নির্ণয় করতে গিয়ে কবি যেভাবে একটির পর একটি যুক্তিকে নিয়ে আসছেন সেগুলি আমরা এইভাবে আলোচনা করতে পারি—

“চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।

প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার।।

সত্য এই হেতু, কিন্তু বহির এহো বহিরঙ্গ।

আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ।” (৪+৫)

অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের মূল মর্মার্থ হল শ্রীচৈতন্য নাম এবং প্রেমকে প্রচার করার জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কিন্তু এই কারণও বহিরঙ্গের। বাইরের। এর ভেতরেও রয়েছে একটি অন্তরঙ্গ কারণ এবং বলা যায় সেটি মুখ্য কারণ।

ষষ্ঠ পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপরে কবি বলছেন—

“পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রতে প্রচারে।।(৬)

অর্থাৎ পৃথিবীর পাপের ভার কে হরণ করার জন্য বা মুক্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আগেও এসেছেন একথা শাস্ত্র আমাদের বলেছেন। পূর্বে বলতে দ্বাপরে বলা হয়েছে।

৭ম পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপরেই শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন—

“স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার-হরণ

স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন।” (৭)

এর অর্থ হল স্বয়ং ভগবানের কাজ নয় ভূভারকে হরণ করা। স্বয়ং ভগবান নিজে ভূভারকে হরণ করেন না। তিনি বা তাঁর স্বাংশ অবতার বিষ্ণুর ওপর এই ভারহরণের কাজটি অর্পিত আছে।

৮ম থেকে ৯ম পয়ারের ব্যাখ্যা

"কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল।

ভারহরণ কাল তাতে হৈল মিশাল।।

পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।

আর সব অবতার তাতে আসি মিলে।।" (৮+৯)

কিন্তু এটাই সত্য কথা যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যখন আবির্ভাব কাল এসে উপস্থিত হয়, তখন যদি ভূভারহরণের সময় উপস্থিত হয়, তাহলে সেইসময়ে পূর্ণভগবানের সঙ্গেই স্বাংশ অবতারও মিলিতহয়ে এই ধরায় অবতীর্ণ হন।

১০-১১ পয়ারের ব্যাখ্যা

"নারায়ণ চতুর্থবূর্হ্য মৎস্যাদ্যবতার

যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর।।

সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।

ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ।। (১০+১১)

অর্থাৎ নারায়ণ বা পরম ভগবান। চতুর্থর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সংকষণ, প্রদ্যুন্ম এবং অনিরুদ্ধ এই চারিটি ব্যূহ। মতস্যাদ্যবতার অর্থাৎ নারায়ণের মৎস, কূর্ম প্রভৃতি যে দশ অবতার আছে তাই। এরপর বলেছেন যুগ-মন্বন্তরাবতার, অর্থাৎ যুগাবতার ও

মন্বন্তরাবতার। এই সমস্ত অবতার এবং অন্যান্য আর যত অবতার আছে সব। সভে অর্থাৎ সবার সঙ্গে। 'ঐছে' অর্থাৎ এইরূপে।

১২ দশ পয়ারের ব্যাখ্যা

"অতয়েব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।

বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে।"(১২)

এবারে কবি বললেন—যেহেতু স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হবার সময় তাঁর স্বাংশ অবতারেরা সবাই শ্রী কৃষ্ণের দেহভাগের মধ্যেই থাকছেন সেকারণে এই সময়ে জগতের পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেই মিশে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণুর দ্বারা অসুর সংহার করেন। ভূ-ভারকে, পৃথিবীরপাপকে হরণ করেন।

১৩ তম পয়ারের ব্যাখ্যা

"আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ।

যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ।" (১৩)

অর্থাৎ 'আনুষঙ্গ' বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবস্থিত বিষ্ণুর কাজ।

শ্রীচৈতন্য অবতারের এই যে কারণ গুলিকে ব্যাখ্যা করতে কবি একের পর এক যুক্তি দিচ্ছেন তাতে প্রথমে আমরা পেলাম তিনি 'বহিরঙ্গ' এবং 'অন্তরঙ্গ' এই দুটি ভাগে অবতারের অবতীর্ণ হওয়াকে বিভক্ত করলেন।

আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নেবো শ্রীচৈতন্যের অবতারের বহিরঙ্গ কারণ ছিল দুটি। প্রথমটি নাম প্রচার এবং দ্বিতীয়টি পাষণ্ডীদের উদ্ধার। কবি একে বলছেন গৌণ কারণ।

আমরা ক্রমান্বয়ে জানতে পারবো ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ প্রধানত নিজে রসকে আস্বাদনের জন্য শ্রীমতির অর্থাৎ রাধার ভাবকান্তি নিয়ে ধরায় এসেছিলেন। নামকীর্ত্তন এবং পাষণ্ডীদের উদ্ধার সাধন ছিল আনুষঙ্গিক ফল ! নিজ রসকে আস্বাদন করাই ছিল অন্তরঙ্গ বা মুখ্য কারণ। আমরা এও উল্লেখ করতে পারি "স্বয়ং ভগবানের কর্মনহে ভারহরণ" অর্থাৎ এই পৃথিবী যখন অত্যাচার এবং অনাচারে, অধর্মের গ্লানিতে পূর্ণ হ্যে যায়, তখন পৃথিবী পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হয়। তখনই ভগবানের আবির্ভাব ঘটে।

শ্রীভগবানের প্রকাশ ঘটে দুটি রূপে। কখনও অবতারে, আবার কখনও অবতারী। স্বয়ং ভগবান নিজে অবতীর্ণ হয়ে কোন্ সময় ভূভারকে হরণ করেন না। তাঁর স্বাংশ অবতার বিষ্ণুই এই কাজটি করে থাকেন।

এবার কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরোও বলতে চাইছেন বৈষ্ণব শাস্ত্র অবতারকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন পূর্ণাবতার ও অংশবতার। অংশাবতারেই অধর্মের দমন করেন। পূর্ণাবতারে নন। কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, বা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল উপস্থাপিতহয়, তখন যদিভূ-ভারহরণের সময় উপস্থিত হয় যা অংশাবতারের কাজ তা সত্ত্বেও এই সময়ে পূর্ণ ভগবানের সঙ্গেই আসেন অংশাবতার স্বাংশ অবতার মিলিত হয়ে থাকেন পূর্ণঅবতারের সঙ্গে।

কবি যেখানে যুগাবতার এবং মৎসাবতার এই দুটি শব্দকে বললেন তার সহজ অর্থটি হল আমাদের যুগাবতার হল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারযুগের চার অবতার। আর মৎস অবতার কথার মধ্যে অর্থ হল মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি এই দশ অবতারের কথাকেই স্মরণ করেছেন কবি।

'যুগমন্বন্তরাবতার' বলতে বোঝানো হয়েছে - ব্রহ্মার দেহ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন মনু। এই মনুর ছেলে মেয়েরাই মনুষ্য জাতির বিস্তার ঘটিয়েছিল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারটি যুগের সর্বমোট চার সহস্র কাল হল ব্রহ্মার একদিন। ঐ যে এক ব্রহ্মদিনে চতুর্দশ মনুষ্য জন্ম নেন। ঐ এক এক মনুর অধিকার কালকে বলা হয় মন্বন্তর। যখন মন্বন্তর কাল পূর্ণ হয় তখন এক এক মনুর বিলুপ্তি হয়। অন্য মনু এবং

দেবতার উদ্ভব ঘটে। এভাবেই উত্তম, তামস, রৈবত, বৈবস্বত, সাবর্নি প্রভৃতি চতুর্দশ মনুর কালকে এক কল্প বলা হয়। আর তাদের বলা হয়ে থাকে মন্বন্তরাবতার।

১৪নং পয়ারের ব্যাখ্যা

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এরপর বলছেন —

"প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন

রাগমার্গভক্তিলোকে করিতে প্রচারণ।"(১৪)

এখানে প্রেম হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের সব-সুখবাসনাশূন্য ঐশ্বর্যজ্ঞান বিরহিত নির্মল প্রীতি। এ প্রেম মনুষ্য প্রেম সদৃশ নয়। রস বলতে বোঝানো হয়েছে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর বৈষ্ণবীর এই চার রসকে। বৈষ্ণব ধর্মের ব্রজলীলায় শান্তরসের স্থান নেই।

প্রেমরসের নির্যাস বা সারকে আস্বাদন করার জন্য রাগমার্গভক্তিকে প্রচার করেছেন শ্রীভগবান।

এখন বিচার্য কি এই রাগমার্গ ভক্তি? রাগমার্গ ভক্তি হল রাগানুগাভক্তি। রাগ অর্থাৎ অনুরাগ। শ্রীভগবানের প্রতি ভক্ত তন্ময় বা আবিষ্ট হয়ে থাকেন। বৃন্দাবনে ভগবান লীলা করেছেন। কোন সময়ে দাস্য রসে, কোন সময় সখ্য, কোন সময় বাৎসল্যে, আবার কখনো মধুরে। এই সব ভাবকে আশ্রয় করেই ব্রজবাসীরা ভগবানের ভজনা করেছিলেন। তাঁদের এই ভজনা বা ভক্তিকে বলা হয়ে থাকে রাগানুগাভক্তি।

আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি যে চৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে বলছেন ' রাগাময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম'। বৃন্দাবনে সখ্যভাবে শ্রী কৃষ্ণের আরাধনা করেছেন শ্রিদাম, সুদাম। পুত্রভাবে নন্দ যশোদা।এরা নিজ ইন্দ্রিয়রসনাকে তুষ্ট করার জন্য এই সাধনা করেন নি। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছার জন্যই সাধনা করেছেন। এই ভক্তি

হল রাগাত্মিকা ভক্তি। কোন সাধারণ জীবের পক্ষে এই রাগাত্মিকা ভক্তিকে লাভ করা অসম্ভব।

১৫ এবং ১৬নং পয়ারের ব্যাখ্যা

চৈতন্যচরিতামৃতকার এরপর বলছেন—

"রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।

এই দুই ইচ্ছা হৈতে ইচ্ছার উদ্গাম।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।

ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।(১৫+১৬)

কৃষ্ণকে এখানে রস আস্বাদের চূড়ামনি বলে উল্লেখ করা হল। তিনি পরম দয়ালু। এই রসিক কৃষ্ণ প্রেম নির্যাসকে আস্বাদন করার জন্যই ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন। তিনি পরম দয়ালু। এই কারণেই রাগামার্গভক্তিকে তিনি প্রচার করেন। কবি এখানে যে বললেন 'এই দুই ইচ্ছা'।দুই ইচ্ছা বলতে বোঝানো হল-(১)প্রেমরসকে আস্বাদন করা এবং রাগমার্গভক্তিকে প্রচার করা।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আর ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম বলতে বোঝানো হল—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানকে ষড় ঐশ্বর্য্যময় রূপে চিন্তা করা হয়ে থাকে যেখানে। জীবকে ভাবা হয়ে থাকে তাঁর দাসানুদাস হিসেবে। আর ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেম হল ঐশ্বর্যের দ্বারা শিথিলতা প্রাপ্ত বা হীনতাপ্রাপ্ত যে প্রেম।

বৃন্দাবনের যে লীলা সেখানে শান্তরসের ঠাঁই নেই। এই রস ঐশ্বর্য্যশিথিলতা প্রাপ্ত। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে—তিনি ভাবেন—'আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন' এমন জনের প্রতি তিনি কোনওসময়ই বস নন। এই কারণে যে শান্তরসের মধ্যে এই ঐশ্বর্য্যশিথিলতা তাতে শ্রীকৃষ্ণ বশ নন।

১৭ এবং ১৮নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপরই কবি বলতে চাইলেন শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম উপলব্ধির কথা—

“আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।

তার প্রেম বশ আমি না হই অধীন।।

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।

তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।”(১৭+১৮)

অর্থাৎ শ্রীভগবান বললেন যে ভক্ত ভগবান বা আমাকে ঈশ্বর মান্য করে নিজেকে হীন মানে তার প্রেমে বা ভক্তিতে আমি কোন সময়ের জন্যই অধীন হইনা। তিনি এও বললেন—আমাকে যে যে ভক্ত যে যে ভাবে ভক্তি বা পূজা করে সেই সেই ভাবেই আমি তাঁর কাছে ধরা দিই।

এরপর শ্রীগীতার (৮/১১) থেকে একটি শ্লোককে উদ্ধার করলেন চৈতন্যচরিতামৃতকার। শ্লোকটি এইরকম—

২য় শ্লোকের ব্যাখ্যা

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।

মম বর্ত্মানুবর্ত্ততে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।” (২ নং শ্লোক)

অর্থাৎ হে পার্থ যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি সেভাবেই তাদেরকে ভজনা করে থাকি বা কৃপা করে থাকি। মানব সকল সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে থাকেন।

২৯ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এরপর বলছেন—

“মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ।

এইভাবে করে যেই মোর শুদ্ধ ভক্তি” (১৯)

শুদ্ধভক্তি হল নির্মলা ভক্তি। শুদ্ধ সখা হলেন ঐশ্বর্য্যশূন্য সখা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে তিনি মোর পুত্র অর্থাৎ কৃষ্ণকে পুত্ররূপে ভেবে যে সাধনা যা নন্দ যশোদার বাৎসল্যরসের সাধনা, মোর সখা অর্থাৎ কৃষ্ণকে সখা রূপে সাধনা যা করেছিলেন শ্রীদাম,সুদাম, মোর প্রাণপতি অর্থাৎ কৃষ্ণকে পতিরূপে চিন্তা করে যে সাধনা।এই সাধকেরা সবাই শুদ্ধ ভক্ত এঁদের সাধনা ঐশ্বর্য্য সাধনা।

২০ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এর পরেই বললেন—

“আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।

সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।।” (২০)

বৃন্দাবনের এই যে শুদ্ধ ভক্তেরাএরা সবাই নিজেকে কৃষ্ণের সমান ভেবেছেন। কৃষ্ণ তাদের আপনার ধন। যেখানে বড় ছোট প্রশ্ন নেই। সেখানে সমান ভাব।

৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যা

এই ভাবনাকে পুষ্ট করার জন্য আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজ সমর্থনে একটি উদ্ধৃতি আনলেন এইভাবে —

"ময়ি ভক্তির্হি ভুতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীস্মৎস্নেহা ভবতীনাং মদাপনঃ।" (শ্লোক-৩)

২১-২৪ পয়ারের ব্যাখ্যা

কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন—

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করেণ বন্ধন।

অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন।।

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহন।

তুমি কোন বড় লোক? তুমি আমি সম।।

প্রিয়া যদি মান করে করিয়ে ভৎর্সনা।।

বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।।

সেই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার।

করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।।

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।

এখানে কৃষ্ণের গর্ভধারিণী মা অর্থাৎ দেবকীর কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে বৃন্দাবনে তাঁকে যে পালন করেছেন সেই যশোদা মায়ের কথা। দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান মানতেন। যথার্থ বাৎসল্য রসের সাধিকা হিসেবে দেবকী নন। বলা হল যশোদার কথা। তিনি পুত্রভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণকে বাৎসল্য রসে সাধনা করেছেন। তাঁকে হীন ভাবে অর্থাৎ অন্যান্য মায়েরা যেমন তাঁদের পুত্রকে পালনের সময় শাসন– ত্রাসন ভালবাসা দেন যশোদা তাই দিতেন কৃষ্ণকে।

সখারা কাঁধে নিয়ে, আবার কৃষ্ণের কাঁধে চড়ে যখন বেড়িয়েছেন তখন সেই ব্যবহারের মধ্যে কোন ছোট বড় প্রভেদ ছিল না।

প্রিয়া রূপে ব্রজ নারীরা কৃষ্ণকে কোন কোন সময় প্রয়োজনে ভৎর্সনাও করেছেন। এই যে শ্রীকৃষ্ণকে অভেদ ভাবা। ভাবতে পারা, এর মধ্যেই ভগবান নিজেকে ধরা দিয়েছিলেন, আর এই ভক্তরাই শুদ্ধভক্ত হিসেবে বৈষ্ণব দর্শনে চিহ্নিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন বেদস্তুতিতে আছে ঐশ্বর্যজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের ভাল লাগে না।

২৪-২৬ পয়ারের ব্যাখ্যা

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কলমে এর পরেই ভগবানের সেই কথা ধ্বনিত—

“ এই শুদ্ধভক্তলঞা করিমু অবতার।

করিব বিবিধবিধ অদ্ভূত বিহার।।

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।

সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার।

মো বিষয়ে গোপীগণের উপজাতি ভাবে।

যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।”

এখানে ‘উমাপতি ভাব’ কথাটি প্রথমে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। বৈষ্ণব ধর্মে এবং শাস্ত্রে পঞ্চরসের সাধনার কথা আছে। এই পঞ্চরসের সাধনার মধ্যে আবার মধুর রসের সাধনাকে বলা হয়ে থাকে কান্ত্য প্রেমের সাধনা। এখানে স্বকীয়ার থেকে আবার পরকীয়া প্রেমেই বা প্রেমই অতিরসের উল্লাস। বৃন্দাবনের গোপীনীরা মূলত পরকীয়ারসেই সাধনা করেছেন। এই গোপীনীদের কাছে কৃষ্ণ উপপতি। ঐ পরকীয়া রমণীদের প্রেমই কৃষ্ণের কাছে সর্বস্ব। উপপতি হলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে উপপতি ভাবা।

যোগমায়া হলেন শ্রীকৃষ্ণেরস্বরূপশক্তি এবং তার সত্ত্বেও পরিণতি বিশেষ। ইনি যা কিছু সম্ভব নয় তাকেও সম্ভব করে ফেলতে পারেন।

আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজলীলা তার উদ্দেশ্য ছিল রাগমার্গভক্তিকে প্রচার করা। এই যে রাগমার্গভক্তি তা শুধুমাত্র পরকীয়া প্রেমের সাহায্যেই প্রচার হতে পারে। গোপীরা হলেন কৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণেরস্বরূপশক্তি। কৃষ্ণের স্বকান্তা। তাই কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের এই কান্তাদের মধ্যে পরকীয়াভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেইযোগমায়া প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁদের স্মৃতি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেল। মহামায়ার প্রভাবেই এটা হল। এই জন্যই শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীনীরা মনে মনেভাব্লেন তারা কৃষ্ণ থেকে আলাদা। কৃষ্ণ তাঁদের উপপতি। যোগমায়ার প্রভাবেই সবার কাছে এই কাল্পনিক ব্যাপারটিই বাস্তব বলে মনে হতে থাকে।

২৭-৩০ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কলমে এরপর ভগবান বলছেন—

“আমিহ না জানি তাহা না জানোগোপীগণ।

দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন।।

ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।

কভু মিলে, কভু না মিলে – দৈবের ঘটন।।

এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ।

এই দ্বারে করিব সবভক্তেরে প্রসাদ।।"

স্বয়ং ভগবান বলেছেন যোগমায়ার প্রভাব এত বেশি যে শ্রীকৃষ্ণসর্বজ্ঞ হয়েও এর প্রভাব অর্থাৎ যোগ মায়ার দ্বারা এই যে কান্তাগণকে পরকীয়া ভাবার প্রভাব তাঁকে জানতে পারেন নি।

‘ধর্ম ছাড়ি’ বলতে বোঝানো হল সমাজকর্ম বা বেদ ধর্ম ছেড়ে। রাগ বলতে এখানে অনুরাগ বলা হয়েছে। অনুরাগ হল মহাভাব।

৩০ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর বললেন – “ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ/ রাগমার্গভক্তের যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম ।” অর্থাৎ বৃন্দাবনের যে কামনা বাসনা শূন্য প্রেমসাধনা তা হল ব্রজের নির্মল রাগ। এই রাগ বা প্রেমের মধ্যে কোন বাসনা বা কামনার স্থান নেই।

৪ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এবার ভাগবতের থেকে এই কথাগুলির সমর্থনে একটি উদ্ধৃতি নিয়ে এলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। উদ্ধৃতিটি এই রকম—তথা হি —(৩৬/৩৩/১০/ভাঃ)

“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপারোভবেৎ।।” (৪ নং শ্লোক)

অর্থাৎ ভগবান ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্য সেইরূপ লীলা সম্পাদন করে থাকেন যে সমস্ত লীলা শ্রবণ করে মনুষ্য দেহ ধারণকারী জীব ভগবৎ পরায়ণ হন। অর্থাৎ ভক্তদের প্রতি কৃপাবসতঃ ভগবান নরদেহ ধারণ করে লীলা করতে এই পৃথিবীতে আসেন। লীলা করেন। সেই সব লীলা শ্রবণ করে জীবরাভগবৎ পরায়ণ হয়ে থাকেন।

৩১ পয়ারের ব্যাখ্যা

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করার পরে চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখলেন—

“ভবেৎ’ ক্রিয়া বিধিলঙ সেই ইহা কয়।

কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায়।” (৩১)

এখানে ভূ-ধাতুর বিধিলঙে প্রথম পুরুষের একবচনে 'ভবেৎ' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। বিধি বলতে বোঝানো হয়েছে কর্তব্য। তাই এর অর্থ দাঁড়ালো যেখানে বিধিলঙের প্রয়োগ হবে, সেখানেই এই কাজ অবশ্য কর্তব্য। না যদি করা হয় তবে পাপ হবে। এখানে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে ভগবৎ লীলা কথা শ্রবণ করে মানুষকে ভগবৎ পরায়ন হতে হবে। আর তা যদি না হয় তা হবে পাপ।

৩২-৩৩ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর বলা হল—

"এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রকট্য কারণ।

অসুর সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন।।

এইমত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম।" (৩২-৩৩)

এইবাঞ্ছা বলতে বোঝানো হয়েছে রস-নির্যাস আস্বাদন এবং রাগমার্গভক্তি প্রচার এই দুই ইচ্ছা কথা। এই দুইটিই ছিল শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের প্রকট কারণ। আর আনুষঙ্গ প্রয়োজন ছিল অসুর সংহার। যুগধর্ম প্রবর্তন বলতে কলিযুগচিত ধর্ম শ্রীহরিনাম প্রচার করা।

৩৪ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর কবি বললেন—ভগবান বলছেন—

"কোন কারণে যবে হৈল অবতার মন।

যুগধর্ম্মকাল হইল সে কালে মিলন।"

অর্থাৎ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বশতঃ যখন স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হবার ইচ্ছা পোষণ করেন তখনই যুগধর্ম প্রচারের সময় এসে উপস্থিত হয়। তখন যুগধর্ম প্রবর্তকারী বিষ্ণুকে ভগবানের দেহেই আবির্ভূত হতে হয়েছিল।

৩৫ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এবার বলা হল—

"দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।

আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন।"

অর্থাৎ ভগবান দুটি হেতু ধরাধামে এলেন। একটি প্রেমস্বাদন এবং অন্যটি নাম সংকীর্তন। ভক্তগণ বলতে বোঝানো হল পর্ষদগণকে।

৩৬ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।

নাম প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে।"(৩৬)

এখানে চৈতন্য অবতারের কারণকে ব্যাখ্যা করেছেন কবি। 'সেই দ্বারে' এই কথাটির তাৎপর্য হল নামকীর্ত্তন এবং প্রেমস্বাদনের দ্বারা। আচণ্ডাল কীর্ত্তন সঞ্চারের মধ্যে যেন বোঝানো হল যারা সমাজে অস্পৃশ্য যারা চণ্ডাল তারা পর্যন্ত। সমাজের সর্বস্তর পর্যন্ত এই নাম গান প্রচার করছেন ভগবান স্বয়ং। এই নাম গান প্রচার যেমন করছেন তেমন ভাবে করছেন এর প্রেম রস গ্রহণ। একদিকে প্রচার অন্যদিকে প্রেমস্বাদ গ্রহণ এই দুই কাজই তাঁর দ্বারা হচ্ছে। তাই তিনি শুধুমাত্র অবতার নন। তিনি হলেন স্বয়ং ভগবান।

৩৭-৪০ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপরে বলা হচ্ছে—

"এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গিকার।

আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার।"(৩৭)

ভগবান নিজে ভক্তভাবেঅঙ্গিকার করে নামগান প্রচার করছেন। নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে নামের মাহাত্ম্যকে বোঝাচ্ছেন। ভক্তিকে প্রচার করেছেন।

"দাস্য,সখ্য,বাৎসল্য আর শৃঙ্গার।

চারিভাবের চতুর্বিধ ভক্তই আঁধার।"

অর্থাৎ এক এক ভাবের ভক্তই এক এক ভাবের আধার। এক এক ভাবের ভক্ত এক এক ভাবকে আশ্রয় করে এগিয়ে যান। কেউ দাস্যভাবকে আশ্রয় করে,কেউ সখ্য ভাবকে আশ্রয় করে, কেউ বাৎসল্য ভাবকে, কেউ বা কান্তভাবকে।এই কান্তভাবই হল শৃঙ্গারভাব।

"নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করিমানে

নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে।।"

ভক্তের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রত্যেক ভক্তই মনে করেন তার ভাবটিই হল শ্রেষ্ঠভাব। তার ভাবটি অন্য তিনটি ভাবের থেকে উচ্চ। ভক্তেরা নিজ নিজ ভাবকে অবলম্বন করে তাদের ভাবের আশ্রয় ভগবানের পূজা করেন। তার সেবা করেন। ভগবানের সেবা করে নিজে সুখী হন। সুখ লাভ করেন।

"তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।

সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।"

“তটস্থ হইয়া” এই কথাটির অর্থ হল নিরপেক্ষ ভাবে। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলছে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের মধ্যে শৃঙ্গাররসই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই ভাবের মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রতিটি ভাব। এর মাধুর্য বেশী।

৫নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপরেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে স্থায়িভাবহলহর্য্যাম্ (৫/২১) থেকে একটি উদ্ধৃতি এইভাবে চয়ন করছেন চৈতন্যচরিতামৃতকার

“যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসমষ্যপি।

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ।।” (শ্লোক-৫)

এর অর্থ হল ঐ রতিঃ ক্রমান্বয়ে বিশেষ স্বাদের আধিক্যযুক্ত হয়ে পরে। বাসনার জন্য কোনও রতি কারো কারো কাছে স্বাদযুক্ত মনে হতে থাকে। অর্থাৎ একথা বলার মধ্য দিয়ে কবি বলতে চাইলেন বা এই উদ্ধৃতি চয়নের মাধ্যমে তিনি সমর্থন আদায় করে নিয়ে এই মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন যে ঐ সব রতি উত্তরোত্তরক্রমে অধিক স্বাদবিশিষ্ট হলেও বাসনার বিভিন্নতা থাকে ভক্তদের মধ্যে এক এক জনের মনের বাসনা এক এক রকমের। এই জন্য কারো কারো কাছে কোন কোন বিশেষ রতি বিশেষ স্বাদযুক্ত মনে হতে থাকে।

৪১নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“অতয়েব মধুর রস কহি তার নাম।

স্বকীয়া-পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।” (৪১)

এখানে বৈষ্ণব শাস্ত্রের একটি পরম সত্যকে কবি উল্লেখ করলেন। বললেন সব ভাবের থেকে শৃঙ্গাররসের মাধুর্য-ই বেশী। এই কারণে শৃঙ্গার রসকে বলা হয়ে থাকে মধুর রস।

স্বকীয়া-পরকীয়া ভেদে মধুর রসের সাধিকারাও দুই প্রকারের হয়ে যান।

শাস্ত্রমতে বিবাহবিধি অনুসারে পতিপ্রেমে অবিচলিতা নারীকেই বলা হয় স্বকীয়া নারী। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মোট আটজন বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। এরা ভগবানের স্বকীয়া নারী। স্বকীয়া নায়িকা।

আর যে সাধিকা বা নায়িকা ইহকাল পরকালের ভয় করেন না, আসক্তির কারণে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সমাজ এঁদের পত্নীরূপে স্বীকৃতি দেন নি। তবু প্রেম নামক পূজার অধিকারে এঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই নায়িকাদের বলা হয়ে থাকে পরকীয়া নারী।

আমাদের সমাজজীবনে এই পরকীয়া নায়িকাদের নিন্দে করা হয়েছে বরাবর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় এরা নিন্দিত নন। রাধা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী-র মত অষ্ট সখী এই পরকীয়া সাধনার নায়িকা।

পরকীয়াকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। (১) পারোঢ়া। এরা পরের বিবাহিতা স্ত্রী। (২) কন্যকা। এরা অবিবাহিতা কুমারী নারী।

এই পারোঢ়াকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সাধনপরা, দেবী এবং নিত্যপ্রিয়া। নিত্যপ্রিয়া হলেন শ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধা এই নিত্যপ্রিয়া শ্রেণীর নায়িকা।

৪২নং পয়ারের ব্যাখ্যা

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহিবাস।। (৪২)

পরকীয়া কান্তাপ্রেমের মধ্য দিয়েই মধুর রসের আনন্দঘন উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে। শাস্ত্র বলছে স্বকীয়া ভাব অনেকবেশীসহজলভ্য। পরকীয়ার তা দুরধিগম্য। নায়িকাকে অনেক

বাধার সেখানে সম্মুখীন হতে হয়। বাধা শুধু প্রকৃতির নয়, বাধা গৃহের, গুরুজনদের এই সমস্ত বাধাকে পেছনে ফেলে ভগবানকে লাভ করার জন্য ভক্ত এগিয়ে চলেন।

একমাত্র কৃষ্ণধামব্রজধামেই এই পরকীয়া সাধনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অন্যত্র নয়। রাধা চন্দ্রাবলীদের কৃষ্ণের প্রতি যে আকর্ষণ তাতে বা তার মধ্যে কোন অনুশাসন নেই। এই পরকীয়া সাধনা ভগবানের পূজায় নিবেদিত হয়ে এক অসীম আনন্দ অনুভবকে পৃথিবীতে আনতে পারে। তাকে কোন কিছুর মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

৪৩ নং এবং ৪৪ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“ব্রজ্যবধূগণের এই ভাব নিরবধি।

তার মধ্যে শ্রীরাধায়ভাবের অবধি।।

প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম।

কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ।

বৈষ্ণবীয় মতে রাধা প্রেম সবচেয়ে বেশি পবিত্র। সে প্রেম নিজ সুখবাসনা মুক্ত। রাধা প্রেম কৃষ্ণোন্দ্রিয় প্রীতিকেই একমাত্র জীবনের অবলম্বন মনে করে। ব্রজনারীদের মধ্যে যারাই কৃষ্ণের সাধনা করেছেন তারা সবাই মনে করেন। তবে তার মধ্যে ব্রজনারীদের মধ্যে কান্তাপ্রেম ভাবের সীমাকে পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছে মহাভাব সীমার দিকে। আর এর মধ্যে আবার শ্রীরাধিকার প্রেম মহাভাবের শেষ সীমাকে ছুঁতে পেরেছে। এই রাধা প্রেম প্রৌঢ় অর্থাৎ সম্পূর্ণহতে পেরেছে। রাধাপ্রেমবহুবিচিত্র ভাবের দোলায় দুলছে। এই রাধা প্রেমই কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের শ্রেষ্ঠতম উপায়।

প্রৌঢ় কথাটি এখানে সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই রাধা প্রেম নির্মল অর্থাৎ নিজ সুখ বাসনা চায় না এই প্রেম। এই প্রেম অন্যান্য ভাবের থেকে শ্রেষ্ঠতম।

৪৫নং পয়ারের ব্যাখ্যা

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি

সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।

এখানে 'সেইভাব' বলতে বোঝানো হল রাধাভাব। অর্থাৎ রাধাভাবকে অঙ্গীকার করে। নিজ প্রেম আস্বাদনরূপ আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভাবকে অঙ্গীকার করে জন্ম নিলেন।

৬নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এই কথাগুলির সমর্থনের দুটি শ্লোককে এবার চয়ন করলেন শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরত্ন। শ্লোক দুটি এইরকম–

তথা হি স্তবমালায়াং প্রথমচৈতন্যস্তবে (১ম চৈতন্যাষ্টকে ২)-

"সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপরিষদাং

মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।

বিনির্য্যাসো প্রেম্নোনিখিলপশুপালাম্বুজদৃশ্যাং।

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম।" (শ্লোক-৬)

এর অর্থ হল ইন্দ্রদিদেবতাবর্গের দুর্গস্বরূপ উপনিষৎ সমূহের একমাত্র গতি, মুনিগণের সর্বস্ব, ভক্তবৃন্দের মাধুর্য, সমস্ত পদ্মলোচনা ব্রজগোপীগণের প্রেমের সার, সেই চৈতন্যদেব কি আবার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হবেন? অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাবের বিগ্রহ হলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

৭নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় শ্লোকটি এইরকম -

তথৈব দ্বিতীয় স্তবে (২য় চৈতন্যাষ্টকে ৩)

“অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী

রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।

রুচং স্বামাবরে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিররতিতরাং নঃ কৃপয়তু।” (শ্লোক-৯)

এর অর্থ হল কৌতুহল পরায়ণ হয়ে প্রণয়িনীব্রজগোপীদের মধ্যে যিনি কোন একজনের অনির্বচনীয় অসীম মধুর রসপুঞ্জহরণ করে উপভোগের জন্য এই পৃথিবীতে তাঁর কান্তি প্রকটিত করে নিজের দেহ কান্তিকে আবৃত করেছিলেন সেই চৈতন্যরূপশ্রীকৃষ্ণ আমাদের অতিরিক্তভাবে কৃপা করুণ।

৪৬নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপরেশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন –

“ভাবগ্রহহেতু কৈল ধর্ম্মস্থাপন।

মূলহেতু আগে শ্লোক করি বিবরণ। (৪৬)

মূল হেতু বলতে বলা হল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের কারণ হেতু। ন তার কারণ। যদিও চৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ হেতু যুগধর্মস্থাপনের বিষয়টিও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৪৭-৪৮ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“ভাব গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।

তালাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার।।

এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।

এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ।।" (৪৭+৪৮)

কবি বলছেন কেন শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভাবের জন্য শ্রীকৃষ্ণরাধাভাবকে গ্রহণ করলেন এবং কিভাবে করলেন তারই জন্য পঞ্চম শ্লোকের বিচার উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম শ্লোকের আভাস বা ভূমিকা রচিত হয়েছে। সেই ভূমিকাকেই কবি ব্যক্ত করতে চান।

৮নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

পঞ্চম শ্লোকটিকে কবি উপস্থাপিত করেছেন এই ভাবে

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামী করচায়াম্

"রাধা কৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতহর্লাদিনী শক্তিরস্মা।

দেকাত্মানবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং।

রাধাভাব-দ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম।" (৮নং শ্লোক)

এর অর্থ হল শ্রীরাধা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিকাররূপিণী। শ্রীকৃষ্ণেরহলাদিনীশক্তি। এই কারণেই তাঁরা স্বরূপতঃ এক আত্মা হলেও অনাদিকাল থেকে পৃথিবীতে ভিন্নদেহ ধারণ করে আছেন। সেই দুজন একত্র প্রাপ্ত হয়ে শ্রীরাধার ভাব ও দেহকান্তি দ্বারা সুবলিত এবং এখন প্রকটিতশ্রীচৈতন্যনামধারীশ্রীকৃষ্ণ স্বরূপকে প্রনাম করি।

৪৯ এবং ৫০ নংপয়ারের ব্যাখ্যা।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অনোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি।।

সেই দুই এক এবে- চৈতন্য গোঁসাই।

রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।” (৪৯+৫০)

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাস্বরূপতঃ এক। শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। রাধা শক্তি। কৃষ্ণ হলেন শক্তিমান। শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ বলে কৃষ্ণ এবং রাধা স্বরূপও এক। এই ধরাকে মধুর রস আস্বাদন করাবার জন্য তাঁরা দুই দেহে এসেছেন ‘অনোন্যে বিলাস’ করেছেন তাঁরা। অর্থাৎ পরস্পরের সাথে বিলাস বা লীলা করেছেন।

এই দুইজনঅর্থাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের এখন কলিযুগে একত্র রূপ ধারন করে শ্রীচৈতন্যরূপধারন করেছেন। এইভাবে আসার কারণ হল রস আস্বাদিতেঅর্থাৎ একত্র পূর্ণভাবে আশ্রয় ও বিষয়জাতীয়রসআস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৫২ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

“রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।

স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহারা।। (৫২)

‘প্রণয় বিকার’ কথাটির অর্থ হল প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। আমরা শাস্ত্রমতে জেনেছি প্রেমের চরমতম পরিনতি হল মহাভাব। শ্রীরাধা হচ্ছেন মহাভাব স্বরূপিণী। স্বরূপশক্তির অর্থ হল শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি। ভগবানের চিচ্ছক্তিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। এরা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। কেন না এরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবর্তমান শক্তি। হ্লাদিনী হলেন শ্রীমতি রাধা। এখন প্রশ্ন অন্য ব্রজনারী যাঁরা যাঁরা কৃষ্ণের পরকীয়া সাধীকা তারা কি হ্লাদিনী নন? আসলে তারাও হ্লাদিনী। তবু একথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় শ্রীমতি রাধা হচ্ছেন হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। রাধাকে সেই জন্য হ্লাদিনী নামেই ডাকা হয়।

৫৩ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

“হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণের আনন্দাস্বাদন।

হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।।" (৫৩)

হ্লাদিনীশক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ সাগরে নিয়ে যায়। এই হ্লাদিনী শক্তির দ্বারাই ভগবান কৃষ্ণ ভক্তের ভক্তির পুষ্টি সাধন করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের হৃদয়ে তাঁর স্বরূপ শক্তিহ্লাদিনীর দ্বারা ভক্তের প্রেমকে, ভক্তের ভক্তিকে জাগিয়ে তোলেন। তাকে পুষ্ট করে থাকেন। আমরা জানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি। প্রথমশক্তির নাম স্বরূপশক্তি। দ্বিতীয় শক্তির নাম তটস্থা বা জীবশক্তি এবং তৃতীয় শক্তির নাম বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি।

স্বরূপ শক্তিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমটি সন্ধিনী শক্তি, দ্বিতীয়টি সংবিৎ শক্তি এবং তৃতীয়টি হ্লাদিনী শক্তি।

এই হ্লাদিনী কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির মধ্যে আনন্দপ্রদানকারী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভক্তির পুষ্টি সাধন করে থাকেন। এই হ্লাদিনী শক্তিই আবার শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দের আস্বাদ করায়।

৫৪ এবং ৫৫ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

"সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।

একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ।।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।

চিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করিমানি।।" (৫৪+৫৫)

শাস্ত্র বলে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি সৎ-চিৎ এবং আনন্দ। এই তিন শক্তি নিয়ে তিনি পূর্ণ ভগবান। তিনিই আদি। তিনিই পূর্ণচৈতন্য। তিনিই পূর্ণ আনন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন অদ্বয়শক্তি। তিনি এক। এই এক কৃষ্ণ তিন শক্তিতে বিভক্ত। স্বরূপশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

স্বরূপ শক্তির তিনটি ভাগ সৎ বা সন্ধিনী শক্তি। চিৎ বা সংবিৎ বা জ্ঞান শক্তি এবং আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি। এই যুক্তির সমর্থনে এবার বিষ্ণুপুরাণ থেকে একটি শ্লোককে উদ্ধার করলেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৯নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (১/১২/৬৯)

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।।" (শ্লোক-৯)

এর অর্থ হল জীব মায়ার অধীন। সেই জন্যই সে তিনটি শক্তির – আনন্দদায়িনী সাত্ত্বিকী শক্তি, বিষয়ভোগ এবং নিজেকে নাশ করার জন্য তমসী শক্তি এবং সুখ দুঃখ মেশানো রাজসী শক্তির অধীন। এগুলি মায়ার জন্যই হয়। ভগবান মায়ার অধীন নয়। সেই কারণেই এই তিন শক্তি বহির্ভূত।

৫৬ এবং ৫৭ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"সন্ধিনী সার অংশ – শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।

ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম।।

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।

এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার।।

সন্ধিনী শক্তি সার বা চরম পরিণতি হল শুদ্ধসত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবানের সত্তারক্ষাকারিণী শক্তি সন্ধিনীর চরম অবস্থা।

শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার হল – মা বাবা স্থান গৃহ শয্যা এবং আসন। অর্থাৎ ভগবানের পিতা মাতা রূপে যারা ধরাতে পরিচিত হয়েছেন। বসুদেব দেবকী (এরা জন্মদাতা) নন্দরাজ-যশোদা (নন্দের ঘরে কৃষ্ণ পালিত)। স্থান অর্থাৎ গোলক। গৃহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থান। শয্যা এবং আসন। এই সমস্ত কিছুই কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বের পরিণতি। এরপরেই ভাগবত থেকে একটি শ্লোককে উদ্ধার করলেন চৈতন্যচরিতামৃতকার।

১০ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

তথা হি (ভাঃ ৪/৩/২৩)-

"সত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে।" (শ্লোক-১০)

এর অর্থ হল আবরণমুক্ত পরমপুরুষ প্রকাশিত হয়ে থাকেন এক বিশুদ্ধ সত্ত্বে। বিশুদ্ধসত্ত্ব অভিহিত হন বাসুদেব শব্দে। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে ভগবান বাসুদেব আমাদের দ্বারা পূজিত হন। আমার দ্বারা সেবিত হন। এই সেবা পাবার কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গোচর নন।

৫৮ এবং ৫৯ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন –

"কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান সংবিতের সার।

ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার।।

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।

ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব। (৫৯+৫৮)

সংবিতের সার অর্থে বলা হল শ্রেষ্ঠ বা চরম উৎকর্ষ। কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান অর্থে বলা হল শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান সেই উপলব্ধির কথা। ব্রহ্মজ্ঞান এই সমস্ত কিছু ভগবানের বা ভগবত্তাজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

হ্লাদিনীর সার বলতে বোঝানো হল হ্লাদিনীই প্রেমের চরম পরিণতি। এই পরিণতির সার হল প্রেম। অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতি। প্রেমের সার বা চরম পরিনতি হল ভাব। প্রেমসার ভাবের পরম কাষ্ঠা হল মাহাভাব।

অর্থাৎ এখানে বলতে চাওয়া হল হ্লাদিনীর সার প্রেম। প্রেমের সার হল ভাব। ভাবের সার হল মহাভাব। মহাভাবের অধিরূঢ় স্তর হলেন শ্রীমতী রাধা।

৬০ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"মহাভাবস্বরূপা - শ্রীরাধাঠাকুরাণী।

সর্বগুনখানি কৃষ্ণকান্তাশিরোমনি।" (৬০)

অর্থাৎ মহাভাবের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপিণী হচ্ছেন শ্রীমতী রাধা। তিনি সর্বগুণখানি, অর্থাৎ সর্বগুণের আকর। কৃষ্ণকান্ত শিরোমনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী বা সাধিকাদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা।

১১নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর দুটি শ্লোক চয়ন করেছেন চৈতন্যচরিতামৃতকার।

প্রথম শ্লোকটি এইরকম–

তথা হি শ্রীমদুজ্জনলনীলমনৌ শ্রীরাধাপ্রকরণে

"তয়োরপুঃভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বতাধিকা।

মহাভাবস্বয়ংপেয়ং গুনৈরতিবরীয়সী।" (শ্লোক-১১)

এর অর্থ হল শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলী এই দুইয়ের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠা।

রাধাই হচ্ছেন মহাভাব স্বরূপিণী এবং গুণে অতিব বরীয়সী।

৬১ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর কবি বললেন –

"কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।

কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়।"

তিনি বলতে চাইলেন যাঁর হৃদয়, যাঁর ইন্দ্রিয়, যাঁর কায়া কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা গঠিত, অথবা যাঁর মন, ইন্দ্রিয় এবং দেহ সমস্তর মধ্যেই শুধু কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ, কৃষ্ণ প্রেমে যিনি একান্ত। অর্থাৎ শ্রীরাধার দেহ-মন হৃদয় এই সমস্ত কিছুই কৃষ্ণময়। এর সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। রাধা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ লীলার সহায়ক তিনি।

১২ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপরের ব্রহ্মসংহিতায়াম থেকে চয়ন করা শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করা হল এইভাবে –

"আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি

স্তাভির্য এর নিজরূপতয়া কলাভিঃ।

গোলক এর নিবসত্যখিলাত্মভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" (১২)

অর্থ হল এই নিখিল পৃথিবীর প্রিয়জন যে গোবিন্দ পরম প্রেমময় শৃঙ্গার রসের সাহায্যে গঠিতা স্বরূপশক্তিরূপে গোপিনীদের সঙ্গে গোলকেই বাস করছেন। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করছি।

৬২-৬৭নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এর পরের অংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন –

"কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ।।
কৃষ্ণকান্তাগন দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগন, পুরে মহিষীগন আর।।
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগনের বিস্তার।।
অবতোরী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হইতে তিনি গণের বিস্তার।।
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ বৈভব-প্রকাশ স্বরূপ।" (৬২-৬৭)

সরল ভাবে অর্থ করলে দাঁড়ায় কৃষ্ণকে যেভাবে রস আস্বাদন করান মহাভাব স্বরূপিণী তার ব্যাপারটি এইরকম– তিনটি শ্রেণীর কৃষ্ণকান্তাগণ আছেন। তার মধ্যে একটি শ্রেণীর নাম লক্ষ্মীগণ। আমাদের যে পরমব্যোম মধ্যে বিরাজিত ভগবান তার কান্তাগণ হলেন লক্ষ্মী। আর একটি শ্রেণী মথুরাদ্বারকার মহিষীগণ। রুক্মিণী মহিষীগণেরা। আর একটি শ্রেণী হলেন ব্রজাঙ্গনারা। এরা হলেন কান্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিন শ্রেণীর কান্তাগণের ভেতরে ব্রজাঙ্গনারাইসর্বশ্রেষ্ঠ।

এই ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা। রাধা থেকেই অন্যদের উৎপত্তি। অন্যদের বিস্তার। যেভাবে মূলস্বরূপ অবতারী থেকে অংশস্বরূপঅবতারেরা আবির্ভূত হন ঠিক সেভাবেই মূল কান্তাশক্তিশ্রীরাধা থেকে প্রকার কান্তার আবির্ভাব ঘটে।

এখানে ‘বৈভববিলাসাংশরূপ’ শব্দটিকে নিয়ে একটু ভাবা যেতে পারে। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় – বৈভব + বিলাস + অশংরূপ। প্রভাব বলতে বোঝায় যারা মূল শক্তির মত কিন্তু শক্তিতে মূলস্বরূপ অপেক্ষাতে হীন বা ছোট। বৈভব প্রভাবের চেয়ে শক্তির প্রকাশ অনেক বেশী।

বিলাস শব্দটিকে আমরা এইভাবে ভাবতে পারি বিশেষ লীলার জন্য স্বয়ংরূপ যে সময় বিভিন্ন আকারে ভাগ হয়ে প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্বই বিলাস তত্ত্ব।

অংশ হল স্বয়ংরূপের চেয়ে শক্তিতে যা হীন।

এবার বৈভববিলাসাংশরূপশব্দটিকে নিয়ে যদি ভাবি তবে বলা যায় – বিশেষ লীলার জন্য যে স্বরূপ স্বয়ংরূপ থেকে অন্যরূপ বলে গণ্য তাকেই বলা যেতে পারে বৈভববিলাসাংশরূপ। যেমন লক্ষ্মীগণচতুর্ভুজা। শ্রীরাধা কিন্তু দ্বিভুজা। আকারে তা ভিন্ন। শ্রীরাধার চেয়ে লক্ষ্মীগণের শক্তির বিকাশ কম। এই কারণেই লক্ষ্মীগণশ্রীরাধারবৈভববিসাংস্বরূপ বলে পরিচিত।

প্রকাশ শব্দটির অর্থে বলা যেতে পারে মূলরূপের মত যে আবির্ভাব। এই আবির্ভাবই হল প্রকাশ।

অর্থাৎ তাহলে ‘বৈভব প্রকাশস্বরূপ’ কথাটির অর্থ করলে দাঁড়াচ্ছে যে স্বরূপে মূলরূপের মত আবির্ভাব অথচ যাঁর শক্তি মূলরূপ থেকে কম তাই হচ্ছে বৈভব প্রকাশ স্বরূপ।

রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা সবাই তো দ্বিভুজা। এদের দুটি পক্ষতেইরূপায়িত দিকে কোন অমিল নেই। এক। কিন্তু এও সঠিক কথা শ্রীরাধা থেকে মহিষীগণের শক্তি কম। এই কারণেই মহিষীগণকে বলা হয়েছে বৈভব প্রকাশ স্বরূপ।

৬৮-৭১নং পয়ারের ব্যাখ্যা

"আকার প্রকার ভেদে সর্বদেবীগণ।

কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ।।

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।

লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।

কৃষ্ণকে করায় রসাদিক লীলাস্বাদে।।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা –গোবিন্দমোহিনী।

গোবিন্দ – সর্বস্ব –সর্বকান্তা শিরোমনি।।"

আকৃতি এবং প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে ব্রজনায়িকাদের প্রকার ভেদ লক্ষণীয়।

কায়ব্যূহ রূপ বলতে বোঝানো হল স্বদেহে এবং কাব্যূহে বা প্রকাশিত দেহে কোন ভেদাভেদ নেই। ভেদ যেমন থাকেনা। ঠিক তেমন শ্রীরাধা এবং তাঁর প্রকাশিত ব্রজনায়িকাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই।

আসলে আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈচিত্র থেকে থাকলেও ব্রজগোপিনীরা বাস্তবিক পক্ষে শ্রীরাধারই আবির্ভাব। তারই দেহ ভিন্ন আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে প্রকট। কায়ব্যূহরূপটির কারণ হল রস পরিপুষ্টির জন্য।

শ্রীমতী রাধা নিজে সর্ববরীয়সী। তবু তিনি ব্রজগোপীদের রূপে প্রকটিত হলেন কোন কারণে? কারণটির ব্যাখ্যাই এখানে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বহু নায়িকার সহায়তা ছাড়া শৃঙ্গার বা মধুর বা রাসলীলায় কোন বৈচিত্র আসে না। রাসলীলার পুষ্টি সাধিত হয় না। এই কারণেই শ্রীরাধা কৃষ্ণলীলাকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই ব্রজগোপীরূপে নানাভাগে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এই যে রাধা বহুরূপে আবির্ভূত হলেন এই জন্যই সৃষ্টি হল নানা রস। নানা ভাব। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি দ্বারা শ্রীরাধাব্রজগোপীর মাধ্যমে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণকে রসাদি লীলার আস্বাদন করিয়েছেন। বা আস্বাদন করিয়ে থাকেন।

রাধাকে বলা হল গোবিন্দনন্দিনী অর্থাৎ গোবিন্দের আনন্দদায়িনী। বলা হল গোবিন্দ মোহিনী অর্থাৎ সর্ব প্রকারের গোবিন্দকে তিনি মোহিত করতে পারেন বা মোহিতকরেণ। এই কারণেই গোবিন্দ মোহিনী।

১৩নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথা হি বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্র থেকে একটি শ্লোককে চয়ন করলেন –

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা।

সর্বলক্ষীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা।" (শ্লোক-১৩)

এর অর্থ হল শ্রীরাধিকা দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষীময়ী, সর্বকান্তি, সম্মোহিনী এবং পরা শক্তির প্রকাশ।

৭২ এবং ৭৩ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এবার কবি 'অস্যার্থ' যা এই যে শ্লোকটি উল্লেখ করলেন এর অর্থে লিখছেন –

"দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।

কিম্বা কৃষ্ণ-পূজা-ক্রিড়ার বসতি নগরী।।

কৃষ্ণময়ী – কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।

যাঁহা যাঁহা নেত্রপড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।। (৭২+৭৩)

অর্থাৎ দেবী শব্দটির অর্থ দীপ্তিমতী। দ্যুতি মানে দিব্ ধাতুকে গ্রহণ করে দেবী পদটি নিষ্পন্ন হল। শ্রীমতী রাধা নিজের রূপের উজ্জ্বল্যেইদীপ্তিমতী। আবার এও বলা যায় কৃষ্ণের পূজারবসতিনগরী। আবার একথাও সহজ ভাবে বলা যায় শ্রীরাধিকা হচ্ছেন কৃষ্ণপূজার বিবিধ উপকরণে সজ্জিত নগরী। আপনি এবং সখীরা সহ শ্রীরাধা নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করে ও কৃষ্ণের সাথে বেশী করে তাঁর আনন্দবিধান করেন। এই জন্য রাধাকে বলা হয়ে থাকে গোবিন্দনন্দিনী।

'ময়ট্' শব্দের অর্থ প্রযুক্ত হয় প্রাচুর্যার্থে। কৃষ্ণময়ী শব্দটিকে কৃষ+ ময়ট্ এইভাবে ভাবা যায়। কৃষ্ণময়ী শব্দটিকে এই দিক থেকে ভাবলে ভাবা যায় রাধার সর্বত্রই কৃষ্ণময়। কৃষ্ণই রাধার অন্তরে। কৃষ্ণই রাধার বাইরে। সেই জন্যই যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই কৃষ্ণের ভাব উদ্দীপিত হয়।

৭৫ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।

অতএব 'রাধিকা' নাম পুরানে বাখানে।" (৭৫)

শ্রীরাধার সাধনা বা আরাধনার একমাত্র বাসনা হল শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্খাকে পূর্ণ করা। এই আরাধনা করেন বলেই পুরাণে তাঁকে বলা হয়েছে রাধা।

এখানে পূজার্থকরাধ্ ধাতু থেকে রাধিকা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে বলা যায়। শ্রীরাধিকার পূজা বা আরাধনা হল শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্খাকে পূর্ণ করা। এই আকাঙ্খাকে পূর্ণ করেন বলেই তিনি রাধিকা।

১৪ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

রাধারস্বরূপকে ব্যক্ত করতে এরপর ভাগবত থেকে একটি শ্লোককে চয়ন করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

তথা হি (ভাঃ ১০/৩০/২৮)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।। (শ্লোক-১৪)

এর অর্থ হল ভক্তদুঃখহারী ভক্তভীষ্ট দানে সমর্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় করে বা নিশ্চিত ভাবে এই রমণীদের দ্বারা পূজিত হয়েছেন; যেহেতু শ্রীগোবিন্দ প্রীত হয়ে আমাদের পরিত্যাগ পূর্বক সেই রমণীকে গোপনীর স্থানে নিয়ে গিয়েছেন।

৭৬ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"অতএব সর্বপূজ্যা পরম দেবতা।

সর্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণময়ী। পূজার দ্বারা তাঁর কৃপালাভ হলে তবেই কৃষ্ণসেবা সম্ভব হয়। পরমদেবতাশব্দটির অর্থ নির্ণয় করতে হলে দেবতা শব্দটির অর্থ পরিস্ফূট হওয়া উচিত। দেবতা হচ্ছেন যিনি ক্রীড়া বিস্তার করে থাকেন। শ্রীরাধিকা হলেন শ্রীরাধিকারসর্বশ্রেষ্ঠ সহায়িকা। তিনি পরমদেবতা। সর্বপালিকা শব্দের অর্থ সকলের পালককর্তী যিনি। শ্রীকৃষ্ণজগৎপালক। শ্রীরাধা তার স্বরূপশক্তি। শক্তি এবং শক্তিমান এই দুইজন অভিন্ন। রাধা সবার পালনকারিণী। সর্বজগতের মা।

৭৭-৭৯ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

"সর্ব লক্ষ্মীশব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।

সর্বলক্ষ্মীগনের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান।।

কিম্বা 'সর্বলক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়াবিধ ঐশ্বর্য্য।

তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি – সর্ব শক্তিবর্য্য।।

সর্ব সৌন্দর্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।

সর্বলক্ষ্মীগনের শোভা হয় যাহা হৈতে।।” (৭৭-৭৯)

এর আগে ৬৭ সংখ্যক পয়ারে কবি লক্ষ্মীগণকে ভগবানের বৈভববিলাসাংশরূপ বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই কথাই স্মরণ করা হয়েছে এখানে। এবার বলা হল শ্রীরাধা হচ্ছেন ভগবানের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। তিনি সমস্ত শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লক্ষ্মী, মহিষী এবং ব্রজগোপিনীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ। তাঁকে (রাধাকে) বলা হল ‘সর্বকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে’। বলা হল যিনি সব সৌন্দর্য ও শোভার আশ্রয় স্থল, যার কাছের থেকে লক্ষ্মীগণ শোভা এবং সৌন্দর্য লাভ করেন এবং যিনি লক্ষ্মীগণের সৌন্দর্য ও শোভার মূলাধার।

৮০-৮২নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“কিম্বা কান্তি” শব্দ কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।

কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।।

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরন।

সর্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরন।।

জগৎ-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।

অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী।।” (৮০-৮২)

এই অংশটির সহজ অর্থ করতে গেলে কান্তি শব্দটিকে নিয়ে একটু ভাবা দরকার। কম্ ধাতু নিষ্পন্ন কান্তির অর্থ হল কামনা। তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়ালোশ্রীকৃষ্ণের কান্তি হল তাঁর কামনা। কৃষ্ণের সব কামনা থাকে যার মধ্যে তিনি হচ্ছেন সর্বকান্তি। সেই দিক থেকে রাধাই হলেন কৃষ্ণের সর্বকান্তি।

রাধাই শ্রীকৃষ্ণের সব রকম আকাঙ্খাকে পূর্ণ করেন। এই আকাঙ্খা তো কামনাই। তাই রাধা সর্বকান্তি। রাধা কৃষ্ণের সমস্ত আকাঙ্খাকে পূর্ণ করেন। রাধাকৃষ্ণের আকাঙ্খার আধার। তিনি কৃষ্ণময়। কৃষ্ণসর্বস্ব।

জগৎকে যে মুগ্ধ করেন তিনিই তো জগৎমোহন। কৃষ্ণ আমাদের জগৎমোহন। তার পরা মানে শ্রেষ্ঠা। এই দিক থেকে রাধাই হলেন কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ঠাকুরানী। বা শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম।

৮৩—৮৫ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।

দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান।।

মৃগমদতার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।

অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপে।

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপে।।” (৮৩—৮৫)

এই অংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায়—শ্রীরাধা হলেন পূর্ণ শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। বলা যায় শক্তি এবং শক্তিমান এঁদের যে সম্বন্ধ তা সহজ সম্বন্ধ নয়। বেশ জটিল। কারণ এই সম্বন্ধটি কেবল মাত্র ভেদ-ই প্রকাশ করে তা বলা যায় না। আবার এহেন সম্বন্ধ যে অভেদ তাও বলা কঠিন। উদাহরণ হিসেবে আমরা স্বরূপ, অগ্নি এবং দাহিকা শক্তির সম্বন্ধ এবং কস্তুরী ও তার গন্ধের সম্পর্কটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। অগ্নির দাহিকা শক্তি যে অগ্নি নয় তা অনুভব গম্য ব্যাপার, কারণ অগ্নির নির্দিষ্ট সীমার বাইরেও তার দহিকাশক্তি অনুভূত হয়। সুতরাং দুজনার ভেদ করা সহজ নয়। আবার অগ্নি থেকে দাহিকা শক্তিকে পূর্ণ পৃথক বলেও ভাবা যায় না। যাবে না। দুজনার মধ্য

যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে তা স্বাভাবিক ভাবেই অনুভব করা যায়। আবার কস্তুরী ও তার গন্ধকে একইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। এক্ষেত্রেও ভেদ ও অভেদ সম্পর্ক। এই ভেদাভেদের রহস্যকে পূর্ণ বাহবে বোঝা কঠিন। আবার এই সম্পর্ককে অস্বীকার করাও যাবে না। বুদ্ধির দ্বারা যে বস্তুর রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না তাই নিয়েই গঠিত হয়েছে অচিন্ত্য বস্তু।

আমরা সনাতন গোস্বামীর কাছ থেকে এই প্রসঙ্গে একটি জায়গায় জেনেছি এই পৃথিবীর প্রাণিদের সাথে কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ তা ভেদাভেদের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ টিকে বলা যায় অচিন্ত্য। শ্রীচৈতন্য দেব একসময়ে মায়াবাদ এবং অদ্বৈতবাদকে যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেন। তিনিই দেখিয়েছিলেন অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্পর্ক কি এবং কেন। প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের। এই তত্ত্বে জীব জগতাদির অস্তিত্বকে, বলা যায় প্রকৃত অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছিল। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্পর্ক বৈষ্ণব শ্রুতি এবং স্মৃতিতে আলোচনা আছে।

এই অংশে বলা হল রাধা এবং কৃষ্ণ স্বরূপতঃ দুজনা এক, অভিন্ন। তবু লীলারস আস্বাদন কোন সময় একা একা হয় না। এই রস আস্বাদন করবার জন্য এই একিরূপে দুই হয়ে জন্মেছে। একদেহ দু দেহে জন্মেছে—রাধা এবং কৃষ্ণ হিসেবে।

৮৬—৮৭ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

"প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।

রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।

এই তো পঞ্চম শ্লোকের অর্থ প্রচার।।" (৮৬—৮৭)

এই অংশটিতে বলা হল শ্রীকৃষ্ণ নিজে অবতীর্ণ হয়েচক্সহেন রাধাভাবকান্তি তাঁর দেহে অঙ্গস্বীকার করে। একই দেহে তিনি রাধা ও কৃষ্ণের যুগল দেহ নিয়ে এক হয়ে

এলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এলেন। পঞ্চম শ্লোকটির অর্থ এইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে বা প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৮৮ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ

প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আবাস।" (৮৮)

এবার প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোককে ব্যাখ্যার জন্য কবি ভূমিকা রচনা করবেন বলে স্থির করেছেন। এই ষষ্ঠ শ্লোকটি আমাদের একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সেখানে বলা হয়েছে—

তথাহি শ্রী স্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াম—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা

স্বাদ্যো যেমাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশংবেতি লোভা

এর অর্থ হল শ্রীরাধার প্রেম মহিমা কেমন? না, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদ করেন, সেই মাধুর্যই বা কেমন এবং আমার মাধুর্যের আস্বাদ করে শ্রীরাধা যে সুখলাভ করেন, সেই সুখই বা কেমন—এই সব উপলব্ধি করার লোভে শ্রীরাধা ভাবে পরিপূর্ণহয়ে শ্রী শ্রী ভগবান শচীমায়ের গর্ভরূপে সমুদ্রে জন্ম নিয়েছিল।

চৈতন্য চরিতামৃতের এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকে আঁকবেন বলে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বললেন ষষ্ঠ শ্লোকের অস্ররথ প্রকাশ করতে প্রথমেই এই শ্লোকের আবাস বা ভূমিকে তিনি রচনা করছেন।

৮৯—৯০ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্ত্তন।

এহো বাহ্যহেতু পূর্বেকরিয়াছি সূচন।।

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।

রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ।।” (৮৯—৯০)

মহাপ্রভু এই ধরাধামে এসে যে নাম সংকীর্ত্তন করলেন তা তাঁর গৌণ ক্রিড়ার মধ্যে পড়ে। মূল কারণটি কিন্তু জগতের জন্য নয়, তিনি নিজ অভীষ্ট পূরণের জন্যই এসেছিলেন। রসিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ রস গ্রহণের মধ্যে নিজ আনন্দ পান। রস গ্রহণ তাঁর নিজ কার্য। শ্রীচৈতন্য অবতারে নিজবাসনা পূর্ণ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন।

৯১—৯২ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।

দামোদর স্বরূপ হইতে হইল প্রচার।।

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।

তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ।

এই পয়ারদুটিতে বলা হল চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের স্বরূপকে তাঁর অবতীর্ণ হবার ত্রয়ী ইচ্ছাকে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন।

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে ডাকা হত স্বরূপ গোঁসাই নামে। সংস্কৃত ভাষায় ইনি চৈতন্যের জীবন আশ্রয়ী গ্রন্থ্ প্রণেতা হিসেবে খ্যাত। খ্যাত। তাঁর রচিত গ্রন্থটি ‘স্বরূপ দামোদ্রের কড়চা’ নামের। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে নানা জায়গায় উল্লেখ থাকলেও মূল গ্রন্থটি কিন্তু পাওয়া যায়নি। স্বরূপ দামোদর সম্পর্কে জানা যায় তাঁর গৃহজীবনের নাম

ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। তাঁর বাড়ি ছিল নবদ্বীপ। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের থেকে বয়সের বিচারে কিছুটা বড়ই ছিলেন। মহাপ্রভু যখন প্রয়াত হন তিনি তখন বেঁচেই ছিলেন। যখন মহাপ্রভুর পুরীলীলা চলছে তখন মহাপ্রভুর যে সঙ্গীরা সেই লীলা সঙ্গী ছিলেন স্বরূপ দামোদর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মহাপ্রভুর অন্তলীলাকে সব থেকে ভাল বর্ণনা করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিকটা বা দার্শনিক দিকটিকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এমনকি চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনার সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর অন্তলীলা রচনা করতে গিয়ে স্বরূপ দামোদরের দ্বারা প্রাভাবিত হয়েছিলেন। স্বরূপ দামোদরের গ্রন্থ থেকে উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন।

৯৩—৯৪ পয়ারের ব্যাখ্যা

"রাধিকার ভাব মুক্তি প্রভুর অন্ত্র।

সেভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর।।

শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।

ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ।" (৯০—৯৪)

শ্রীমহাপ্রভু অন্তঃ হৃদয়ে শ্রীরাধার বা রাধাভাবেরমূর্ত্তিপ্রকটিত। রাধার অন্তর ভাবের সঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরভাব একাকার। রাধাভাবে ভাবিত হবার জন্যই মহাপ্রভুর অন্তরে কখনও মিলনের জন্য সুখ, আবার কোন সময় কৃষ্ণ বিরহের জন্য দঃখের উদয় হয়। মহাপ্রভুর শেষলীলায় বা অন্তলীলায় তিনি রাধা যেমন সাধিকার দিব্য মূর্তিতে আবিষ্ট হয়ে উন্মাদের মত আচরণ করতেন তেমনই আচরণ করে চলেছেন। শ্রীরাধার দিব্য উন্মাদের মত্ত অবস্থা হয়েছিল চৈতন্যদেবেরও। তিনি ভ্রমময়চেষ্টা বা ভ্রান্তলোকের মত ব্যবহার করে গেছেন। প্রলাপময়বাদ বা প্রলামময় বাক্য বলে যেতেন।

৯৫—৯৬ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

"রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।

সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে।।

রাত্র্যে বিলাপ করেণ স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।

আবেশে আপন ভাব কহেন উখারি।।

শ্রীকৃষ্ণেরদূতউদ্ধবকে দেখে রাধার যে ভাব এসেছিল তেমনই মহাপ্রভুর মধ্যেও ভ্রমময় ভাব এসেছে। রাত্রিদিন তিনি স্বরূপের কণ্ঠ ধরে নিজেকে উখারি বা উন্মুখ করে কাঁদছেন। ভাবময় হয়ে আছেন।

৯৭—৯৮ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

"যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।

সেই গীতি শ্লোকে সুখ দেন দামোদর।।

এবে কার্য্য নাহি কিছু এসব বিচারে।

আগে ইহা বিবরিব ক্রিয়া বিস্তারে।।" (৯৭--৯৮)

যে সমস্ত গান গাইলে বা যে সমস্ত শ্লোক পাঠ করলে চৈতন্যের হৃদয় শান্ত হয়ে যায় স্বরূপ দামোদর সেই সমস্ত শ্লোক বা গান পাঠ করেছেন, অথবা গাইছেন, মহাপ্রভুকে শোনাচ্ছেন।

এখন এই সমস্ত আলোচনার প্রয়োজন নেই। শেষের দিকে অন্তলীলা বর্ননার সময়ে এইসব বিস্তৃতভাবে বর্ননা করা যেতে পারে।

৯৯—১০২ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

"পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম

কৌমার, পৌগণ্ড আর কৈশোর অতি মর্ম্ম।।

বাৎসল্য আবেগে কৈল কৌমার সফল।

পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল।।

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।

বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস।।

কৈশোর বয়স, কাম, জগৎ সকল।

রসাদি লীলায় তিন করিল সফল।" (৯৯—১০২)

শাস্ত্রমতে নিত্যলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ হলেন চিরকিশোর, তবু প্রকট লীলাতে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে বলে তাঁকে দেহ ধর্ম মানতে হয়েছে। এই দেহ ধর্ম মানতে ভগবানেরও বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোরকে স্বীকার করতে হয়েছে। প্রকট ব্রজলীলাতে সেই কারণেই কৃষ্ণের দেহ নিজধর্ম এবং স্বভাববশতঃ তিন প্রকার ধর্মের ওপর দাঁড়িয়ে কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর। কৈশরের সমস্ত গুণকে তিনিত ধারণ করে সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

সফলতম বাৎসল্য ভাবের আস্বাদ দ্বারা তিনি কৌমারকে সফল করেছেন। সখাতের সঙ্গে সখ্যরস আস্বাদনের মধ্যমে তিনি সফল করেছেন পৌগণ্ড।

"রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।

বাঞা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস।।

কৈশোর বয়স কাম জগৎ সকল।

রসাদি লীলায় তিন করিল সফল।।"

শ্রীরাধা এবং তাঁর অষ্ট সখীদের নিয়ে তিনি রাস প্রভৃতি লীলাকে আস্বাদন করে মধুর রসের নির্য্যাসকে গ্রহণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাস প্রভৃতি লীলায় কৈশোর বয়স, কাম এবং সফল জগৎ--এই তিনটি বস্তুকেই সফল করলেন।

যারা ইহজাগতিক নায়ক-নায়িকা তাঁদের কৈশোর নিত্য নয়। সীমিত। তাই কৈশোর তাঁদের পক্ষে পূর্ণ সফল করা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন চিরকিশোর। ব্রজনারীরা চিরকিশোরী। ফলে রাস প্রভৃতি লীলায় এঁদের মিলনে কৈশোরের পরিপূর্ণ সফলতা আসে।

ইহজাগতিক মানুষ জনেরা একে অন্যের থেকে বিশ্লিষ্ট। এই জন্য কাম এবং সঙ্গম স্পৃহা সফলতা লাভ করতে তারা অক্ষম হন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রসময়। তিনি রসস্বরূপ। যারা ব্রজনারী তাঁরা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। তাই এঁদের মিলনে কোনো বিকার নেই। এই মিলনের সুখ আস্বাদ ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায়। সেই কারণে কৃষ্ণ রাস লীলায় কাম সফলতা লাভ করে।

আবার এও সঠিক এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে যদি রাসলীলার উপকরণরূপে গ্রহণ করা যায় তবে এই জগৎ ও সম্পূর্ণভাবে সার্থকতা লাভ করে। এই রকম ধারাতেই রাস প্রভৃতি লীলায় কৈশোর বয়স, কাম এবং সমস্ত জগত সফলতা পায়।

১৫ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপরেই কবি তুলে আনলেন তিনটি সংস্কৃত শ্লোক। শ্লোকগুলি এইরকম—

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৫/১৩/৫৯)

“সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন মধুসূদন।’

রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিত।।

এর অর্থ হল অমঙ্গলনাশকারী সেই মধুসূদনও কৈশোর বয়সকে সফল করে স্ত্রীসমূহের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন।

১৬ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয়টি এইরকম—

ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ, দক্ষিণ বিভাগে-১ম লহর্য্যাম (১২৪)

“ বাচ্য সূচিতশব্বরীরতিকলা—প্রাগলভ্যয়া রাধিকাং।

ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচযন্নসে সখীনামসৌ।

তদ বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্য পারংগত-

কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন কুঞ্জে বিহাবং হরিঃ।।"

এর অর্থ হল সখীদের সামনে রাত্রিকালীন রতিকলার প্রগলভতা প্রকাশ হয় এমন বাক্যের দ্বারা রাধিকাকে লজ্জায় সঙ্কুচিত নয়না করে, তাঁর স্তন দ্বয়ে বিচিত্র কেলিমাকারী রচনা পাণ্ডিত্যের পরকাষ্ঠাপ্রাপ্ত শ্রীহরি কুঞ্জে বিহার করে কৈশোর বয়সকে সফল করছেন।

১৭ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

তথাহি বিহদ্ধ মাধবে (৭/৫)

“হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যন

মধুরায়াং মধুরাক্ষি! রাধিকা চ!

অভবিষ্য দিয়ং বৃথা বিসৃস্টি

মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র।

এর অর্থ হল—হে মধুরনয়নে বৃন্দে। মথুরায় এই শ্রীহরি এবং শ্রীরাধিকা যদি অবতীর্ণ হয়ে না আসতেন, তাহলে সৃষ্টি এবং সৃষ্টির মধ্যে বিশেষভাবে মদনদেব বৃথা হয়ে যেতেন।

১০৩—১০৮ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“এই মত পূর্বে মত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন।

যদ্যপি করিল রস—নির্যাস চর্ব্বন।।

তথাপি নহিল তিন বঞ্ছিত পূরণ।

তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন।।

তাহার প্রথম বাঞ্াকরিয়েব্যাখন।

কৃষ্ণ খে আমি হই রসের নিধান।।

পূর্নানন্দময় আমি চিন্ময়পূর্নতত্ব।

রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত।।

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।

যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল।।

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য ন্ট।

সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।

এখানে বলা হল শ্রীকৃষ্ণের মনে তিনটি বাঞ্ছা বা ইচ্ছা জেগে উঠলো। প্রথমত—শ্রীমতী রাধার প্রেম মহিমা কেমন? শ্রীমতী রাধা আমার (অর্থাৎ কৃষ্ণের) কাছ থেকে যা

আস্বাদন করেন তার মাধুর্য কেমন। এবং তৃতীয়ত আমার অনুভব বশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ পান তা কেমন?

এই তিন বাসনা পূরণের জন্য আনন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ উতলা হলেন। শ্রীরাধার প্রেম এতই জটিল যে ভগবান বলছেন আমি পূর্ণময় হওয়া সত্ত্বেও এই তিনটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত নই। এতে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে শ্রীরাধার প্রেম এমনই যেতার এবং , মধ্যে এমন শান্তি আছে যে পূর্ণানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাতে অধীর হয়ে উঠেছেন।

পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন নৃত্য শিক্ষাকারী শিষ্য যেমন গুরুর ইঙ্গিতে নেচে ওঠে। তেমনই ভাবে আমি পূর্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হই।

১৮ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপরেই একটি সংস্কৃত শ্লোককে চয়ন করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্লোকটি এইরকম—

"কস্মাৎ বৃন্দে প্রিয়সখী হরে পাদমূলাৎ কুতোহসৌ

কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্য শিক্ষাং গুরুঃ কঃ।

তং স্বন্মূর্ত্তিং প্রতিতরুলতং দিগবিদিক্ষুস্পূরন্তী

শৈলুষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ান্তিস্বপশ্চাৎ।" (শ্লোক ১৮)

এর অর্থ করলে দাঁড়ায় রাধা এবং বৃন্দা একে অপরের সাথে কথা বলছে। সে প্রিয়সখী বৃন্দে। তুমি কোথা থেকে এসেছো? বৃন্দে বলছেন শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্ত থেকে। এবার রাধার প্রশ্ন তিনি কোথায়? বৃন্দে বলছেন তিনি আছেন রাধাকুন্ডের নিকটবর্তী বনে। রাধা বলছেন সেখানে তিনি কী করছেন? বৃন্দে উত্তর দিচ্ছেন—নৃত্যশিক্ষা করছেন সেখানে। এবার রাধা বলছেন কে তাঁর গুরু? বৃন্দে বলছেন প্রত্যেক তরুলতাতে

দিগ্বিদিকে নিপুণা নদীর মতন প্রকাশিত হয়েছে তোমার মূর্তি। তাকেই নিজের সঙ্গে বা পেছনে নাচিয়ে চারিদিকে ভ্রমণ করছেন।

১০৯—১১২ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমস্বাদ।।
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ- ধর্মময়।।
রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি যে ক্ষনে ক্ষনে বাড়য়ে সদাই।।
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরববর্জ্জিত।।"

এই অংশের অর্থ হল বিষ্ময়রূপে কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদ হল নিজপ্রেমাস্বাদ। আর রাধা প্রেমাস্বাদের অর্থ হল আশ্রয় রূপে কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদ। অর্থাৎ ব্যাপারটি দাঁড়ালো এই রকম শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে প্রেমের আস্বাদ লাভ করে যে আনন্দ পান, তাঁর থেকে অনেক বেশি আনন্দ পান, কোটি গুণ বেশি আনন্দ লাভ করেন শ্রীরাধা-আশ্রয়রূপ সেই প্রেমের আস্বাদ করে। আবার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরস্পর বিরোধী ধর্মের আশ্রয়। ভগবানের সঙ্গে রয়েছে বিভুত্ব এবং অপূর্ণত্ব ভগবান যুগপত স্থাবর এবং জঙ্গম।

বিভু শব্দের অর্থ হল ভূমা। পূর্ণ। শ্রীরাধার প্রেম ভুমা বস্তু। সেখানে বৃদ্ধির অবকাশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি সময় তা যেন বেড়ে চলে। বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় ছাড়া একে আর কী বলা যাবে ?

মহাভাবস্বরূপা হলেন শ্রীমতী রাধা। তাই রাধার প্রেমই হল সর্বশ্রেষ্ঠবস্তু। গুরু বস্তুর ধর্ম হল তাতে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু রাধা প্রেমে তা নেই। রাধাপ্রেমগুরুবস্তু হলেও তাতে গৌরবের চিহ্ন মাত্র নেই। এখানে গৌরব নেই। আছে গুরুত্ব।

১১৩ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

"যাহা হইতে শুনির্মল দ্বিতীয়নাহি আর।

তথাপি সর্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার।।" (১১৩)

বাম্য বলতে বোঝায় বামতা বা বক্রতা। এখানে বলা হল রাধাপ্রেম অতি সরল, এতে বামা নয়িকার লক্ষণ আছে। আছে বক্রতা এবং বিরূপতা। সরলতা এবং বক্রতা যুগপৎ। রাধাপ্রেমকে আশ্রয় করে আছে প্রতিটি সময়।

এরপরে কবি একটি সংস্কৃত শ্লোককে চয়ন করে আনলেন এইভাব—

১৯ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাম (২)

"বিভূরপি কলয়ন সদাভিবৃদ্ধিং

গুরুরূপী গৌরবচর্চ্যায়া বিহিনঃ।

মুহুরুপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধো

জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ।"

অর্থাৎ যা সর্বব্যাপক হলেও সর্বদা সম্পূর্ণ বৃদ্ধিকে ধারণশীল, সহজ করে বললে সবসময় যা বৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম, গুরু বস্তু হলেও যা গৌরব ব্যবহার শূন্য, পুনঃ পুনঃ কৌটিল্য বৃদ্ধি পেলেও যা সুনির্মল, মুরারিতে শ্রীরাধার সেই প্রেম জয়যুক্ত হচ্ছে।

১১৪—১২৩ পয়ারের ব্যাখ্যা

"সেই আমার শ্রীরাধিকার 'পরম আশ্রয়'।

সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়।।

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।

আমা হইতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ।।

আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।

যত্নে আস্বাদিতে নারি; কি করি উপায়।।

কভু যদি এই প্রেমারহইয়ে আশ্রয়।

তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।।

এই চিনতিরহে কৃষ্ণ প্রমকৌতুকী।।

হৃদয় বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধকধকী।।

এই এক শুন আর লোভের প্রকার।

স্বমাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার।।

অদ্ভুত, অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।

ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা।।

এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।

আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি।।

যদ্যপি নির্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পন।

তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।

এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে।। ”(১১৪-১২৩)

এই অংশের সহজ অর্থ হল শ্রীরাধিকার প্রেম হল পরম আশ্রয়। রাধা প্রেম শুধু বিষয় আশ্রয় নয় প্রেম বিকাশে স্নেহ থেকে মহাভাব—এই বিরাট যে স্তর তাঁর সব কয়টি বর্তমান এর মধ্যে মহাভাব ছাড়া অন্য সব স্তরের বিষয় এবং আশ্রয় উভয় হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মহাভাব আছে একমাত্র রাধার মধ্যে কৃষ্ণের মধ্যে নেই।

ভগবান বলছেন তিনি মনে করেন বিষয়রূপে সুখ অনুভূত হলেও প্রেম আশ্রয় রাধা সুখে কোটিগুণআনন্দবেশি।

রাধার মধ্যে যে মহাভাব আছে তা কৃষ্ণ মধ্যে নেই। তাছাড়া বিষয় থেকে আশ্রয় সবই কৃষ্ণ মধ্যে আছে। তাই রাধাভাবময়ী রাধার প্রেমকে যত্নে আস্বাদন করেন তিনি।

এহেন রাধা প্রেমের নব নব রূপে প্রকাশিত এবং বিকশিত হয়ে ওঠে। রাধা প্রেম যেন স্বচ্ছ আয়নার মত। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণে তা সম্পূর্ণ সক্ষম। এই আয়নার বৈশিষ্ট্য হল ভগবান কৃষ্ণের সাক্ষাতে প্রতিবিম্ব গ্রহণ ক্ষমতা যেন প্রতি মূহুর্তেই বেড়ে যায়। আবার শ্রীকৃষ্ণবিভূ হওয়ায় তাঁর প্রেমের আর বৃদ্ধির অবকাশ নেই। আথচ রাধা প্রেম আয়নার সামনে যদি স্থাপিত হয় তবে এই কৃষ্ণ প্রেমেও নব নববৈচিত্র্য প্রকাশ পায়। স্বচ্ছ আয়নার ধর্মই হচ্ছে যে তা জ্যোতির্ময় পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণে নিজে আরও বেশি উজ্জ্বল হয় এবং সেই উজ্জ্বলতা শেষ পর্যন্ত জ্যোতির্ময় পদার্থের দিকে প্রতিফলিত হয়। সেই পদার্থও আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শ্রীরাধার প্রেমের সাহচর্যে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের নব নব বৈচিত্র প্রকাশ পায়। আর এই ধারাতেই রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরের প্রেমকে বর্দ্ধিত ও বৈচিত্রময় করে তোলে।

১২৪–১২৭ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“মন্মাধুর্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।

ক্ষনে ক্ষনে রাঢ়ে দোহেকোহো নাহি হারি।।

আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।

স্বস্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়ে।।

দর্পনাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।

আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি।।

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।

রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়।

হোড় করি শব্দটিরঅর্থহল হুড়োহুড়ি করি।

অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণের মাধুর্যের সাহচর্যে শ্রীমতী রাধার প্রেমের স্বচ্ছতা বেড়ে যায়। একইভাবে রাধা প্রেমের উজ্জ্বলতায় প্রতিফলিত কৃষ্ণ মাধুর্য্যও বাড়তে থাকে। তা বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে থাকে। কেউ এখানে পরাজিত হন না।

কৃষ্ণ প্রেম নিত্যই নূতন হয়ে ওঠে। ভক্তেরা নিজ নিজ কৃষ্ণ প্রেমের পরিণাম অনুসারে সেই প্রেমের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। যে ভক্তের যেমন ভাব, তিনি ভগবানের তেমন ভাবকে গ্রহণ করতে পারেন।

দর্পন প্রভৃতিতে অর্থাৎ রাধা প্রেমদর্পনে যদি নিজ প্রেম মাধুরীকে কৃষ্ণ দেখেন তবে সে প্রেম আস্বাদনের লোভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। নিজ মাধুর্য আস্বাদনে লোভ হয়।

কিভাবে যে এই প্রেম মাধুর্য আস্বাদ হতে পারে তা যদি বিচার করে দেখি তবে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার দিকেই মন ধাবিত হয়।

২০ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর একটি সংস্কৃত শ্লোককে কবি চয়ন করলেন এইভাবে—

তথা হি ললিতমাধবে (৮/১২)

"অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী

স্ফূরতি মম গ্রীয়ানেষ মাধুর্য্য পুরঃ।।

আয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য ঘং লুব্ধ চেতাঃ"

সরনুপ্তোত্তং কাময়ে রাধিকেব।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অনুভব করা যায় না এমন চমৎকার সৃষ্টিকারী কি যেন এক অনির্বচনীয় এবং উৎকৃষ্ট আমার মাধুর্যসমূহ প্রকাশিত হচ্ছে। যা দেখে আমিও লুব্ধ হৃদয়ে শ্রীরাধার মত একে আগ্রহ সহকারে উপভোগ করতে লুব্ধ হয়ে পড়ছি।

১২৮—১৩২ পয়ারের ব্যাখ্যা

"কৃষ্ণমাধুর্য এক স্বাভাবিক বল।

কৃষ্ণ আদি নরনারী ক্রয়ে চঞ্চল।।

শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন।

আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন।।

এ মাধুর্য্যমৃত পান সদা যেই করে

তৃষ্ণা শান্তি নহে—তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে।।

অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন।

অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।।

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।

তাহাতে নিমিষকৃষ্ণ , কি দেখিব মুই।।

কৃষ্ণ মাধুর্য এমন যে স্বয়ং ভগবান থেকে নরনারী প্রত্যেককে চঞ্চল করে। কৃষ্ণ তাঁর স্বীয় মাধুর্যকে আচ্ছাদিত করে রাখেন। কৃষ্ণের মাধুর্য, অমৃতকে যে পান করতে পারে তাঁর তৃষ্ণা মেটে না বেড়ে যায়। তা যেন বিধির বিধান। এই প্রেমামৃত পান যেন অগ্নি দহনের সদৃশ।

নিধাতায়অনৈপুণ্যের উদাহরণ রয়েছে। বিধাতা কোটি চোখ যদি দান করতে ন হয়েতো কৃষ্ণের মহামাধুর্যের নূতন নূতনবৈচিত্র্য আস্বাদ করে কিছু তৃপ্তিলাভ হত। বিধাতা কোটি চোখ না দিয়ে মাত্র দুটি চোখ দিলেন। সে দুটি চোখকে নিমেষশূন্য করলেন না। এরি জন্য সীমিত এবং বাধাপ্রাপ্ত দৃষ্টি শক্তি আমাকে এই মহা মাধুর্য দেখতে দিল না। এই সীমিত ও বাধাযুক্ত চোখ নিয়ে আমি কিভাবে কৃষ্ণ রূপ দেখতে পারবো ?

২১ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করলেন চৈতন্য চরিতামৃতকার।

তথা হি (ভাঃ ১০/৩১/১৫)

"আটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং

ক্রুটির্যুগাযতে ত্বামপশ্যতাম।

কুটিল-কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে

জড় উদীক্ষত্যং পক্ষ্মবৃন্দদৃশ্যম।।"

এর অর্থ হল তুমি যখন সকালে বনের দিকে যাও, যখন তোমাকে কেউ দেখতে পায় না তাঁদের কাছে ক্ষণকালও গণ্য হতে থাকে একযুগ হিসাবে। তোমার কোচকানোকেশশোভিত শ্রীমুখ যারা চোখ তুলে দেখে, তাঁদের চোখের পাতা সৃষ্টি করেছেন যে বিধাতা তিনি হয়েতো বাস্তব পক্ষে বুদ্ধিহীন সত্তা অর্থাৎ জড় বুদ্ধি সম্পন্ন।

২২ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

তত্রৈব (১০/৮২/৩৯)

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণ মুপালভ্য চিরাদভীষ্টং

যৎপেক্ষনে দৃশিষূ পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।

দৃগভির্হৃদিকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা

স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম।”

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বিঘ্ন ঘটায় বলে যারা চোখের পাতা সৃষ্টিকারী বিধাতাকে দোষ দেন, সেই গোপীনীরাই বঞ্চিত কৃষ্ণকে বহুকাল পরে কাছে পেয়ে দৃষ্টি পথে প্রবেশ করে এবং দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে নিত্যযুক্ত যোগিনীগণেরও দুষ্প্রাপ্য তন্ময়তা লাভ করেছে।

২৩ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

তথা হি (ভাঃ ১০/২১/৭)

অক্ষ্যনবতাং ফলমিদং ন পরং বিদ্যমঃ

সখ্য পাশূননুবিবেশয়তোর্বয় সৈঃ।

বক্তং ব্রজেশাসুতযোরনুবেনুজুষ্টং

বৈবা নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষম।”

অর্থ হল সে সখীরা। সখাদের সঙ্গে গবাদি পশুদের পেছনে পেছনে বৃন্দাবনে প্রবেশকারী রাজেন্দ্র নন্দন দুজনার বাঁশী বাজানোয় রত এবং যারা অনুরক্ত তাঁদের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী শ্রীমুখের শোভা নিঃশেষে যারা পান করতে পেরেছেন। সেই চোখের অধিকারীদের এই দৃশ্য দেখাই হল চোখের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

২৪ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এই একইভাবের কথা আরও একটি শ্লোক চয়ন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেই শ্লোকটি এইরকম—

“গোপ্যস্তপঃ কিমচরম যদমুষ্যরূপং

লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধনস্য সিদ্ধম

দৃগভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিবনং দুরাপ

মেকান্তধাম যশতঃ প্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য।।”

অর্থ করলে দাঁড়ায় গোপীরা কী রূপ তপস্যাই না করেছিলেন যে তাঁদের চোখে তাঁরা কৃষ্ণের লাবন্যসার, অসমোর্দ্ধ, স্বাভাবিক, মাঝে মাঝেই নূতন নূতন রূপধারী, যশ শ্রী এবং ঐশ্বর্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল দুষ্প্রাপ্য রূপ সুধা পান করছেন।

এর পরেই কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কথাগুলিকে বলতে চাইলেন তা এইরকম—

১৩৪—১৩৬ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

“অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব তার বল।

যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল।।

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ।

সম্যক আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ।।

এই তো দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।

তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ।।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যও অচিন্ত্যনীয়। এই মাধুর্যের শক্তিও অচিন্ত্যনীয়। এই মাধুর্যের শক্তিতে যদি সোনা যায় তবে তাকে আস্বাদন করার জন্য মন চঞ্চল না হয়ে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য তা অন্যকে চঞ্চল করে তোলে, এমনকি ভগবান কৃষ্ণকেও নিজ মাধুর্য আস্বাদনের প্রতি উন্মুখ করে তোলে।

আবার এও সত্য যে বিষয়ীরূপী এই প্রেমের পূর্ণ আস্বাদন সম্ভব নয় যেনেশ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণা মেটে না। ফলে বাড়তে থাকে অসন্তোষ এবং মনের দুঃখ। এই অসন্তোষকে দূরীভূত করার জন্যই শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সুবলিত চৈতন্য রূপ ধারণ করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় হেতু বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয় হেতু বলতে চৈতন্য অবতারের তৃতীয় কারণটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই কারণটি ছিল শ্রীরাধাকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করে কেমন সুখ লাভ করতেন তাঁকে জানার ইচ্ছা।

১৩৭—১৩৯ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

“অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।

স্বরূপ গোসাঞিং মাত্র জানেন একান্ত।।

যেবা কেহ অন্য জানে সেহো তাহা হৈতে।

চৈতন্য গোসাঞিঁর তেহো অত্যন্ত মর্ম যাতে।।

গোপীগনের প্রেম 'আধিরূঢ়ভাব' নাম।

বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম।।

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, যিনি শ্রীচৈতন্যের একান্ত সহচর ছিলেন নীলাচলেও, যিনি চৈতন্যের জীবনকে দর্শনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে গ্রন্থ লিখেছিলেন্তিনি এই মতো চৈতন্য তত্বকে ব্যক্ত করেছেন।

প্রেমের চরম সীমা হল ভাব। ভাবের পরকাষ্ঠা হল মহাভাব। মহাভাবকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। রূঢ় ভাব এবং অধিরূঢ় ভাব। অধিরূঢ়ভাব হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাভাব। গোপীদের প্রেম এই অধিরূঢ় ভাবের অধীন। আর প্রকৃত যে প্রেম তাঁর মধ্যে কামের লেশমাত্র থাকে না।

২৫ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এই যুক্তির সমর্থনে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চয়ন করলেন একটি শ্লোক। শ্লোকটি এই রকম

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্বাবিভাগে (২/১৪৩)

প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম।

ইত্যুদ্ধবাদযোহপ্যেতং বাঞ্ছতি ভগবৎ প্রিয়া।"

এর অর্থ হল গোপরমণীদের প্রেমই কাম বলে খ্যাতি লাভ করেছে। একই কারণে উদব্বাদি ভক্তদের মধ্যেও প্রেমলাভের জন্য ইচ্ছা জেগে উঠেছে।

১৪০ থেকে ১৪৮ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে ‘প্রেম’ নাম।।

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় তা প্রবল।

লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।

লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম।।

দুস্তজ্য আর্য্যাপথ নিজ পরিজন।

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্তসন।।

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন।।

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।

স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ।।

অতএব কাম, প্রেমে বহুত অন্তর।

কাম অন্ধ তম, প্রেম নির্মল ভাস্কর।।

অতয়েব গোপীগনে নাহি কামগন্ধ।

কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ।।”

প্রেম এবং কামের মধ্যে প্রভেদ আলোচনা করতে গিয়ে লোহা এবং সোনার পার্থক্য টানা হল তা শ্রেণীগত প্রভেদ। মাত্রাগত নয়। কাম এবং প্রেমের তফাৎও তাই শ্রেণীগত। কাম বহির্মুখী। তা মায়াশক্তিকে বাড়ায়। প্রেম হল অন্তর্মুখী। তা স্বরূপ শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

আত্মইন্দ্রিয়কে তুষ্ট করার জন্য একজন যখন অন্যজনের কাছে যায় তা আর প্রেম থাকে না। তা হয়ে যায় কাম। ভগবৎ প্রীতিই বা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিই প্রেমের সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

কেবলমাত্র নিজের ইন্দ্রিয়কে যে তৃপ্তি দেয় তা কাম। আর প্রেমের মূল উদ্দেশ্য হল 'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য'। অর্থাৎ কৃষ্ণসুখই যায় উদ্দেশ্য। আমরা সহজে ত্যাগ করতে পারি না (দুস্ত্যজ) ঋষি বা শাস্ত্র অনুমোদিত পথ আমাদের আত্মীয় পরিজন। এই সব কিছু যিনি ত্যাগ করতে পারেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃত ভজনে সক্ষম হন।
যেমন ভাবে সুন্দর করে ধোয়া বস্ত্রে শুধুই থাকে শুভ্রতা তেমন ভাবে গোপিনীপ্রেমের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি ছাড়া, কৃষ্ণ প্রীতি ছাড়া নিজেকে তৃপ্ত করার কোন আকাঙ্খাই থাকে না।

তাই বোঝাই যায় গোপীদের এই প্রেমের সঙ্গে সাধারণের কামের পার্থক্য কত স্পষ্ট। কাম নিজ সুখ তাগিদে অন্ধ। প্রেম প্রতিটি সময়েই নির্মল এবং ভাস্কর। গোপীদের প্রেমে কামগন্ধ নেই। কৃষ্ণ সুখের জন্য সে প্রেম তন্ময়। এরপর চয়ন করলেন একটি সংস্কৃত শ্লোক। শ্লোকটি এই রকম—

যথা হি (ভাঃ ১০/৩১/১৯)

"যত্তে সুজাতচরনাম্বুরূহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবীমটসি তদ ব্যথতে ন কিং স্বিং
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।"

এখানে বলা হল হে প্রিয়, তোমার যে সুকোমল চরণ পদ্ম আমরা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে স্তন সমূহে ধারণ করি সেই চরণের দ্বারা তুমি বনে বনে ঘুরছো। সেই পাদপদ্মে কি তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ড বা ঐ জাতীয় কিছু ব্যথা দেয় না? তোমার কষ্টের কথা ভেবে তোমাতেই যে প্রাণ সপে দিয়েছি সেই বুদ্ধি ঘূর্ণিত হচ্ছে।

১৪৯—১৫০ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

"আত্মসুখ দুঃখ গোপীর নাকি বিচার।

কৃষ্ণ সুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার।।

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।

কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।।" (১৪৯—১৫০)

এখানে বলা হল গোপীনীরা আত্মসুখ নয়, কৃষ্ণসুখের জন্য তন্ময়। কৃষ্ণের জন্য তাদের মনের কাজ, দেহের কর্ম, মানসিক ক্রিয়া সব। সব কিছু। কৃষ্ণের জন্য তাঁরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। কৃষ্ণসুখের জন্যই তারা শুদ্ধ অনুরাগময়ী হয়ে উঠতে পেরেছেন।

২৭ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এবার চয়ন করলেন একটি সংস্কৃত শ্লোক। শ্লোকটি এই রকম—

তথা হি (ভাঃ ১০/৩২/২১)

"এবং মদর্থোজ ঝিত লোকবেদ

স্বানাং হি বো মানুবৃত্তয়েহবলাঃ।

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিত

মাসূয়িতং মাহর্থ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ।।"

এর অর্থ করলে দাঁড়ায় হে অবলাবৃন্দ এইভাবে আমার জন্য লোকাচার, বেদাচার স্বজনাদি পরিত্যাগ করেছে যারা। এমন ভাবে সর্ব আচার যারা পরিত্যাগ করেছে। তোমাদের আমাতে পুনঃউৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যই পরোক্ষভাবে ভজনকারী আমি তিরোহিত হয়েছিলাম। সেইজন্য হে প্রিয়বৃন্দ তোমাদের প্রিয় আমাকে দোষারোপ করা উচিৎ হবে না।

১৫১ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।" (১৫১)

এর অর্থ করলে দাঁড়ায় শ্রীভগবান কৃষ্ণের এমন ইচ্ছা আছে যে যে তার যেভাবে ভজনা করে সেইভাবেই তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন।

২৮ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়ন করলেন চৈতন্য চরিতামৃতকার।

তথা হি শ্রীমদভগবদ গীতায়াম (৪/১২)

" যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ।

এর অর্থ করলে দাড়ায়—যারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাঁদের সেইভাবেই অনুগ্রহ করি। বা তাঁদের বাসনাকে পূর্ণ করি। হে পার্থ। মনুষ্যগণ সর্ব প্রকারে আমারই ভজন মার্গের অনুসরণ করে।

১৫২ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর চৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন—

"সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।

তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ—শ্রীমুখবচনে।।"

গোপীদের ভজনে নিজসুখবাসনা নেই। তাদের ভজনের একমাত্র লক্ষ্য হল শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান। গোপীদের প্রার্থনা যদি তিনি পূর্ণ করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণের সুখ বৃদ্ধি হয়। গোপীদের কিছু প্রাপ্তি হয় না।

২৯ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এবার যে শ্লোকটিকে তুলে আনলেন সেটি হল—

তথাহি (ভাঃ ১০/৩৩/২২)

"না পারযেহং নিরবদ্য সংযুজাং।

স্বসাধুকৃত্যং বিবুধুযাপি বঃ।

যা মাহভজন দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ

সংবৃশ্চ্য তদ্ব: প্রতিযাতু সাধুনা।" (শ্লোক—২৯)

এর অর্থ করলে দাঁড়ায় যারা ছিদ্রশূন্য বা দুশ্চেদ্য ঘরের শেকলকে সম্যকরূপে ভেঙে আমাকে ভজনা করেছো, অনিন্দ্য সংযোগবতী সেই তোমাদের সাধু কাজের প্রত্যুপকার সুদীর্ঘকালেও আমি করতে পারবো না। তোমাদের সাধু কাজের দ্বারাই তা প্রত্যুপকার লাভ করুক।

১৫৩—১৫৫ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এবার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য চরিতামৃততে লিখছেন—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহ প্রীত।
সেহো তো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত।।
এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণ সন্তোষন।
তাঁর ধন—তার ইহা সম্ভোগসাধন।।
এ দেহ—দর্শন—স্পর্শে কৃষ্ণে সমর্পন।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ।।"

এর অর্থ করলে দাড়ায়—নিজেদের সুখের প্রতি গোপীদের দৃষ্টি না থাকলেও গোপীরা নিজ নিজ দেহের মার্জণভূষনাদি করতেন। সেও কৃষ্ণের জন্য।

গোপীদের চিন্তা ছিল এই দেহ শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমর্পন করেছি বলে এই তাঁর সম্পত্তি হয়ে গেছে। সম্ভোগ সাধন আর সম্ভোগ করার উপায়—এই সমস্ত কিছু শ্রীকৃষ্ণেরসুখলাভের উপায়।

এই দেহকে দেখে এবং একে স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষ লাভ করেন, তিনি প্রীত হন। সেই জন্যই গোপীনীরা তাঁদের দেহকে মার্জ্জন এবং ভূষণে সাজায়। নিজের সুখের জন্য এই কাজ তাঁরা করেন না।

৩০ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়ন করেছেন চৈতন্য চরিতামৃতকার এইভাবে—

তথা হি লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ডে (৪০)

আদিপুরাণবচনাম-

"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।

তাভ্যঃ পারং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভজনাম।" (শ্লোক—৩০)

এর বাংলা করলে দাঁড়ায় হে পার্থ! যে সমস্ত গোপী নিজ নিজ দেহকেও আমার মনে মার্জণ ভূষণাদি করেন, তাঁদের চেয়ে নিগূঢ় প্রেমপাত্র আমার কাছে আর কেউ নেই।

এরপর চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখলেন—

"আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।

বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব।।

গোপীগণ করে যাবে কৃষ্ণ দরশন।

সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কৌটিগুণ।।

গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।

তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী-আস্বাদয়।।

তা—সভার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।

তথাপি বাঢ়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ।।

এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।

গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখে পার্য্যবসান।।

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।

সে মাধুর্য্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা।।

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।

এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ।।

গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভাবাঢ়ে যত।

কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত।।

এই মত পরস্পরে পড়ে হুড়াহুড়ি।

পরস্পর বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি।।

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ গুনে।

তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে।।

অতয়েব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে।"

এই হেতু গোপীপ্রেমে—নহি কামদোষে।" (১৫৬—১৬৬)

এই অংশটিতে বলতে চাওয়া হল—

গোপীভাবের স্বভাব সাধারণ বুদ্ধির গোচর নয়। গোপীগণ যখন কৃষ্ণকে দর্শন করে তখন তাঁদের কোনো সুখবাঞ্ছা না থাকা সত্ত্বেও গোপীগন কোটিগুণ সুখ লাভ করে। গোপীগনের সুখ কৃষ্ণ সুখেই পরিণত হয়। তাঁদের সুখের আলাদা কোন পরিণতি নেই। গোপীদের সুখ গোপীরা ভাবতে থাকেন কৃষ্ণ আমাদের দেখে আনন্দ পেয়েছেন, এই কথা ভেবেই তাদের দেহ এবং মুখ অধিকতম আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গোপীদের সৌন্দর্যকে দর্শন করে কৃষ্ণের সুখ এবং সুখজনিত অঙ্গ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আবার শ্রীকৃষ্ণেরপ্রফুল্লতা এবং আনন্দ উজ্জ্বল অঙ্গ কান্তি দেখে গোপীদের দেহ লাবণ্য অধিকতম বৃদ্ধি পায়।

এই মতই পরস্পরের সংসর্গে পরস্পরের সুখ এবং ঔজ্জ্বল্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। এতে কারও আনন্দ বা অঙ্গ সৌন্দর্যের উজ্জলতার হ্রাস ঘটে না।

অথচ গোপীদের সুখ সৃষ্টি হল, কিন্তু গোপীদের মধ্যে তো কোন সুখবাসনা নেই। শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয় বলেই কৃষ্ণ সেবায় স্বধর্মবশতঃই গোপীগণের সুখ হয়। গোপীগণের

সুখ শ্রীকৃষ্ণের সুখ রসের পুষ্টি বিধান করে থাকে। এই গোপীপ্রেমের মধ্যে তাই কোন কামগন্ধ নেই।

৩১ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর একটা শ্লোক চয়ন করলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্লোকটি এইরকম—

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশকাষ্টকে (৮)

উপেত্য পথি সুন্দরীতিভিরাভিরভ্যার্চ্চিতং

স্মিতংঙ্কুরকরম্বিতৈর্নদ পাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ

স্তন—স্তবক সঞ্চরন্নয়নচঞ্চরী কাজলং

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম।।

এর সহজ বাংলা করলে দাঁড়ায় হর্মসমূহে আরোহণ করে এই সমস্ত সুন্দরী শ্রেণীর দ্বারা মৃদুহাসি এবং রোমাংকুরযুক্ত নৃত্যশীল শত শত কটাক্ষভঙ্গীর সাহায্যে যে কৃষ্ণ পথের মাঝখানে পূজা পেয়েছিলেন, যার চক্ষুরূপা দুটি ভ্রমর প্রান্তভাগ গোপীনীদের স্তনরূপে পুষ্প স্তবকে সঞ্চারণশীল বন থেকে ব্রজ ভূমিতে আগমনকারী সেই কেশবকে ভজনা করি।

১৬৭—১৭১ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এবার চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখছেন—

"আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।

যে প্রকারে হয় প্রেম কাম গন্ধ হীন।।

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।

মাধুর্য্যবাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি।।

প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।

তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।।

নিরুপাধি প্রেম যাঁহা—তাঁহা এই রীতি।

প্রীতি—বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।।

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।

সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধ।।

গোপীপ্রেমেরস্বরূপগত লক্ষণ হল তা কাম গন্ধ হীন। গোপীপ্রেম শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের পুষ্টি সাধন করে চলে। আবার অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যও অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে গোপীবৃন্দের প্রেমকে বাড়িয়ে চলে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য দর্শনে গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম বৃদ্ধি পায়।

প্রেমের মূল স্বভাব হল যাকে সেই প্রেমে প্রীতি করা যায়, তাঁর আনন্দ হলেও, যিনি প্রীতি করেন, তাঁরও আনন্দ হয়। এই ক্ষেত্রটিতে স্বসুখবাসনার কোন স্থান একেবারেই নেই। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের যাতে আনন্দ হয় তাই দেখেন। যাতে কৃষ্ণ আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজসুখ দ্বারা যদি কৃষ্ণ সেবাসুখের বাঁধা ঘটে তবে কৃষ্ণ সেবা সুখের বিঘ্নকারী নিজ আনন্দের প্রতিই ভক্তের ক্রোধ হয়।

এবার একটি সংস্কৃত শ্লোককে উদ্ধার করলেন চৈতন্য চরিতামৃতকার। শ্লোকটি এইরকম—

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমাবিভাগে হয় লহর্য্যাম (২৪)

"অঙ্গ স্তম্ভাবস্তারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং

প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।

কংসারাভের্বীজনে যেন সাক্ষ্য

দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যাধায়ি।।"

এর বাংলা করলে দাঁড়ায় যে প্রেমানন্দের দ্বারা কংসারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চামরবীজনে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ অন্তরায় বিহিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের সারথী দারুক অঙ্গসমূহের জয় ভাববর্দ্ধনকারী সেই প্রেমানন্দকে অভিনন্দন জানান নি।

৩৩ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর আরো একটি সংস্কৃত শ্লোককে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চয়ন করলেন। শ্লোকটি এই রকম—

"গোবিন্দ প্রেক্ষনাক্ষেপি বাষ্পপুরাভিবার্ষিনম।

উচ্চৈরনিন্দাদানন্দমরবিন্দবিলচন

এর বাংলা করলে দাড়ায়—পদ্মলোচনাশ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী শ্রীগোবিন্দদর্শনের বিঘ্ন উৎপাদনকারী চোখের জল বর্ষণকারী আনন্দের নিন্দা করা হচ্ছে।

১৭২ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এবার চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখলেন—

"আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।

স্বসুখার্থ সালোকাদি না করে গ্রহণ।। (১৭২)

অর্থাৎ সালেক্য হল সমন লোকে বসবাস করার অধিকার। যিনি যার সাধনা করেন তিনি যদি সিদ্ধিলাভ করেন তাঁর অবস্থানাধামে থাকার অধিকার পেলে তবে তাঁর মুক্তিকে বলে সালোক্য। সার্ষ্টি হল যিনি যে স্বরূপের ভক্ত তিনি যদি ভজনে সিদ্ধিলাভ করেন, যদি সেই পরিকরগণের সমান ঐশ্বর্যলাভ করেন তবে সেই মুক্তিকে বলা হবে সার্ষ্টি। সামিপ্য

হল ভক্ত সিদ্ধিলাভ করে যদি ভগবানের সমীপে বা পাছে অবস্থান করার অধিকার লাভ করেন, সেই মুক্তিকে বলা হয় সামীপ্য।

সারূপ্য হল—ভগবতস্বরূপের সমান রূপ লাভ করা যায় যে মুক্তিতে। তাকে বলা যায় সারূপ্য মুক্তি।

সাযুজ্য হল যে মুক্তিতে জীব উপাস্য স্বরূপের তদাত্মমাত্র প্রাপ্তি লাভ করে সেই মুক্তি। যিনি শ্রীকৃষ্ণেরশুদ্ধভক্ত তিনি স্বসুখের জন্য এইসব মুক্তি গ্রহণ করে না। চায় না। কৃষ্ণ সেবাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় কাজ।

৩৪ থেকে ৩৬ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর চৈতন্য চরিতামৃতকার আবার একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়ন করলেন এই ভাবে—

তথা হি (ভাঃ ৩/২৯/১১-১৩)

মদগুন শ্রুতিত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে

মনোগতিরাবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ।।

লক্ষ্যনং ভক্তিযোগস্য নির্গুনস্য হ্যুদাহতম।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।” (শ্লোক-২৫)

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্যসমীপ্যেকত্বমপুত

দীয়মানং ন গৃহ্নান্তি বিনা মৎসেবনং জনায়ঃ।। (শ্লোক-৩৬)

এর সহজ বাংলা করলে দাঁড়ায় সমুদ্রে গঙ্গাজলের গতির মত, আমার গুণ শ্রবণমাত্রই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত পুরুষোত্তম আমার মধ্যে যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি-তাই-ই নির্গুণ ভক্তিযোগের যে ভক্তি ফলানুসন্ধানশূন্য এবং জ্ঞান কর্মাদিব্যধান রহিতা লক্ষণ রূপে উপদাত।

পরের অংশটি অর্থ আমার ভক্তরা আমার সেবা ছাড়া সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য মুক্তি যদি আমি দিতে চাই তা গ্রহণ করেন না।

৩০ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর আর একটি শ্লোক চয়ন করলেন চৈতন্যচরিতামৃতকার।

তথাহি ৯ (ভাঃ ৯/৪/৬৭)

"মৎসেবয়া প্রতীতিং তে সালোক্যদি চতুষ্টয়ম।

নেছন্তি সেবয়া পূর্নাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্লুতম।।"(শ্লোক—৩৭)

অর্থাৎ আমার সেবার দ্বারা আমার ভক্তেরাপূর্ণমনোরথ চায় না। আমার সেবার প্রভাবে আপনা আপনি যে সালোক্য ইত্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি গ্রহণ কাছে আসে তাকেও গ্রহণ করে না। এগুলিতো কাল বেশে ধংশ হয় ?তবে কেন এগুলি তারা গ্রহণ করবেন ,

১৭৩—১৭৪ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখলেন—

"কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।

নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম।।

কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।

গোপিকা হলেন প্রিয়া শিষ্যা সখীদাসী।।"

অর্থাৎ কামগন্ধ ছায়া যে গোপীপ্রেম তা নির্মল এবং উজ্জ্বল। তা যেন দগ্ধ সোনার মতো খাঁটি। কৃষ্ণলীলাপুষ্টিতে সহায় হন প্রেমশিক্ষার গুরু বান্ধব এবং প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া সমপ্রাণা এবং সেবাপরায়নাজন তারাও কৃষ্ণলীলাপুষ্টিতে সহায়।

৩৮ নং শ্লোক

এরপর আরও একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়ন করা হয়েছে এইভাবে তথাহি গোপীপ্রেমামৃত—

“সহায়া গুরবেঃ শিষ্যাভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়া।

সত্যং বদামি তে পার্থপোপঃ কিং মে ভবন্তি ন।।” (শ্লোক—৩৮)

অর্থাৎ হে পার্থ তোমাকে আমি সত্যই বলছি যে গোপীরা আমার সহায়, গুরু শিষ্যা, উপোভোগ্যা, বন্ধু এবং স্ত্রী তাঁরাও সহায়।

১৭৫ নংপয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখলেন—

“গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।

প্রেমসেবা পরিপাটী ইষ্ট; সমীহিত।।” (১৭৫)

গোপিকারা জানেন কৃষ্ণের মনের ইচ্ছা কী। তারা জানেন কৃষ্ণ প্রেম সেবার কৌশল। তারাই জানেন কৃষ্ণের প্রেমের যে দৈহিক ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণেরআকাঙ্খিত।

৩৯ নং শ্লোক

এরপর একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়নিত হল।

তথা হি লঘুভাগবতেমৃতে উত্তরখণ্ডে (৩৯)

আদিপুরানবচনম—

“মম্মাহাত্ম্যাং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রাং মন্মনোগতম।

জনন্তি গোপিকাঃ পার্থঃ নানো জানন্তি তত্বতঃ।।

অর্থ করলে দাঁড়ায় হে পার্থ তুমি অনুধাবন কর স্বরূপত আমার আকাঙ্ক্ষা আমার মাহাত্ম্য আমার সেবা আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয় এবং আমার মনের ভাবকে একমাত্র জানেন গোপীরা। অন্য কেউ তা জানেন না।

১৭৬ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন—

সেই গোপীগন মধ্যে উত্তমা রাধিকা।

রূপে গুনে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা।।

অর্থাৎ গোপীরা আমার প্রত্যেকে সাধিকা, কিন্তু তাঁর মধ্যে রূপগুন আর সৌভাগ্যে অর্থাৎ কান্তিকে বশীভূত করার শক্তিতে রাধাই হলেন শ্রেষ্ঠতম।

এরপর আরও একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়ন করলেন এইভাবে তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে (৪৫) পদ্মপুরাণ বচনম—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃকুণ্ডং প্রিয়ংতথা।

সর্ব্বগোপীষু সৈটিকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।" (শ্লোক—৪০)

এর অর্থ হল শ্রীমতী রাধা ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়া। ঠিক তেমনি ভাবেই কুণ্ডওতো বিষ্ণুর প্রিয়াই। কিন্তু সমস্ত গোপীদের মধ্যে শুধুমাত্র এই রাধাই হলেন বিষ্ণুর কাছে প্রিয়তমা।

৪১ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর আরো একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়ন করা হল এইভাবে তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে (৪৬) আদিপুরাণ বচনম।

"ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।

তত্রাপি গোপিকা পার্থ যত্র রাধাভধা মম।।" (শ্লোক-৪১)

এর অর্থ হল শুণ পার্থ, পৃথিবী ত্রিলোকমধ্যে সবচেয়ে ধন্য স্থান। সেখানে আছে বৃন্দাবনপুরী। সেই বৃন্দাবন পুরীর মধ্যে গোপিকাগন ধন্য। যাদের মধ্যে রাধা নামের গোপী বাস করেন।

১৭৭—১৭৮ পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখলেন—

"রাধা সহ ক্রীড়া রসবৃদ্ধির কারণ।

আর সব গোপীগন রসোপকরণ।।

কৃষ্ণের ব্ললভারাধা কৃষ্ণ প্রানধন।

তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগন।।" (১৭৭—১৭৮)

অর্থাৎ রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যে লীলা, সেই লীলার রসবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে গোপীরা। তাঁরাই রসবৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে কাজ করেন।

রাধা হলেন কৃষ্ণের বল্লভা। রাধাই কৃষনপ্রাণ ধন। শ্রীরাধা ব্যতীত শুধুমাত্র গোপীনীরা সুখহেতু হতে পারেন না।

৪২ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

অর্থাৎ নিধনকারী, কংসারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারভূত বাসনার শৃঙ্খল স্বরূপিণী শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্য স্বব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করেছিলেন।

"সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যঅবতার।

যুগধর্ম নাম-প্রেম কৈল পরাচার।।

সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা, করিল পূরণ।

অবতারের মূল বাঞ্ছা, সেই যে কারণ।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।

রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।

সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।

অনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার।।" (১৭৯-১৮২)

অর্থাৎ এমত রাধার ভাব সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য যুগধর্ম প্রচারের জন্য নাম প্রচারের জন্য জগতে এলেন। তিনি এলেন নিজ তিন বাসনাকে পূর্ণ করার জন্য। প্রথম বাঞ্ছা শ্রীমতী রাধিকার প্রণয় মহিমা কেমন? শ্রীমতী যা আস্বাদন করেন, আমার অর্থাৎ কৃষ্ণের সেই বিচিত্র মাধুর্য কেমন? এবং কৃষ্ণের অনুভব বশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ পান তা কেমন? এই তিন বাঞ্ছাকে পূর্ণ করতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয়ে জন্মালেন। একই দেহে রাধা এবং কৃষ্ণ হয়ে জন্মালেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঁই-ই ব্রজনারীদের ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই অখিলরসামৃত শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই মূর্তিমান শৃঙ্গাররস।

ব্রলীলার বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার রস একসময় আস্বাদন করেছিলেন। নবদ্বীপলীলাতে এসেছেন আশ্রয়রূপে। সেই শৃঙ্গাররসকে আনুষাঙ্গিক ভাবে আস্বাদন করার জন্য।

৪৩ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়ন করলেন।

"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর

শ্রেণীশ্যামল কোমলৈরূপনয়ন্নঙ্গৈরণঙ্গোৎসবম্।

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিত প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ

শৃঙ্গার সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হবিঃ ক্রীড়তি।

অর্থ হল – হে সখী, শ্রীহরি বসন্তকালে মূর্তিমান শৃঙ্গার রসরূপে ক্রীড়া করছেন। কেমনভাবে করছেন? না প্রীতিসম্পাদনের দ্বারা সবাইকে আনন্দ সম্পাদন করিয়ে নীলপদ্মশ্রেণী থেকে আরো অধিকতর সবুজ ও কোমল অঙ্গের দ্বারা আনন্দ উৎসব লাভ করাচ্ছেন। ব্রজনারীরা অসংকোচে তাদের সর্বাঙ্গদ্বারা প্রতিটি অঙ্গে আলিঙ্গিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করাচ্ছেন।

১৮০-১৮৭ পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন –

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি রসের সদন।

অশেষ বিশেষ কৈল রস আস্বাদন।।

সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম।

চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম।।

অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।

গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস।।

আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগন।

ভক্তিভাবে শিরে ধরি সভার চরণ।।

ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস।

মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঁই নিজেই পূর্ণ রস সদন। সর্বপ্রকার রস আস্বাদনে তিনি এসেছেন। তিনি দ্বারে দ্বারে প্রবর্তন করেছেন কলিযুগের নাম মাহাত্ম্য। চৈতন্যদাস অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, গদাধর, দামোদর, মুরারি, যবন হরিদাস এবং অন্যান্য চৈতন্যভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই নাম মাহাত্ম্যকে জানেন। চৈতন্য যেমন সর্বপ্রকার শৃঙ্গার রস আস্বাদনের দ্বারা কৃষ্ণের তিন ইচ্ছাকে পূর্ণের জন্য এসেছেন। ঠিক তেমনি কলিযুগের সম্বল নাম সংকীর্তনকে প্রচারের জন্যও তিনি এসেছিলেন।

কবি বলছেন এইভাবেই তিনি ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস বা ভূমিকা রচনা করলেন। এবার মূল শ্লোকটির অর্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছেন।

৪৪ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এবার একটি সংস্কৃত শ্লোক চয়ন করছেন এইভাবে –

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেমাদ্ভুতমধরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা
ওদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।" (শ্লোক-৪৪)

অর্থ করলে দাঁড়ায় শ্রীরাধার প্রেম মহিমা কেমন, ঐ প্রেমের দ্বারাই শ্রীমতী রাধা আমার যে অপূর্ব মাধুর্যকে আস্বাদন করেন। সেই মাধুর্যও বা কেমন ধারার? এবং আমার মাধুর্যকে আস্বাদন করে শ্রীমতী রাধা যে সুখলাভ করেণ, সেই সুখই বা কেমন? – এইসব উপলব্ধি করার লোভে শ্রীরাধার ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে জন্মেছিলেন।

১৮৮-২০২ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এবার চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখলেন –

“এসব সিদ্ধান্ত গূঢ় করিতে না জুয়ায়।

না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায়।।

অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।

বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়।।

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্যনিত্যানন্দ।

এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ।।

এসব সিদ্ধান্তরস আম্রের পল্লব।

ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ।।

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।

তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দবিশেষ।।

যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।

ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে।।

অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।

নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক চমৎকার।।

কৃষ্ণের বিচার এক বহরে অন্তরে।

পূর্ণানন্দ পূর্ণরস রূপ কহে মোরে।।

আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।

আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন।।

আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ।

সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন।।

আমা হৈতে গুনী বড় জগতে অসম্ভব।

একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব।।

কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।

অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্যনাহি যার।।

মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।।

মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।

রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ।।

যদ্যপি আমার গন্ধে জগতে সুগন্ধ।

মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ।।” (১৮৮-২০২)

এইসব সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চৈতন্য অবতারের কারণ, রাধা তত্ত্ব অত্যন্ত গোপনীয়, গূঢ়। এইসব নিগূঢ় তত্ত্বকে বুঝতে পারবেন একমাত্র রসিকজন। হৃদয়ে যিনি চৈতন্যনিত্যানন্দকে ধারণ করবেন তিনি আনন্দ পাবেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত রস আম্রপল্লবের মত। ভক্তেরা কোকিলের মত সে রস আস্বাদন করতে পারেন। যারা অভক্ত জন তারা উষ্ট্রের মত। তারা এ আম্রপল্লবে রস গ্রহণে সমর্থ নয়। অভক্তরা এইসব সিদ্ধান্ত বুঝতে পারেনা। এইসব সিদ্ধান্ত বিবৃত করতে ভয় পায়। আর যদি তারা বুঝতে না পারে তবে তাও আনন্দের কথা। অভক্তরা বুঝতে না পারলে এর কদর্থও করতে পারবে না। সে মঙ্গল।

যারা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তারা বলে থাকেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। তিনি পূর্ণ রসস্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। তিনি পূর্ণরসময়, রসস্বরূপ। ভগবান কৃষ্ণ বলছেন তিনিই জগতের সব আনন্দের সার কথা।

সেই আনন্দস্বরূপ ভগবান বলছেন যে তিনি অনুভব করছেন যে শ্রীমতী রাধা যেন তাঁর চেয়েও কোটী কোটী গুণ বেশী আনন্দময়। গুণী। কেননা তিনি পূর্ণানন্দ কৃষ্ণকেও আনন্দ দান করে থাকেন। কোটি কাম জিনি যে রূপময় রাধা, তিনি কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য অর্থাৎ সমান বা বেশী নন। কিন্তু 'সাম্য নাহি যার' অর্থাৎ যার রূপের সমান নেই। কৃষ্ণ বলছেন তাঁর বাঁশি ত্রিভুবনকে মুগ্ধ করে কিন্তু রাধার কণ্ঠ মুগ্ধ করে কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের সুগন্ধে জগৎমোহিত।

রাধার অঙ্গ গন্ধে ভগবানের হৃদয় প্রায় উতলা হয়ে যায়

২০৩-২১৫ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখলেন –

"যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।

রাধার অধররস আমা করে বশ।।

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।

রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল।।

এইরূপ জগতের সুখে আমি হেতু।

রাধিকার রূপগুণ আমার জীবতু।।

এইমত অনুভব আমার প্রতীত।

বিচার দেখিয়ে যদি সব বীপরীত।।

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।

আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান।

পরস্পর বেনুগীতে হরয়ে চেতন।

মোর ভ্রমেতমালেরে করে আলিঙ্গন।

‘কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।’

সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে।।

অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।

উড়িয়া পড়িয়ে চাহে প্রেম হ’এগ্রা অন্ধ।।

তাম্বুলচর্ব্বিত যাব করে আস্বাদনে।

আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে।।

আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।

শতমুখে কহি যদিনাহি পায় অন্ত।। ,

লীলা অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী।

তাহা দেখি সুখে আমি আপনাপাসরি।।

দোঁহার যে সমরস-ভরতমুনি মানে।

আমার ব্রজের রস, সেহো নাহি জানে।।

অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।

তাহা হইতে রাধাসুখ শত অধিকাই। ”

এর অর্থ করলে দাঁড়ায় – কৃষ্ণের অধর রসের ভোগ হিসেবে নিবেদিত অন্নপানাদি। তাতে জগৎ সরস হয়। কিন্তু রাধার অধররস কৃষ্ণকে সরস করে। কৃষ্ণ স্পর্শে কোটি চাঁদের শীতলতা আসে। কিন্তু রাধার স্পর্শে ভগবান শীতল হন। জগতের সুখের হেতু হলেন ভগবান। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সুখের হেতু ভগবান। কিন্তু ভগবানের জীবাতু বা

প্রাণধারনের উপায় হলেন রাধা। এইভাবেই ভগবানের অনুভব। এই বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবকে ছাড়িয়ে নিরপেক্ষতায় পৌঁছে।

শ্রীরাধার দর্শনে যেমন কৃষ্ণের নয়ন জুড়ায়, তেমনি কৃষ্ণ দর্শনে রাধা সুখে ভাসেন। বেনু নামক বংশদ্বয়ের যখন পরস্পর ঘর্ষণে যে বাঁশির আওয়াজের মত শব্দ হয়, তাতেই রাধা ভাবেন এ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি। বেনুতলেই সে মূর্ছা যান। কৃষ্ণ ভেবে শ্রীরাধা অমনি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে চেতনা হারান। কৃষ্ণ যেদিকে আছেন তার দিক থেকে যদি বাতাসে কৃষ্ণ গন্ধ ভেসে আসে তবে সেদিকে পাখি হয়ে উড়ে যেতে চান রাধা। কৃষ্ণপ্রেম তাম্বুল চর্বণে যে আস্বাদন তা আনন্দ সমুদ্রে স্নানের মত। কৃষ্ণ সঙ্গমে রাধার যে আনন্দ তা ভগবানও কোটি মুখে বলে শেষ করতে পারেন না। সম্ভোগের শেষে রাধার যে অঙ্গমাধুরী তা দেখে ভগবান আত্মবিস্মৃত হয়ে যান। রসশাস্ত্রের প্রবক্তা ভরতমুনী ও স্বীকার করেছেন ব্রজের গোপীদের সঙ্গে সঙ্গমে ভগবান এবং ভক্তের পরস্পরের সুখ কেমন। রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের সঙ্গমে যে সুখ তা অসীম, অনন্ত।

৪৫ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর একটি সংস্কৃত শ্লোককে চয়ন করলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্লোকটি এইরকম–

তথাহি ললিতমাধবে (৯/৯)

"নির্ধূতামৃতমাধুরী পরীমলঃ কল্যানি বিম্বাধরো

বক্তং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।

অঙ্গং চন্দন-শীতলং তনুরয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক

ত্বামাস্যাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে।।" (শ্লোক ৪৫)

এর অর্থ হল – হে কল্যানি। তোমার পাকা দালিমের তুল্য রক্তাধর অমৃতের মাধুর্য এবং গন্ধের পরাজয়কারী, তোমার বদন পদ্মের মত সুগন্ধযুক্ত। তোমার কণ্ঠস্বর কোকিলের কাকলীকেও খর্ব করে। তোমার দেহ চন্দন থেকেও সুশীতল। তোমার এই দেহ

সৌন্দর্যের সর্বস্বভাগী। হে রাধা, তোমাকে উপভোগ করে আমার এই ইন্দ্রিয়সমূহ বারবার আনন্দিত হয়েছে।

৪৬ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর চয়ন করলেন আরো একটি শ্লোক। শ্লোকটি এইরকম–

শ্রীরূপগোস্বামিপদোজ শ্লোক -

"রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেহতিহৃষ্যত্ত্বচং

বান্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্।।

আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং

দম্ভোদ্গীর্ণ-মহাধৃতিং বহিরপি প্রদ্যদ্বিকারাকুলাম।।" (শ্লোক-৪৬)

এর বাংলা করলে দাঁড়ায় – ভগবান কৃষ্ণের রূপে যাঁর চোখ দুটি লুব্ধ, ভগবানকৃষ্ণের স্পর্শে যার দেহ অত্যন্তহর্ষযুক্ত, ভগবান কৃষ্ণের বাক্যে যিনি উৎকর্ণা, তাঁর গায়ের গন্ধে নাসারন্ধ্র সব সময় প্রফুল্লিত হয়ে থাকে, সেই কৃষ্ণের অধরসুধাকে পান করে যিনি সানুরাগ রসনা, এবং কপটমহাধৈর্যশালিনী হয়েও যিনি বাইরে প্রকট-বিকারের দ্বারা আকুল, সেই রাধাকে আমি স্মরণে আনছি।

২১৬-২২৯ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখলেন—

"তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।

আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ।।

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।

তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।।

নানা যত্নে করি আমি নারি আস্বাদিতে।

সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভে বাঢ়ে চিতে।।

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।

প্রেম-রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার।।

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।

তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে।।

এই তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।

বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন।।

রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।

সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।

রাধাভাবে অঙ্গীকার—ধরি তার বর্ণ।

তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।।

স্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়।

হেনকালে আইল যুগাবতার সময়।।

সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।

তাঁহার হুংকারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ।।

পিতামাতা গুরুগণে আগে অবতারি।

রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি।।

নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ-সিন্ধু।

তাহাতে প্রকট হৈল কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু।।

এই ত করিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান।

স্বরূপ গোসাঞি পাদপদ্ম করি ধ্যান।।

এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।

শ্রীরূপ গোসাঞি শ্লোক প্রমাণ সমর্থ।।"(২১৬—২২৯)

এর অর্থ হল ভগবান কৃষ্ণ রাধার অনির্বাচনীয় রস সমুদ্রে মেতে আছেন। শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করে যে সুখ পায় তা আস্বাদিত হবার জন্য কৃষ্ণ উন্মুখ। রাধার সে সুখ মাধুর্য আস্বাদনের লোভ ক্রমে বেড়ে চলে। সেই রস আস্বাদনের জন্য শ্রীচৈতন্য এই ধরাতে রাধা কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহে এসেছিলেন।

ভগবান রাগানুগা ভক্তির দ্বারা ভক্তকে লীলা আচরণ শেখাবার জন্য এসেছিলেন। চৈতন্য রূপে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত হয়ে আসার তিনটি কারণ ছিল। ভগবান কৃষ্ণ তিনটি বাঞ্ছা পূরণের জন্য এসেছিলেন। (১) শ্রীমতী রাধিকার প্রণয় মহিমা কেমন (২) শ্রীমতী যা আস্বাদন করেন, কৃষ্ণের সেই বিচিত্র মাধুর্য কিরূপ এবং (৩) কৃষ্ণের অনুভব বশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ অনুভব করেন তা কেমন? এই জন্যই রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে তিনসুখকে আস্বাদন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এসেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতারের সময়ে শ্রী অদবৈতাচার্যের মত সাধকেরাও অধর্ম বিনাশের

ভগবান যখন পৃথিবীতে আসেন তখন তিনি একা আসেন না। তাঁর পার্ষদদেরও সঙ্গে নিয়ে আসেন। শ্রীরাধার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করে ভগবান যেমন এলেন, একিভাবে নবদ্বীপের শচীমায়ের গর্ভকে অবস্বন করলেন ধরায় আসার জন্য। এই গর্ভ শুদ্ধ দুধের সমুদ্রবৎ। এই নবদ্বীপেই শচীমায়ের গর্ভে প্রকটিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামক কৃষ্ণ পূর্ন ইন্দু। এইভাবেই ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাকে পূর্ণ করলেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই ব্যাখ্যান পূর্ণ করতে চৈতন্য সহচর সরূপ দামোদর গোস্বামীর

কড়চার কাছে নিজের ঋণ কে তিনি স্বীকার করে নিলেন। এবং বললেন শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোকে এর প্রমাণ আছে।

৪৮ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা

এরপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার নিজে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করলেন এইভাবে—

গ্রন্থকারস্য। "মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণ চৈতন্যতত্বলক্ষণম।

প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষটকৈ নিরূপিতম।।"

এর বাংলা করলে দাঁড়ায় মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ব লক্ষণ এবং চৈতন্য দেবের অবতারের কারণ 'শ্লোকষটকৈ' অর্থাৎ ছটি শ্লোকের দ্বারা প্রমান করা হল।

২৩০ নং পয়ারের ব্যাখ্যা

এরপর আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি রচনা করেছেন কবি এইভাবে—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যআবতার মূল প্রয়োজন কথনং নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

এই অংশটিতেশ্রীরূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ পদে প্রণাম জানালেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। রঘুনাথ দাস ছিলেন বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইনি ষড় গোস্বামীদের মধ্যে একমাত্র অব্রাহ্মণ ছিলেন। রঘুনাথ দাসের লেখা গ্রন্থ গুলি হল—বিলাপ কুসুমাঞ্জলি স্তবমাল, মুক্তা চরিত্র, দাঙ্কেলি চিন্তামণি প্রভৃতি।

রঘুনাথ দাস ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরুচৈতন্যজীবনের বহু তথ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাসের সঙ্গে থেকে জানতে পেরেছিলেন।

১৩.২ বস্তু সংক্ষেপ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থারম্ভে সতেরটি সংস্কৃত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করেছেন। তারমধ্যে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে। শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্কৃত শ্লোক টি হল-

অনরপিতচরীংচিরাৎ করুনয়াবর্তীণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাংস্বভক্তি শ্রিয়ম্।

হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব- সন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়- কন্দরে স্ফুরতু শচীনন্দনঃ।।

চরিতামৃতের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই শ্লোকটিকে শ্রীচৈতন্যাবতারের একই কারণ উল্লিখিত হয়েছে। উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি-সম্পৎ দান করবার উদ্দেশ্যে শ্রী হরি শচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এটাই এই শ্লোকের মর্মকথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ এর বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্কৃত শ্লোক এর বিশদ ব্যাখ্যা। এই দুইটি শ্লোকেও শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলা হয়েছে।তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রী চৈতন্যাবতারের কারণ উল্লেখ করে চতুর্থঅধ্যায়ে আবার তার পুনরুল্লেখের কারন সম্পর্কে শ্রী কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন-

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কইল সার

প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার।।

সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।

আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ।১। ৪। ৪। ৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রী চৈতন্য অবতারের অন্তরঙ্গহেতু নির্নিত হয়েছে উপরের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে এই অন্তরঙ্গহেতুর কথা আছে।

শ্রীচৈতন্যাবতারের হেতু

ভগবানের আবির্ভাব হয় দুই প্রকারে-কখনও তিনি অবতার রূপে অবতীর্ণ হন এবং কখনও বা স্বয়ং রূপে - পূর্ণ ভগবান বা অবতারী রূপে অবতীর্ণ হন।যখন তিনি পূর্ণ ভগবৎস্বরূপে অবতীর্ণ হন- তখন অন্যান্য অবতাররাও ভূভারহরণ প্রভৃতি কাজ সাধনের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে একই দেহে অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ তখন অবতার ও অবতারীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।ফলে দু'টি কাজ সিদ্ধ হয়। অবতারের আবির্ভাব এর ফলে ভূভারহরণ হয় এবং স্বয়ং ভগবান যে উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ দ্বাপরে শ্রী কৃষ্ণ লীলার কথা বলা যেতে পারে । এই আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ যেমন দেহাভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুশক্তি দ্বারাএকদিকে কংসাদি অসুর নিধন করে ভূভারহরণ করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে বৃন্দাবনলীলায়স্বরূপে প্রেমরস আস্বাদন করেছেন এবং রাগ-মার্গ ভক্তি প্রচার করেছেন । অসুর নিধনের দ্বারা ভূভারহরণ- তাঁরআবির্ভাবের বহিরঙ্গ কারণ এবং প্রেমরসাস্বাদ ও রাগ-মার্গভক্তি প্রচার তার আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ। বৃন্দাবনলীলায় পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলেছেন-

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।
আমাকে ঈশ্বর মানে- আপনাকে হীন
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণ পতি
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি
আপনাকে বড় মানে- আমারেসমহীন

সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন।

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার

সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার।

এইসব রসনির্জাস করিব আস্বাদ

এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ।

ব্রজেন নির্মলরাগ শুনি ভক্তগণ

রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম।

একইভাবে শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের ও অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণ আছে। তার মধ্যে অন্তরঙ্গ কারণ হচ্ছে নিজের প্রেমাস্বাদ ও বহিরঙ্গ কারণ হচ্ছে যুগধর্মপালন অর্থাৎ নাম সংকীর্তন প্রচার। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন-

এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।

যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম।।

কোন কারণেযবে হইল অবতারে মন।

যুগধর্মকাল হইল সেকালে মিলন।।

এই হেতু অবতরিলঞাভক্তগণ।

আপনে আস্বাদে, প্রেম নাম সংকীর্তন।।

প্রেমাস্বাদের ব্যাপারেও তিনি মহাভাবস্বরূপিনী রাধার ভাব স্বীকার করে নিজের প্রেমাস্বাদ আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত করেছিলেন। কারণ-

ব্রজবধূগনের এই ভাব নিরবধি।

তাঁর মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি।।

প্রৌঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম।

কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ।।

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।

সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।

১৩.৩ রাধা তত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটিতে শ্রী রাধা তত্ত্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার সম্পর্কটি আলোচনা করেছেন। ব্যক্ত হয়েছে রাধাতত্ত্বের জটিল দার্শনিক স্বরূপ। অতি দুর্বোধ্য তত্ত্বটিকে সহজতম করে প্রকাশ করতে সার্থক হয়েছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার। চৈতন্যচরিতামৃততে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণ স্বরূপ নিয়ে লীলা করেছেন বৃন্দাবনে।তাঁর লীলা সহচর ছিলেন পূর্ণশক্তি স্বরূপা শ্রীমতি রাধা। রাধা পূর্ণশক্তি স্বরূপ এবং কৃষ্ণ হলেন পূর্ণ শক্তিমান। চৈতন্যচরিতামৃত বলল-

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান

দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান।"

শক্তি ও শক্তিমানে কোনো ভেদ নেই। অভেদ ।শাস্ত্র ও এই অভেদ কে মেনে নিয়েছে। শক্তি এবং শক্তিমানের সম্পর্কটি খুব সহজ নয়। উদাহরণ এইভাবে দেওয়া যায় আগুন এবং তার দাহিকা শক্তিকে ধরা যায়। অথবা কস্তুরীর সাথে তার গন্ধ কে যদি ভাবা যায়। আগুনের দাহিকা শক্তি কোনমতেই আগুন। নয় এর কারণ আগুনের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ও তার দাহিকা শক্তিকে অনুভব করা যায়। আবার আগুনের থেকে তার দাহিকা শক্তিকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে কিছু থাকে না। আগুন থেকে তার দাহিকা শক্তি কে বাদ দেওয়া যায় না। দুজনের মধ্যেই আছে একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক।

ঠিক সেই মতই কস্তুরী আর তার গন্ধ কে নিয়ে ভাবলে দেখা যায় কস্তুরির নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গন্ধ ছড়ায়।এই হল ভেদ অভেদের সম্পর্কের জটিল রহস্য। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই রহস্য উন্মোচন সম্ভব নয়। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হল-

"মৃগমদ তার গন্ধ-যৈছেঅবিচ্ছেদ।

অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপে।

লীলারহস্য আস্বাদিতে ধরে দুই রূপে ।।

ভগবানের অচিন্ত্য এবং অনন্ত শক্তি তাকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়-

ভগবানের তিন শক্তি

।--------------------------------- ।-------------------------------------- ।

অন্তরঙ্গা তটস্তা জীব বহিরঙ্গা

স্বরূপ শক্তিশক্তি মায়া শক্তি

চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে "একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ"। পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ হলেন সচ্চিদানন্দঘন। স্বরূপের সঙ্গে বিচিত্র লীলাবিলাস করে তার ঐশ্বর্য ও মাধুযের্র পূর্ণত্ব লক্ষ্য করা যায়।চিচ্ছক্তি গঠিত হয়

(১) সৎ (কর্ম)

(২) চিৎ(জ্ঞান)

(৩) আনন্দ দিয়ে।(ভালবাসা)

এই তিনটি শক্তিই ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি বলা যায়। এই তিন স্বরূপকে অবলম্বন করে ভগবানের স্বরূপ শক্তির তিনটি প্রকারভেদ লক্ষণীয়।

স্বরূপ শক্তির প্রকারভেদ

।------------------------------------- ।----------------------------------- ।

সন্ধিনী সংবৃত নাগিনী

ভগবানের সৎ অংশ তাকে প্রকাশ করে- সন্ধিনী শক্তি। আর চিৎ বা জ্ঞান অংশ প্রকাশিত করে সম্বিৎ শক্তি। আনন্দ অংশকে প্রকাশ করে হ্লাদিনী শক্তি।

এই যে তিন শক্তির মধ্যে সন্ধিনী-র চেয়ে গুণগত দিক থেকে সংবিৎ হল প্রধান।

আবার সংবিতের চরম উৎকর্ষের দ্বারাই হয়ে থাকে আনন্দানুভূতি।সৎ শক্তি ঘনীভূত হয়ে চিৎ, চিৎ শক্তি ঘনীভূত হয়ে আনন্দ। এই আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তিই হল ভগবানের স্বরূপ শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি।

আনন্দশক্তির সারতম অংশটি হল প্রাণের স্পন্দন। একেই বলে হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তিকেই সব শক্তির আবাসস্থল বলা যেতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে-

"হ্লাদিনীরসারপ্রেম প্রেমসারভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব।।
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরানী।
সবগুণখনি কৃষ্ণকান্তশিরোমণি।।"

হ্লাদিনী শক্তির সারহল প্রেম। প্রেমের সার হল ভাব। ভাবের পরম প্রকাশ মহাভাব। শ্রীমতি রাধা হলেন মহাভাবের পূর্ণ প্রকাশ। হ্লাদিনীর ঘনীভূত রূপ।

হ্লাদিনী শক্তি ভগবান কৃষ্ণের সর্বশক্তির সার বলে এর মধ্যে আছে ঐশ্বর্য ভাবের সব গুণই। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের গুণ চরম স্ফূর্তি পায় মাধুর্যে।

শ্রীরাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির চরম বিকাশ।হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ তিনি। রাধা এবং কৃষ্ণ তাই পৃথক নন। রাধা হলেন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। লীলার প্রয়োজনে এক শক্তি দুই হিসেবে প্রকাশিত।

"রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্য বিলাসে রস আস্বাদন করি।।

চৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন, কৃষ্ণ কথন হল-

'নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ'

অর্থাৎ বিষয়রূপ প্রেমের আস্বাদ করে যে আনন্দ শ্রীকৃষ্ণ লাভ করেন,আশ্রয় রূপ সেই প্রেমের আস্বাদ করিয়ে শ্রীরাধা কোটি গুণ বেশি আনন্দ পায়। অর্থাৎ প্রেমের আশ্রয় রাধার প্রেমপূজার কাছে প্রেমের বিষয়ী স্বয়ং কৃষ্ণ কোটি আনন্দ পান।

ফলে বলা যায় শ্রী রাধার প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নেই। গুরুবস্তুর ধর্ম

হচ্ছে তাতে গৌরব বোধের ভাব থাকবে। কিন্তু রাধা প্রেম গুরুবস্তু হলেও তাতে গৌরব চিহ্ন এবং অহংকার নেই। গুরুত্ব আছে অথচ গৌরব নেই।

চৈতন্যচরিতামৃত রাধাতত্ত্ব আলোচনায় আরো বলে-

“সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরমআশ্রয়।

সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়।“

অর্থাৎ কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নয়, প্রেমের বিকাশে স্নেহ থেকে মহাভাব পর্যন্ত যে কয়টি স্তর আছে তাদের মধ্যে মহাভাব ছাড়া অন্য সব স্তরের বিষয় ও আশ্রয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মহাভাব একমাত্র রাধাতেই আছে, কৃষ্ণের নেই।

রাধার প্রেম স্বচ্ছ দর্পনের মত শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম। এই দর্পণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে এর প্রতিবিম্ব গ্রহণ ক্ষমতা যেন প্রতি সময়ইবেড়ে যায়। আবার শ্রীকৃষ্ণ বিভু হওয়ায় তাঁর প্রেমের আর বৃদ্ধির অবকাশ নেই। অথচ রাধাপ্রেম দর্পণের সামনে স্থাপিত হলে তা নব নব বৈচিত্রে প্রকাশিত হয়। স্বচ্ছ দর্পণের ধর্মই হল যে তা জ্যোতির্ময় পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণে নিজে আরও উজ্জ্বল হয়।এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যেরসাহচর্যে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয় আর রাধার প্রেমের সাহচর্যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যেরনব নব বৈচিত্র প্রকাশ পায়। এইভাবেই পরস্পর পরস্পরকে বর্ধিত ও বৈচিত্র্যময় করে।

শ্রীচৈতন্যের অবতার গ্রহণের সঙ্গে ও রাধা তত্ত্ব কে মিশিয়ে দিয়েছেন চৈতন্যচরিতামৃতকার। শ্রীচৈতন্য কে বলা হয়েছে ‘রাধাভাবদ্যুতি’ সুবলিত। বলা হয়েছে অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ এই দুটি কারণের জন্য চৈতন্যদেব ধরাধামে এসেছিলেন। কারণ দুটিরসাথে রাধাতত্ত্বকে একাকার করে দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বলা হয়েছে রাধাকৃষ্ণ যুগ্ম রূপকে এক দেহে ধারণ করে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। কারণ শ্রী হরি তার নিজের আকাঙ্ক্ষা চৈতন্য অবতার এর মাধ্যমে পূর্ণ করতে এসেছিলেন বলে বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্রের বিশ্বাস।(১) শ্রী রাধার প্রেম মহিমা কেমন(২) শ্রীরাধার দ্বারা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুর্য কেমন এবং (৩) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনেশ্রীরাধার

সুখ কেমন। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। চৈতন্য অবতার এ এই আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করতে এসেছিলেন।

১৩.৪ শ্রী কৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্বের সঙ্গে শ্রী গৌরাঙ্গতত্ত্বের সম্বন্ধ

শ্রীহরি কি উদ্দেশ্যে ও কিভাবে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এরপর তা বলতে গিয়ে পূর্বে উল্লেখিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক আলোচনা করেছেন। প্রথমে পঞ্চম শ্লোকে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন তা বলেছেন। পঞ্চম শ্লোকটিহল-

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা

দেকাত্মনাবপিভুবি পুরা দেহভেদংগতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যংপ্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং

রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্।।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের মর্ম পরিচয়ে বলেছেন-

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্যোন্য বিলসে রস আস্বাদন করি।।

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঁই।

রস আস্বাদিতে দোঁহে হইলা এক ঠাঁই।।

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী শ্রী রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন-

রাসিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার।

স্বরূপশক্তি‘হ্লাদিনী’ নাম যাঁহার।।

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের ঘনীভূততম পরিণতি এবং তাঁর হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ সচ্চিদানন্দ। তার সদংশের নাম হচ্ছে সন্ধিনী,চিদংশের নাম হচ্ছে সংবিৎ বা জ্ঞান এবং আনন্দাংশের নাম হচ্ছে হ্লাদিনী।

শ্রীকৃষ্ণের এই হ্লাদিনী শক্তির সার হচ্ছে প্রেম, প্রেমের সার হচ্ছে 'ভাব' এবং ভাবের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে 'মহাভাব'। আর

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।
গোবিন্দনন্দিনী রাধা- গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ সর্বস্ব-সর্বকান্তা শিরোমণি।

জগৎমোহন কৃষ্ণ- তাঁহার মোহিনী
অতএব সমস্তের পরাঠাকুরাণী
রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।

বস্তুত রাধা ও কৃষ্ণ হচ্ছেন একই বস্তু। লীলারসাস্বাদনের জন্য দ্বাপরে বৃন্দাবন লীলায় তারা দুই রূপ ধারণ করেছিলেন। কলিতে নবদ্বীপ লীলায় তারা আবার ঐক্যলাভ করে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্য রূপ ধারণ করে প্রেমভক্তি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদাযএকই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কৈল অবতার।
এইতো পঞ্চম শ্লোকের অর্থ-পরচার।।

শ্রীকৃষ্ণই যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহভেদ স্বীকার করে নিজ হ্লাদিনী শক্তিকে নিজ সত্ত্বা থেকে পৃথক করে বৃন্দাবন লীলায় শ্রীরাধারূপে অবতীর্ণ হয়ে লীলাসুখ উপভোগ করেছিলেন এবং সেই কৃষ্ণই যে নবদ্বীপ লীলায় আবার সেই দেহভেদ বিলুপ্ত করে এবং নিজ দেহেই রাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে আবার একীভূত করে রাধাভাবদ্যুতি সম্বলিত শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং স্বরূপে শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণই- পঞ্চম

শ্লোকে তা বিশদ ভাবে বর্নিত আছে।

কিন্তু কেন এইভাবে শ্রী চৈতন্যাবতার এর প্রয়োজন হল তার নিগূঢ় কারণটি এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হয়নি। এই শ্লোকে শুধু রাধা কৃষ্ণের অভেদতত্ত্ব, লীলারসাস্বাদের জন্য তাদের ভেদ গ্রহণের কথা এবং সেই দুই রূপ এক হয়ে যে শ্রীচৈতন্যাবতার হয়েছেন তা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্লোক এর ব্যাখ্যায় এই কারণটি পরিস্ফুট করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্লোক টি হচ্ছে-

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা স্রিদৃশোবানয়ৈবা

স্বাদ্যোযেনাড়ুতমধুরিমা কি দৃশো বা মদীয়

সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-

ওড্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ

এই শ্লোকে বলা হয়েছে শচী গর্ভে শ্রী হরির জন্ম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য তিনটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা। এই তিনটি বাসনা হচ্ছে (১) শ্রী রাধার প্রেম মহিমা কেমন (২) শ্রীরাধার দ্বারা আস্বাদিত আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মাধুর্য্য কেমন এবং(৩) আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্য্য আস্বাদনে শ্রীরাধার সুখ কেমন।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই তিন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি।

প্রেম দুই প্রকার (১)বিষয় জাতীয় (২)আশ্রয় জাতীয়। বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে সকলের প্রেমের বিষয়ে রূপে বিষয়জাতীয় প্রেমের আস্বাদ-পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃতকার বলেছেন-

পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধবয়োধর্ম

কুমার পৌগন্ড আর কৈশোর অতি মর্ম্ম।।

বাৎসল্য আবেশে কৈলকৌমার সফল।

পৌগণ্ড সফল কইলো লঞা সখাবল।।

রাধিকাদিলঞা কৈল রসাদি বিলাস।

বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিলরসেরনির্য্যাস

কৈশোর বয়স কাম জগৎ সকল

রসাদিলীলায় তিন করিব সফল।।

এইমত পূর্বে কৃষ্ণরসের সদন

যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বণ

তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ

তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন।।

এরপর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি আকাঙ্ক্ষার ব্যাখ্যা করলেন।

১৩.৫ গোপী তত্ত্ব

বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীরাধার যে প্রেম তাকেই বলা হয়েছে গোপীপ্রেম। শ্রী রাধা এই গোপীপ্রেমের পরম ধন। এই গোপীপ্রেমকে যদি বোঝা যায়, বোঝা যায় গোপী প্রেমের তাৎপর্য তাহলেই রাধা প্রেম তত্ত্বকে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। কবিরাজ কৃষ্ণদাস তার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই গোপী প্রেমকে আলোচনা করেছেন অত্যন্ত সহজসত্যের দৃষ্টি থেকে।

প্রকৃতির নিয়ম হল এই প্রতিটি কাজের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার কারণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরস গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি চলেনা। গোপীনীরা শ্রীকৃষ্ণকে, তার মাধুর্যকে, তার প্রেমকে, আস্বাদন করছেন। তার মধ্যে কোন কারন কিন্তু নেই। তার মধ্যে নিজ সুখের জন্য কোন ইচ্ছা নেই।আর এই বাসনা নেই বলেই কৃষ্ণের মাধূর্যকে আস্বাদন করা গেছে বা তাঁরা করতে পেরেছেন। শ্রীরাধার সাধনা তা স্বসুখ বাসনা শূন্য।

ব্রজগোপিনীদের প্রেম অধীর নির্মল। সেখানে কাম গন্ধ নেই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীদের প্রেম আলোচনাতেই এই কাম এবং প্রেমের তফাৎটা বোঝাতে চেয়েছেন কবি। কাম হল বহিরঙ্গের।তা মায়া দ্বারা ঢাকা থাকে। তা আমাদের ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ এর ১৪০ সংখ্যকপয়ারে কৃষ্ণদাস বলতে চেয়েছেন কাম এবং প্রেম এর মধ্যে তফাৎটি হল লোহা এবং সোনার মধ্যে যে তফাৎ তার মতো। তিনি বললেন-“কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।” লক্ষণ দুটি। স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণ। আকৃতি এবং প্রকৃতি এই হল স্বরূপ

লক্ষণ।কায্যদ্বারায়জ্ঞান হল তটস্থ লক্ষণ।লোহা এবং সোনা এদের প্রভেদ যেমন শ্রেণীগত। মাত্রাগত নয়। কাম এবং প্রেম এর পার্থক্যও শ্রেণীগত। কাম মূলতঃ বহির্মুখি।তা মায়াশক্তির বৃত্তি। প্রেম অন্তর্মুখী।তা স্বরূপ শক্তির বৃত্তি। এর পরেই কবিরাজ কৃষ্ণদাস বললেন সেই অমোঘ সত্য কথা-

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

কাম প্রতিটি সময়ের জন্য চায় নিজ ইন্দ্রিয়কে তুষ্ট করতে। কিন্তু প্রেমের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১৪২ সংখ্যক পয়ার থেকে ১৪৮ সংখ্যক পয়ারে যে কথাগুলিকে স্তর পরম্পরায় কবি বলতে চাইলেন তার মর্মার্থ হল কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ। প্রেমের তাৎপর্য কৃষ্ণের সুখ। গোপীনীরা কৃষ্ণের সুখকেই তাদের একমাত্র আস্বাদন মেনেছিলেন। নিজ সুখ কে নয়। তাঁরা লোকধর্ম, বেদ ধর্ম,দেহ ধর্ম, লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্ম সুখ সবকিছু বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন।তাঁরা নিজ আত্মীয় পরিজন, তাড়ন-ভৎসর্ণা সমস্ত কিছুকে কৃষ্ণ সুখ হেতু বর্জন করেছিলেন। আর এই যে কৃষ্ণ সাধনা এ তখন আর কাম থাকেনা। তা মর্যাদা পায় প্রেমের। তাই চরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ এর ১৪৭ এবং ১৪৮ সংখ্যক পয়ারে লেখা হল-

"অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর

কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর।।

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।

কৃষ্ণসুখলাগিমাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।।"

গোপী প্রেম যে শুধু কাম গন্ধহীন তাই নয়, এই প্রেম অচিন্ত্য স্বভাবের। এর মধ্যে কোন স্বসুখ বাসনা নেই। কৃষ্ণ দর্শনে, কৃষ্ণ নামে তাদের আনন্দ। কারণ ছাড়া কার্য হয়না। কিন্তু গোপীনীরা যে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল তার মধ্যে কারণ খুঁজতে যাওয়া ঠিক

নয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৫৬ সংখ্যক পয়ার থেকে ১৬৬ সংখ্যক পয়ার পর্যন্ত এই কথাটিই ব্যাখ্যা করেছেন কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সেখানে বলা হয়েছে গোপীগণ এর প্রেম আমাদের বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা মাপা যাবে না। কৃষ্ণদর্শনে তাদের সুখ কোটি গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু কোন সুখবাঞ্ছা থাকে না। গোপীদের দর্শনেও কৃষ্ণের আনন্দ হয়, কিন্তু "তাহা হইতে কোটিগুণ গোপি আস্বাদয়ে।"

শ্রীকৃষ্ণভাবনা করছেন যারা তাত্ত্বিক, তারা কৃষ্ণকে পূর্ণানন্দস্বরূপ বলেন। এই পৃথিবী তার কাছ থেকে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আনন্দদান করাবেন বা করাতে পারেন এমন জন যিনি কৃষ্ণ চেয়েও গুণময়। ভগবান কৃষ্ণ বলছেন জগতে তার চেয়েও রাধার প্রেমগুণ অনেক বেশি। কৃষ্ণের রূপ অসমোর্ধ্ব। কৃষ্ণের রূপের মত রূপ বা সমরূপ বা কৃষ্ণের চেয়েও বেশি রূপ বা উর্দ্ধ রূপ কারও নেই। শ্রেষ্ঠ রূপবান কৃষ্ণকে মুগ্ধ করে রাধার রূপ। কৃষ্ণের বাঁশির আওয়াজ এ সমস্ত পৃথিবী তৃপ্ত হয়। অথচ রাধার কণ্ঠধ্বনি কৃষ্ণের হৃদয়কে হরন করে। কৃষ্ণের মধুররসে জগৎ মধুময় হয়। কিন্তু রাধার অধরের সুধা রস কৃষ্ণকে বশীভূত করে। রাধার অধর-সুধা কোটি চাঁদের মত শীতল করে কৃষ্ণকে। জগতের সুখের হেতু হলেন কৃষ্ণ। রাধা হলেন সেই কৃষ্ণের শুখহেতু। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই সমস্ত দিক থেকেই শ্রীরাধা ভগবান কৃষ্ণের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। রাধা কে দেখে ভগবানের আনন্দ হয়। আবার রাধা আনন্দিত হন ভগবান শ্রীকৃষ্ণদর্শনে। রাধার কণ্ঠধ্বনিতে কৃষ্ণকর্ণ সুখময় হয়। কৃষ্ণ কণ্ঠ নয়, রাধার গান সুখময় হয় কৃষ্ণের বাঁশিতে। সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দেহ স্পর্শ নয়, রাধা সুখময় হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় তমাল বৃক্ষকে কৃষ্ণ ভেবে আলিঙ্গন করে।

প্রত্যক্ষ রাধার গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস এ শ্রীকৃষ্ণ মোহিত ও জারিত হলেও রাধা কিন্তু যেদিক দিয়ে বা যেখান থেকে কৃষ্ণ গন্ধময় বায়ু আসে তার দিকে অন্ধের মতো ছুটে যান। রাধার অধর সুধায় কৃষ্ণ আনন্দিত। কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুলের রস পানে রাধা আনন্দময় হন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ এর ২১৬ সংখ্যক পয়ার থেকে ২১৮সংখ্যক পয়ার এর মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

"তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।

আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ।।

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।

তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।।

নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।

সে সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভে বাঢ়ে চিতে।।"

ভগবান কৃষ্ণ, রাধার এই অনুরাগকে, এই প্রেমকে যথার্থ অর্থে বুঝে উঠতে পারেন না ব্রজলীলায়। তিনি মনে মনে তিনটি ইচ্ছা পোষণ করে ঠিক করেন একই দেহে রাধা এবং কৃষ্ণ দুই রূপকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই পৃথিবীতে জন্ম নেবেন। সেই তিন ইচ্ছে হল-(১) শ্রীমতি রাধার প্রেম মহিমা কেমন (২)শ্রীমতী যা আস্বাদন করেন, আমার অর্থাৎ (ভগবান কৃষ্ণের) সেই মাধুর্য কেমন এবং (৩) আমার অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণের জন্য শ্রীমতী যে সৌখ্য বা আনন্দ অনুভব করেন তা কেমন? এরই ফলশ্রুতিতে চৈতন্য অবতার হয়ে ভগবান পৃথিবীতে এসেছিলেন।

১৩.৬ কৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য স্বরূপকে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করেছেন আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যকে আলোচনা করতে গিয়ে তাকে পূর্ণ শক্তিমান বলে উল্লেখ করেছেন চৈতন্যচরিতামৃতকার।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণমাধুর্যময় হলেও ভগবান কিন্তু নিজে ভেবেছেন যারা তত্ত্বজ্ঞানী তারাই ভগবানকে মনে করেন পূর্ণানন্দস্বরূপ। এই নিখিল বিশ্বচরাচর ভগবানের কাছ থেকে আনন্দ লাভ করে থাকে। কিন্তু ভগবানকে আনন্দদান করতে পারেন শুধুমাত্র গোপীনীরা। শুধুমাত্র মহাভাবেরঅধিকারীণীশ্রীমতী রাধা। যার গুণ কৃষ্ণগুণের থেকেও বেশি বলে ভগবান কৃষ্ণ মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা শুনেছি। কৃষ্ণের রূপের মত রূপ বা সমান রূপ বা তাঁর চেয়ে বেশী রূপ আর কারো নেই। অথচ এই মাধুর্য্যময়

কৃষ্ণ যাঁর রূপে মুগ্ধ, তিনি গোপিনী রাধা।

কৃষ্ণের মাধুর্যময় বাঁশির আওয়াজে জগৎ মোহিত। অথচ এ হেন ভগবান মোহিত হন রাধার শ্রীবাক্যে।কৃষ্ণ মাধুযের সঙ্গে সমস্ত জগৎ মোহিত হয়। অথচ রাধাদেহ গন্ধ সুধায় ভগবান আনন্দিত হন। মোহিত হন। আহ্লাদীত হন।

ভগবান কৃষ্ণের সুগন্ধে সমস্ত পৃথিবী মোহিত হয়ে পড়ে। অথচ ভগবান নীচে মহিত হন রাধা অঙ্গ গন্ধে। কোটি চন্দ্রের শীতলতার মত শিতলতাকে কৃষ্ণের স্পর্শে লাভ করেন পৃথিবী। কৃষ্ণের এমন মাধুর্যগুণ। কিন্তু ভগবান মোহিত হন রাধা স্পর্শে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইযে মাধুর্যময় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, যাতে পৃথিবী মোহিত-আনন্দিত, সেই ভগবান আনন্দিত হন রাধা সান্নিধ্যে। রাধাকে দেখে ভগবান আনন্দিত। অথচ রাধা ভগবানকে দেখে কোটি আনন্দে অজ্ঞান হন।রাধার বাক্যে ভগবান আনন্দিত। অথচ রাধা কোটি আনন্দ পান কৃষ্ণের বাঁশির আওয়াজে। রাধা ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখে যে আনন্দ পান, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পান তমাল গাছ কে কৃষ্ণ ভেবে আলিঙ্গন করে। রাধা প্রত্যক্ষ কৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্ণ গন্ধের বাতাস যে দিক থেকে ছুটে আসছে সেই দিকে ধেয়ে যেতে বেশি ভালবাসেন। রাধাকে সাক্ষাৎ দেখে আনন্দ পান কৃষ্ণ। রাধার অধর সুধায় কৃষ্ণ আনন্দিত হন, অথচ কৃষ্ণ চর্বিত তাম্বুল চর্বণে রাধা বেশি আনন্দ পান। কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্যকে অনুধাবন করতে গেলে যে কামহীন, স্বার্থহীন,স্বসুখহীন, আত্মীয়-পরিজন স্বজন বর্জিত হওয়া প্রয়োজন একমাত্র গোপীনীরা তা হতে পেরেছেন। তারাই কৃষ্ণপ্রেম কে যথাযথ বুঝতে সমর্থ হয়েছেন। তাই চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৭২ সংখ্যক পয়ারে ভগবান বলছেন-

"আর শুদ্ধ-ভক্ত-কৃষ্ণ-প্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সাল্যোক্যাদি না করে গ্রহণ।"

এহেন ভগবান এই বৃন্দাবন লীলায় শ্রীরাধা তথা গোপী প্রেমের স্বরূপ কে বুঝতে না পেরে তিনটি বাঞ্ছা মনে মনে পোষণ করে নেন। এই তিন বাঞ্ছা পুরন করবেন বলে একই দেহে রাধা ও কৃষ্ণ হয়ে জন্মালেন। এই তিনবাঞ্ছা হল-(১) শ্রীমতি রাধিকার

প্রণয় মহিমা কেমন(২) শ্রীমতী যাকে আস্বাদন করেন, আমার (অর্থাৎ ভগবানের) সেই বিচিত্র মাধুর্য কেমন এবং(৩) আমার (অর্থাৎ ভগবানের)অনুভব বশতঃ যে আনন্দ অনুভব করেন তা কেমন?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলা হল-

"সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম- প্রেম কৈলপরাচার।।
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের মূল বাঞ্ছা, এইযে কারণ।।"

চৈতন্য অবতারের বহিরঙ্গ কারণ ছিল নাম ভক্তি প্রচার। অন্তরঙ্গ কারণ ভগবানের বৃন্দাবনলীলার অপূর্ণতিন বাঞ্ছা কে একই দেহে রাধা এবং কৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভগবান বুঝবেন। এইভাবেই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বকে সহজতম দৃষ্টিতে ও ভঙ্গিমায় আলোচনা করেছেন কবি। এখানে থায় অসামান্য। এই জন্যই বলা হয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চিরাচরিত ভঙ্গিতে চৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করেন নি। তিনি চৈতন্যকে বিচার করেছেন বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে দিয়ে। কৃষ্ণ তত্ত্বের সঙ্গে গৌরাঙ্গ তত্ত্বের এই মিশ্রণ একজন ভক্ত তথা দার্শনিকই করতে পারেন সে ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সার্থকতম।

১৩.৭ অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় ও রাধাতত্ব কৃষ্ণ তত্ত্বের সঙ্গে গৌরাঙ্গ তত্ত্বের সম্পর্ক আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২. চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ রাধা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ৩. আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ এর কৃষ্ণ তত্ত্ব আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে গোপী তত্ত্ব কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আলোচনা কর।

১৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২। চৈতন্যচরিতামৃত- সুকুমার সেন সম্পাদিত

৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত- ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

৪। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান- ড. বিমানবিহারী মজুমদার

৫। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত- সম্পাদনা—অধ্যাপক ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক তপন কুমার মুখোপাধ্যায়

একক ১৪। মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিন্যাস ক্রম

১৪.১। কাব্য বিশ্লেষণ

১৪.২। বস্তু সংক্ষেপ

১৪.৩। সাধ্য তত্ত্ব

১৪.৪। সাধন তত্ত্ব

১৪.৫। কৃষ্ণ তত্ত্ব

১৪.৬। রাধাতত্ত্ব

১৪.৭। প্রেম বিলাস

১৪.৮। ইষ্টগোষ্ঠী

১৪.৯ ।অনুশীলনী

১৪.১০ ।গ্রন্থ্পঞ্জি

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৪.১ কাব্য বিশ্লেষণ

শ্লোক সংখ্যা ১

সঞ্চার্য্য রামাভিদ ভক্তমেঘে

স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি

গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ

স্তজজ্ঞতবরত্নালয়তাং প্রয়াতি।

বলা হয় বৃষ্টির জল যদি না পড়ে তবে সমুদ্রের ঝিনুক মধ্যে রত্ন জন্মায় না।সমুদ্র সবার আগে বাষ্প রূপে নিজের জল সঞ্চয় করে। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টির জল পড়ে। তখন যদি সমুদ্র সেই বৃষ্টির জল গ্রহণ করে তখন তাতে রত্ন জন্মায় ।সমুদ্র এই রত্নকে নিজের বুকে রাখে ।তাই তিনি রত্নাকর। চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচ্যসূচিতে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর সংলাপকে তুলনা করা হয়েছে। মহাপ্রভুকে বলা হয়েছে সমুদ্র। রামানন্দ রায় যেন মেঘ। তাদের মধ্যে আলোচিত রস তত্ত্বের স্বরূপ অর্থাৎ দাস্য,সখ্য,বাৎসল্য মধুর রসের সন্ধানের সিদ্ধান্তগুলিকে জলের সাথে, রামানন্দ রায়ের মুখনিঃসৃত সিদ্ধান্তগুলি শুনে তাদের উপলব্ধিকে রতনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।সমুদ্র যেভাবে নিজের জলকে মেঘে সঞ্চারিত করে আবার মেঘ থেকে তাকেই আবার গ্রহন করে, মহাপ্রভুর তেমন ভগবান বা নিজের সম্বন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্ত গুলি পরমভক্ত রামানন্দ রায়ের কাছে সঞ্চারিত করে, তারা সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উপলব্ধি লাভ করেন ।আসলে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে সাধ্য সাধন তত্ত্ব এবং আরো বোঝানো হয়েছে এখানে রামানন্দ, শ্রোতা হবেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ। শ্রী গৌরাঙ্গ জানালেন যে ভক্ত যদি ভক্তি কথা পরিবেশন করেন তবে তা শুনে ভক্তি অনুভব হয়।

শ্লোক সংখ্যা ২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে

উগ্রোহপানুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী ।

কেশরীর স্বপোতানামনে ষানুগ্রবিক্রমঃ।।

অর্থাৎ কেশরী হল সিংহ। সিংহ যেমন অন্যের কাছে অর্থাৎ নিজের শত্রুদের কাছে উগ্র।তা হলেও নিজের সন্তানদের প্রতি শান্ত। তেমনি নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি ভক্ত দ্রোহীদের প্রতি উগ্র, প্রহ্লাদ এর মত ভক্তদের প্রতি অনুগ্র অর্থাৎ স্নেহময়।

শ্লোক সংখ্যা ৩

তথাহি

মংদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন কল্পতে নান্যথা ক্কচিৎ।।

অর্থাৎ হে ভগবান দীন গৃহীদের কল্যান করার জন্য তাদের ঘরে মহৎ ব্যক্তিদের গমন হয়ে থাকে। অন্য কারণে কোথাও তাদের গমন হয়না। বসুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ এর জন্য সর্গাচার্য যখন নন্দরাজের ঘরে এসেছিলেন তখন নন্দ মহারাজ নিজের দীনতা জানিয়ে সর্গাচার্যকে এই শ্লোক বলেছিলেন। এখানে রায় রামানন্দ নিজ দীনতার জন্য এই শ্লোক উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক সংখ্যা ৪

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেন পুরঃপুমান।

বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নাম্যস্তত্তোষকরণম।।

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের যে পালনীয় আচার তার প্রতিটি জিনিস যে পালন করেন, সেই পুরুষ দ্বারা পরম পুরুষ শ্রী ভগবান বিষ্ণু আরাধিত হন। আসলে এই বর্ণাশ্রম ছাড়া বিষ্ণু প্রীতি সম্ভব নয়।

শ্লোক সংখ্যা ৫

তথাহি শ্রীভগবতগীতায়ম

যৎ করোষি যদশ্লাসি যজ্জুহোষি।

দাদসি যজ।

যত্তপস্যমি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম।

অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন- হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর্ম কর, যা কিছু ভোজন করো, যা কিছু যজ্ঞ করো, যা কিছু দান করো, যা কিছু তপস্যা করো তার সমস্ত কিছুই তুমি আমাতে অর্পন করো মাত্র।

শ্লোক সংখ্যা ৬

তথাহি

আজ্ঞায়ৈবং গুণান দোষান ময়াদিষ্টানপি।

স্বকান।

ধর্মান সন্ত্যজ যঃ সর্বান মাং ভজেৎ স চ ।

সত্তম।।

অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন-হে উদ্ধব, বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে আমার দ্বারা যা আদিষ্ট হয়েছে, তার দোষগুণ সম্যকরূপে অবগত হয়ে সেইসব নিত্যনৈমিত্তিক স্বকীয় বর্ণাশ্রম ধর্মকে ত্যাগ করে যে ব্যক্তি আমাকে ভজন করে সেই ব্যক্তি ও পূর্বোক্ত কৃপালু অকৃত দ্রোহাদি ব্যাক্তি সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক সংখ্যা ৭

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়ম

সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি।

মা শুচঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,হে অর্জুন সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করব। তুমি কোনোরকম শোক করোনা।

শ্লোক সংখ্যা ৮

তথাহি তত্রৈব

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচিত ন কাঙক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু মদ্ভক্তিং লভতে

পরাম।।

অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ সংপ্রাপ্ত। প্রসন্ন আত্মার অধিকারী মানুষ নষ্ট বিষয়ের জন্য শোকগ্রস্ত হয়না। কোন বস্তুকে লাভ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেনা। সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে তিনি ভগবানের মধ্যে পরা ভক্তি লাভ করেন। একথা ভগবান কৃষ্ণ বলছেন।

শ্লোক সংখ্যা ৯

তথাহি

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমস্ত এব

জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভগদীয়বার্তাম।

কি সম্ভব ইয়োহানেস কেপলার সহজ

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন হে অজিত, তোমার স্বরূপের মহিমা বিচারের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করে যারা সাধুদের আবাসে অবস্থান পুর্বক সাধুদের মুখে উচ্চারিত এবং নিজে থেকেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপ গুণের কথা, তোমার ভক্তদের চরিত কথা শ্রবণকেই নিজেদের একমাত্র উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন, তারা অন্য কিছুই করেন না। ত্রিলোক মধ্যে তাদের দ্বারা তুমি প্রায়ই বশীকৃত হও। ঈশ্বর কথা শনায় সেব্য সেবক ভাবের ও সেবা বাসনার বিকাশ হতে পারে। সেই বিকাশ যদি না হয় প্রেম শব্দটি সার্থকতা বজায় থাকে না। প্রেম যদি না জন্মায় তবে ভগবানের বশ্যতা স্বীকৃতির প্রশ্ন উঠতে পারে না ।যিনি এই ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করে থাকেন ভগবান তার বশীভূত হয়ে তাকে নিজের সেবায় অধিকার দিয়ে থাকেন। ফলে জ্ঞানশূন্য ভক্তিকে সাধ্যসার বলা হয়েছে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথার শ্রবন কীর্ত্তনেও সাধনা ঘটে ,সাধ্য ঘটে। সিদ্ধাবস্থাতে ভক্ত ভগবানের লীলা কীর্তনের সাহায্যে নিজেও আনন্দ উপভোগ করে থাকেন, ভগবান কেও আনন্দিত করেন।

শ্লোক সংখ্যা ১০

তথাহি পদ্যাবল্যাম

নানোপচার ক্রিত-পুজনমার্ত্তবন্ধোঃ

প্রেম্মৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখ বিদ্রুতং স্যাৎ।

যাবৎ ক্ষুদ্রন্তি জঠরে জরঠা পিপাসা

তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে

অর্থাৎ যে ভক্ত নানা উপাচারে প্রেমের সঙ্গে পূজিত হলেই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হয়। যেমন যে পর্যন্ত পেটে প্রবল ক্ষুধা এবং পিপাসা বিরাজ করে সেই পর্যন্ত অন্নজল সুখের হয়ে থাকে।

শ্লোক সংখ্যা ১১

তত্রৈব

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি

ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে

অত্র লৌলুপমি মুল্যমেকলং

জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।

যদি কোন সৎসঙ্গ কোন কারণে পাওয়া যায় ,তবে কৃষ্ণ ভক্তি রসের সঙ্গে তার থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধি কিনে নিতে হবে। এই ক্রয়ের কাজে নিজ লালসা একমাত্র মূল্য। কিন্তু কোটি জন্মের ভালো কাজের ফলে সেই লালসাকে লাভ করা যায় না।

শ্লোক সংখ্যা ১২

তথাহি

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমাণভবতি নির্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে।।

অম্বরীয় মহারাজকে বলছেন দুর্বাসা মুনি যার নাম শুনেই জীব সর্বপাধিবিনির্মুক্ত হয়ে নর্মল হয়, সই তীর্থ পদ ঈশ্বরের দাসদের পক্ষে কি প্রাপ্য বস্তুই না অবশিষ্ট থাকে?

মানে সব প্রাপ্য বিষয়ই তারা পান। তাদের অভাব থাকে না।

শ্লোক সংখ্যা ১৩

তথাহি যামুনমুনিবিরচিতে

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ

প্রশান্তনিঃশেষ মনোরথান্তরঃ ।

অর্থাৎ আমি কোন সময় তোমার নিত্য দাস হয়ে নিরন্তন তোমারে সেবা করে অন্য বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত চিত্ত হয়ে নাথযুক্ত জীবনকে আনন্দিত করব।

শ্লোক সংখ্যা ১৪

তথাহি

ঈত্থং গতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা

দাস্যাং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন

সার্দ্ধাং বিজহ্রুঃকৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।।

অর্থাৎ অশেষ পূণ্য কার্যকারী গোপবালকেরা এভাবে জ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্মানন্দ অনুভব স্বরূপ। মায়া যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে মনুষ্য বালক স্বরূপে কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করছিলেন।

শ্লোক সংখ্যা ১৫

নন্দঃ কিমকরোদ ব্রাহ্মণ শ্রেয় এবং মোহোদয়ম।

যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যা স্তনং হরিঃ।।

হে মুনে ! রাজা নন্দ এমনকি পূণ্য কাজ করেছিলেন। মহাভাগ্যবতী যশোদা এমনকি পূণ্য কাজ করেছিলেন যে কৃষ্ণ তার স্তন পান করেছেন।

শ্লোক সংখ্যা ১৬

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন

শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিয়ে গোপী যত্তৎ প্রাপ

বিমুক্তিদাৎ।।

অর্থাৎ মুক্তিদাতা কৃষ্ণ থেকে গোপী যশোদা যে অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন সেই অনুগ্রহ ব্রহ্মা,শিব এমনকি বক্ষসংলগ্না লক্ষ্মীও লাভ করেননি।

শ্লোক সংখ্যা ১৭

তথাটি তত্রৈব

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উনিতান্তবতেঃ প্রসাদঃ

স্বযোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।

রাস্যোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ

লব্ধাশিষং য উদ্গাদ ব্রজসুন্দরীনাম।।

রাস উৎসবের সময় কৃষ্ণের ভুজদণ্ডের দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়ায় পূর্ণ মনোরথা ব্রজসুন্দরীরা যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন, তেমন প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রতিনিয়ত স্থিতা লক্ষ্মী নিশ্চয়ই লাভ করেন নি। পদ্মের মত গন্ধ ও সৌন্দর্যময় স্বর্গ-অঙ্গনারাও লাভ করেন নি। অন্য রমণীদের তো কথাই নেই।

শ্লোক সংখ্যা ১৮

তাসামাবিরভুচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।

পীতাম্বরধর স্রস্বী সাক্ষাৎ মন্মথ -মন্মথঃ।।

স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল মুখপদ্ম যুক্ত, পীতাম্বরধারী মাল্যবিভূষিত ও সাক্ষাৎ মন্মথের মনহরকারী কৃষ্ণ তার সামনে আবির্ভূত হলেন।

শ্লোক সংখ্যা ১৯

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে -স্থায়িভাব হর যাম।

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিত।

অর্থাৎ শান্ত- দাস্য- সখ্য- বাৎসল্য- মধুর এই পাঁচটি প্রধান রতি ক্রমেই স্বাদাধিক্য বিশিষ্ট হলেও বাসনাভেদে কোনও রতি কোন ভক্তের সম্বন্ধে বিশেষ রুচিকর হয়ে থাকে।

শ্লোক সংখ্যা ২০

তথাহি

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতনাং

মদাপনঃ।

ভগবান কৃষ্ণ গোপীদের বললেন, আমার প্রতি ভক্তি প্রাণীদের সংসার মোচনের উপায়, আমার প্রতি তোমাদের যে মদাকর্ষক স্নেহ জন্মেছে, তা অতিশয় মঙ্গলের বিষয়।

শ্লোক সংখ্যা ২১

তথাহি শ্রী ভগবদগীতায়ম

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বস্বঃ।।

ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, হে অর্জুন যারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাদের সেভাবেই কৃপা করি। মানুষেরা সর্বপ্রকারে আমারই ভজনা পথ অনুসরণ করে থাকে।

শ্লোক সংখ্যা ২২

তথাহি

না পারযেহহং নিরবদ্যসংযুজাং

স্বসাধুকৃত্যাং বিধুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাভজন দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ

সংবৃশ্চ তদ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।

ভগবান কৃষ্ণ গোপীদের বললেন-হে গোপীরা, দুশ্ছেদ্য গৃহের শিকল ছিড়ে ফেলে তোমরা আমার ভজন করেছ। অনিন্দ্য ভজন পরায়না তোমাদের সাধু কৃত্যের প্রত্যুত্তরে উপকারে দেবপরিমিত আয়ু পেলেও আমি এই কাজ করতে পারবোনা। তাই তোমাদের নিজেদের সাধু কাজেই তোমরা সাধু কাজের উপকার পাবে।

২৩ সংখ্যক শ্লোক - ৫৩ সংখ্যক শ্লোক এর বঙ্গানুবাদ

শ্লোক সংখ্যা ২৩

সেই রাস মন্ডলে সোনা বর্ণ মুনিগণ মধ্যে মহামারকত যেমন শোভা পায়, তেমনি সেই স্বরবর্ণের ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে আলিঙ্গিত হয়ে ভগবান কৃষ্ণ শোভা পেতে লাগলেন।

শ্লোক সংখ্যা ২৪

শ্রীরাধার ভগবান যেমন প্রিয়, শ্রীরাধার কুণ্ডও তেমনই প্রিয়।সমস্ত গোপীদের মধ্যে একা রাধিকাই কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। অর্থাৎ রাধাই কৃষ্ণের প্রিয়তম সখী।

শ্লোক সংখ্যা ২৫

এই রমনী দ্বারা ভগবান কৃষ্ণ নিশ্চয় আরাধিত হয়েছেন। যেহেতু কৃষ্ণ প্রিত হয়ে আমাদের পরিত্যাগ পূর্বক আমাদের অগম্য নিভৃত স্থানে তাকে আনয়ন করেছেন।

শ্লোক সংখ্যা ২৬

কংসারি কৃষ্ণও তার সম্যক সারভূত বাসনার দৃঢ়ীকরণে শৃংখল রূপা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্য ব্রজ সুন্দরীদের পরিত্যাগ করলেন।

শ্লোক সংখ্যা ২৭

কন্দর্পসংঘাতের জন্য ব্যথিত চিত্ত কৃষ্ণ রাধাকে ইতস্তত খুঁজতে শুরু করেও অনুতপ্ত হৃদয়ে যমুনাতীরে কুঞ্জবনে বিষাদ প্রকাশ করতে লাগলেন।

শ্লোক সংখ্যা ২৮

সাপের গতির মত প্রেমের গতি স্বভাব কুটিল। এর জন্য হেতু থাকুক বা না থাক যাবতীয় মনোদয় থাকে।

শ্লোক সংখ্যা ২৯

গোবিন্দ কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। তিনি সৎ চিৎ আনন্দ মূর্তি। তিনি অনাদির আদি পুরুষ। তিনি সমস্ত কারণের কারণ।

শ্লোক সংখ্যা ৩০

সহস্য মুখকমল, পীত বসন পরিহিত এবং বনমালা ভূষিত মূর্তিমান মদনমোহন ভগবান কৃষ্ণ সেই ব্রজাঙ্গনাদের মাঝে আবির্ভূত হলেন।

শ্লোক সংখ্যা ৩১

যিনি সমস্ত রসে অমৃতমূর্তি, যিনি কান্তির সাহায্যে তারকা এবং পালিকা নামের গোপী দুজনকে বশীভূত করেছেন, যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করেছেন, সেই রাধা প্রিয় কৃষ্ণ জয় যুক্ত হন।

শ্লোক সংখ্যা ৩২

এই শ্লোকে বলা হয়েছে হে সখি, অনুরঞ্জন এর দ্বারা সব গোপীদের আনন্দ জন্মে এবং নীল পদ্ম শ্রেণি থেকেও শ্যামল ও কোমল অঙ্গসমূহ দ্বারা তাদের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব অনুভব করিয়ে এবং অসংকোচে তাদের সমস্ত অঙ্গ দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে মূর্তিমান শৃঙ্গার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করছেন।

শ্লোক সংখ্যা ৩৩

এখানে বলা হয়েছে ধর্ম রক্ষার জন্য পূর্ণশক্তিতে অবতীর্ণ হে কৃষ্ণ এবং হে অর্জুন। তোমাদের দুজনকে দেখতে ইচ্ছুক আমি পুত্রগণকে আমার ঘরে এনেছি। আবার তোমরা পৃথিবীর ভারভূত অসুরদের সংহার করে শীঘ্র আমার কাছে প্রেরণ কর।

শ্লোক সংখ্যা ৩৪

হে দেব, যে চরণ ধুলার স্পর্শাধিকার পাবার জন্যে লক্ষ্মী সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে ব্রত ধারন পুর্বক বহুদিন তপস্যা করেছিলেন।সেই তমার চরণ রেনু স্পর্শের অধিকার কালিয়নাগের কোন ফলে তা জানি না।

শ্লোক সংখ্যা ৩৫

মনিভিত্তিতে ফুটে ওঠা নিজের মাধুর্য দেখে কৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলেছেন -অহো অনুভূতপূর্ব, চমৎকারজনক এবং কি অনির্বচনীয় গরীয়ান আমার এই মাধুর্য রাশি প্রকাশ পাচ্ছে ।যা দর্শন করে এই আমিও প্রলুব্ধ হয়েছি। রাধার মত ঔৎসুক্য নিয়ে উপভোগ করতে অভিলাষ করছি।

শ্লোক সংখ্যা ৩৬

বিশ্বশক্তির একটি পরা, দ্বিতীয়টি অপরা ও তৃতীয়টি অবিদ্যা কর্ম নামে অভিহিত করা হয়।

শ্লোক সংখ্যা ৩৭

হে ভগবান, তোমার স্বরূপভুতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ এই তিন শক্তি।সব তোমাতেই অবস্থিত। কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নয়। আর হ্লাদকরী অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা সৃষ্টিকারী সাত্ত্বিক,তাপকরী অর্থাৎ বিষয়ে বিয়োগের জন্য মানসিক তাপদায়নী তামসী এবং সুখ জনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনক এই দুই,মিশ্রা রাজসী এই তিন শক্তি, তুমি প্রকৃতসত্ত্বাদিগুনবর্জিত বলেই তোমাতে নেই, জীবে আছে।

শ্লোক সংখ্যা ৩৮

শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলী উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধা সর্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠ ।যেহেতু রাধা মহাভাবস্বরূপা এবং গুণ প্রভাবে অত্যাধিক রূপে শ্রেষ্ঠা।

শ্লোক সংখ্যা ৩৯

প্রত্যেকের প্রিয়তম যে গোবিন্দ আনন্দচিন্ময় রস দ্বারা প্রভাবিতা, স্বকান্ত রূপে প্রসিদ্ধা, স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী রূপা সেই ব্রজদেবিদের সঙ্গে গোলোকেই বাস করছেন। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দ কে আমি অর্থাৎ ব্রহ্মা ভজনা করি।

শ্লোক সংখ্যা ৪০

কৃষ্ণের প্রনয়ের উৎপত্তি স্থান কে? একা রাধিকা। তার প্রেয়সী কে? অতুলনীয় গুণসম্পন্না একা রাধিকা, অন্য কেউ নয়। এর কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য, ও স্তনে নিষ্ঠুরতা। একা রাধা ভগবান কৃষ্ণের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সমর্থ হন অন্য কেউ নয়।

শ্লোক সংখ্যা ৪১

বিদগ্ধ নবযুবক পরিহাস নিপুন, নিশ্চিত এবং প্রায়ই প্রিয়সীর বশীভূত নায়ককে ধীরললিত নায়ক বলা হয়।

শ্লোক সংখ্যা ৪২

রাত্রিকালীন রতিকৌশলের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এমন বাক্য দ্বারা সখীদের সাক্ষাতে রাধাকে লজ্জাবশত সংকুচিত নেত্রা করে রাধার স্তনযুগলে বিচিত্রকেলিমকরি নির্মাণকৌশল এর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে কুঞ্জে বিহার করতে করতে কৃষ্ণ নিজের কৈশোর বয়সকে সফল করেছেন।

শ্লোক সংখ্যা ৪৩

হে গোবর্ধন, গিরিনিকুঞ্জবিহারীকুঞ্জরপতে শ্রীরাধা তোমার হৃদয় রূপ লাক্ষাকে স্বেদ দ্বারা ক্রমে দ্রবীভূত করে ভেদভ্রম অপসারণ পূর্বক দুজনার হৃদয়কে একীভূত করে নিপুন শৃঙ্গার শিল্পী এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ অট্টালিকার ভেতরে চিত্রিত করার জন্য বহু পরিমাণ নবরাগ রূপ হিঙ্গুল দ্বারা স্বয়ং তাকে অনুরঞ্জিত করেছেন।

শ্লোক সংখ্যা ৪৪

পরমেশ্বর যেমন শক্তি ব্যতিত পুষ্টি লাভ করেন না তেমনি রাধাকৃষ্ণের ভাব বিরাট অত্যন্ত সুখ স্বরূপ এবং প্রকাশ হলেও নিজের ও সখিরা ছাড়া কিছু সময়ও রসপুষ্টি ধারণ করে না। কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি সেই সখীদের চরণ আশ্রয় করেন না।

শ্লোক সংখ্যা ৪৫

ব্রজ কুমুদ চাঁদ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নামক যে শক্তি, সারাংশ প্রেম লতার মতো রাধার সখীরা পল্লব পাতা ফুলের মত।কৃষ্ণলীলা অমৃতরূপ জল দিয়ে ওই রাধা সিঞ্চিত এবং উল্লসিত হলে ,নিজ সেবা থেকে শতগুণ বেশি পুলকিত হয়ে ওঠেন তার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শ্লোক সংখ্যা ৪৭

হে প্রিয় ,তোমার যে পরম কোমল পদ্মপদ আমার কঠিন স্তনমন্ডলে ভীতা হয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করতাম। তুমি সেই চরণকমল দ্বারা বনে বনে ভ্রমণ করছো। তাই আমার হৃদয় ব্যাকুল হচ্ছে। এর কারণ হলো যে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের জীবন। তাই বন ভ্রমণ ছেড়ে তুমি আমাদের কাছে এসো।

শ্লোক সংখ্যা ৪৮

মন-প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে দৃঢ় যোগ যুক্ত মুনিরা যাদের হৃদয়ে উপাসনা করেন শত্রুরাও তোমার স্মরণ হেতু তাতেই প্রাপ্ত হয়েছে। নাগ রাজের শরীররুপ ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি কান্তারা যে চরণপদ্মসুধা হৃদয়ে ধারণ করেন, তুল্য দৃষ্টি পূর্ণ আমরাও তাদের মতোই সেই পাদপদ্ম অমৃতে প্রাপ্ত হয়েছি।

শ্লোক সংখ্যা ৪৯

এই ভগবান গোপিকা নন্দন ভক্তিমানদের কাছে যেমন অনায়াসলভ্য, দেহাভমিনী ব্যক্তিদের কাছে, দেহাভিমান শূন্য জ্ঞানীদের কাছে এবং ভগবানের আত্মভূত স্বরূপদের কাছে তেমন সুলভ নয়।

শ্লোক সংখ্যা ৫০

রাস উৎসবের কৃষ্ণের ভূজলতাদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হয়ে তাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায়

ব্রজসুন্দরীরা যে প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, সে প্রসাদ কৃষ্ণের বাম দিকের বুকে প্রতিনিয়ত বর্তমানা পরম প্রেয়সী লক্ষ্মীও লাভ করতে পারেননি। এবং পদ্মের মতো গন্ধ ও কান্তি যাদের সেই অপ্সরাবৃন্দ লাভ করেননি। অন্যান্য কামিনী রাও লাভ করেননি।

শ্লোক সংখ্যা ৫১

যার সঙ্গে সংস্রববশত সৃষ্ট বস্তুসমূহের অস্তিত্ব বোধ হচ্ছে এবং যার সঙ্গে সংযোগ না থাকায় অলীক পদার্থসমূহের অস্তিত্ব উপলব্ধি হচ্ছে না, যা থেকে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয় তিনি সর্বজ্ঞ এবং যে বেদে জ্ঞানীরা মোহিত হন, সেই বেদ যিনি আজ্ঞা কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করেছেন, অগ্নি ,জল, মাটি প্রভৃতির পারস্পরিক বিনিময়ের ভাব যেরূপ অলীক। যা ছাড়া গুণত্রয়ের সৃষ্টি মিথ্যা। সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।

শ্লোক সংখ্যা ৫২

যিনি সর্বভূতে আপনার উপাস্য ভগবদভাব এবং আপনার উপাস্য ঈশ্বরে সমস্ত প্রাণী কে দেখেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

শ্লোক সংখ্যা ৫৩

কি আশ্চর্য! ফুল এবং ফলে পরিপূর্ণ, ভার হেতু নম্র শাখা এবং প্রেম উল্লাসিত দেহ বনলতা সমূহ এবং বৃক্ষসকল নিজেদের মাঝে যেন বিষ্ণুকে সূচিত করেই মধু ধারা বর্ষণ করছিল।

১৪.২ শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ বস্তু সংক্ষেপ

শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করতে গিয়ে জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে গমন করলেন। সেখানে শ্রী শ্রী নৃসিংহ বিগ্রহ গ্রহণ করে দেবতাকে নমস্কার করার পর

দেবতার সামনে প্রেমাবেশে নাচ-গান করলেন। শ্রীনৃসিংহের সেবক তাকে মালা প্রসাদ এনে দিলেন।সেই দিন কোন এক ব্রাহ্মনের ঘরে বাস করে পরদিন সকালে আবার তিনি রওনা হলেন। বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী লোকজনকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দান করে তিনি ধীরে ধীরে গোদাবরী নদী তীরে উপস্থিত হলেন। গোদাবরী দর্শনে যমুনার ও তীরে অবস্থিত বনভূমি দেখে শ্রী বৃন্দাবন এর স্মৃতি তার মনে উঠে এল।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্নানের ঘাট থেকে কিছু দূরে জলের কাছাকাছি নিজের আসন স্থাপন করলেন। এমন সময় বাদ্য সহকারে বেশকিছু বৈদিক ব্রাহ্মণ কে সঙ্গে নিয়ে শ্রীল রামানন্দ রায় দোলায় চড়ে স্নান করতে এলেন।শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাকে দেখে বুঝলেন ইনিই শ্রী রামানন্দ রায়। যদিও তার সাথে দেখা করতে তিনি মনে মনে উতলা হয়ে উঠেছিলেন তবু কোনোক্রমে ধৈর্য ধরে রইলেন। এদিকে শ্রী রামানন্দ এই অপূর্ব সন্ন্যাসীকে দেখে তার কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন।

শ্রী মহাপ্রভু তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে উভয়েই প্রেমাবেশে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। দুজনেই গদগদ স্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে লাগলেন। সঙ্গী বৈদিক ব্রাহ্মণেরা দুজন কে এরকম ব্যবহার করতে দেখে মনে মনে নানা ধরনের আলোচনা করতে লাগলেন। এরপর ভিন্নধর্মী ব্যক্তিরা এখানে আছেন এই ভেবে মহাপ্রভু ভাবসংবরণ করলেন।

দুজনেই কিছুটা সুস্থ হয়ে উপবিষ্ট হলে মহাপ্রভু বললেন- সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমার নানা সদ্গুণের কথা বলে তোমার সঙ্গে আমাকে মিলিত হতে বলেছিলেন এবং সেই কারণে আমি এখানে এসেছি। অনায়াসে তোমার দর্শন লাভ হওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীল রামানন্দ রায় তার উত্তরে বললেন শ্রীযুত সার্বভৌম আমাকে ভৃত্য জ্ঞান করেন এবং পরোক্ষভাবে আমার কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন। এই কারণেই আজ আপনার দর্শন লাভ করে মনুষ্য জন্ম সার্থক করলাম। আর সার্বভৌমের প্রতিও যে আপনার কৃপা আছে তার লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। কারণ তার প্রতি প্রেমবশতই আপনি আমার মত অস্পৃশ্য শূদ্রকে আলিঙ্গন করেছেন। আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ।আর আমি রাজ

কর্মচারী বিষয় সেবী ও অধম শূদ্র। ব্রাহ্মণ এর পক্ষে শূদ্রকে স্পর্শ করা বেদে নিষিদ্ধ। নিষেধ না মেনে শূদ্র কে স্পর্শ করে এক নিন্দনীয় কাজ করতেও ছাড়েননি। আমাকে তাড়ন করতেই আপনার এখানে আসা হয়েছে। মহান্তের স্বভাবই হচ্ছে কোন কাজ না থাকলে শুধু পতিতকে উদ্ধার করার জন্য মহান্ত পুরুষ পতিতের বাড়ি যান। আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণদের মন আপনাকে দেখে প্রেমে দ্রবীভূত হয়েছে এবং সকলের চেহারাই কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ হয়েছে। আপনার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখলেই আপনার ঈশ্বর লক্ষণ বুঝতে পারা যায়।কারন এরকম অপ্রাকৃতে গুণ সাধারণ জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়।

শ্রীমহাপ্রভু বললেন -"তুমি মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমার দর্শনেই এখানে উপস্থিত সকলের মন বিগলিত হইয়াছে। অপরের তো কথাই নাই, আমার মত মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও তোমার স্পর্শ প্রেমবিহ্বল হইয়াছে। আমার কঠিন হৃদয় সংশোধিত করিবার জন্যই সার্বভৌম আমাকে তোমার সহিত মিলিত হইতে বলিয়াছেন।"

১৪.৩ সাধ্যতত্ত্ব

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সাথে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়। দুজনার মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম এবং দর্শনের উল্লেখযোগ্য বিষয়- সাধ্য সাধন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনাতে মহাপ্রভু শ্রোতা এবং রায় রামানন্দ বক্তা।

পুরুষার্থ বা সাধ্য আমাদের কাম্য। এই পুরুষার্থ বলতে আমরা বুঝি পুরুষ বা জীবের অর্থ বা কাম্য বস্তু। সংসারে সাধারণভাবে সবাই সুখের জন্য কাঙাল।সুখই কাম্য বিষয়। আবার এই সুখ কিন্তু সবার কাছে একরকম নয়। এক এক মানসিকতার মানুষ এক এক ধরনের সুখ চায়। যারা এই জগতে স্থুল ইন্দ্রিয়ের উপভোগকে সুখ মনে করে তাদের পুরুষার্থ কে কাম বলে। আবার কেউ কেউ এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপভোগকে সুখ ভাবেন না, সমাজের শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য করেন, আর তার কাছের পরিজনদের সুখের কথা ভাবেন তাদের পুরুষার্থ অর্থ।অর্থ ছাড়া অন্যকে বা অন্যের

উপকার করা যায় না। এই সুখ বর্তমান সময় বা ইহকাল ভিত্তিক। কিন্তু আরও একদল মানুষ আছেন যাঁরা ইহকালের সুখকেই একমাত্র সুখ ভাবেন না তারা পরকালের কথা ভাবেন, তারা শাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্মকে ভাবেন পুরুষার্থ। কিন্তু এই সুখও ক্ষণিকের। এই সুখও ইন্দ্রিয় নির্ভর। গীতা বলছে ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোক; বিশন্তি। একশ্রেণীর সাধকেরা দেহকে যেমন অনিত্য ভাবেন দৈহিক সুখ নির্ভর ভাবনা কেও অনিত্য ভেবে থাকেন। মুক্তিকে বা মোক্ষ কে পরমপুরুষার্থ ভেবে তাঁরা মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দিতে চান। এই মোক্ষের মধ্যে দিয়ে সংসারে ফেরার ব্যাপারটি আর থাকেনা।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই হলো চতুর্বর্গ। এদের মধ্যে ধর্ম অর্থ কাম হলো প্রবৃত্তিমূলক।মোক্ষকে বলা হয়নি বৃত্তিমূলক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এ আবার মোক্ষ কে স্বীকার করাই হয়নি।

বৈষ্ণব দর্শন বলে-ব্রহ্মানন্দ লোভনীয়। তারচেয়ে লোভনীয় জিনিস রয়েছে। নির্বিশেষ যে ব্রহ্ম তার স্বরূপ শক্তির বিলাস নেই। আর সেই জন্য সেই আনন্দ বৈচিত্র্যহীন। শ্রুতিতে বলা আছে ব্রহ্মাই রসস্বরূপ। রসের বিকাশ যত উর্ধ্বসীমায় যাবে তা ততই লোভনীয় হবে। ভগবান কৃষ্ণই রসের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ভগবান কৃষ্ণের মাধুর্যেরযে আস্বাদন তা নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভগবান কৃষ্ণ নিজ রূপের প্রতিই আকৃষ্ট হন।

ভগবান কৃষ্ণের এই মাধূর্য আস্বাদন করার শুধুমাত্র উপায় হল প্রেম। এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এমন ভেবেছেন বৈষ্ণব দার্শনিকেরা। প্রেম হল মুখ্য সাধ্য বস্তু। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ এবং মহাপ্রভুর কথার ভেতর দিয়ে এই সাধ্য বস্তুটির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণদাস।

মহাপ্রভু রামানন্দ কে বললেন, শাস্ত্রবিধি অনুসারে সাধ্য তত্ত্ব নির্ণয় করি। বললেন সাধের নির্ণয় কি?বিষ্ণুভক্তিই হচ্ছে সাধ্য বস্তু বা মানবের পরম কাম্য। মানুষ কৃষ্ণের দাস। তাই কৃষ্ণ সেবা তার একমাত্র উদ্দেশ্য। নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মধ্য দিয়েই কৃষ্ণের প্রেম লাভ করাই সাধ্যবস্তু।

প্রভু বললেন -“এহ বাহ্য আগে কহ আর”। মহাপ্রভুর মতে বর্ণাশ্রমের অনুগত্য রেখে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় তা বাহিরের কথা। এর দ্বারা স্বর্গসুখ লাভ হয়। নির্বাণ হয়। এতে স্বসুখই হয়। তাই তা স্বার্থ মিশ্রিত।এতে কৃষ্ণপ্রেম নেই। এর উত্তরে রামানন্দ বললেন-“কৃষ্ণেকর্মা পিনি সাধ্যসার”। কৃষ্ণেসব কর্মফলকে সমর্পণ করা অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধ্য বস্তু। প্রভু যুক্তি দিলেন এ শুধু সাধন মাত্র। এর মাধ্যমে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি রূপ সাধ্য লাভ হয়। এটা সকাম সাধনা। এতে কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়না। রায় রামানন্দ তার উত্তরে বলেছিলেন “স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ শ্রেষ্ঠ সাধ্য।

প্রভু উত্তর দিলেন তার কারণ হলো সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের স্মরণ নিলে সব পাপ দূর হয়। তাই এও মুক্তির জন্য সকাম সাধনা। তাই এও বাহ্য। রামানন্দের যুক্তি ছিল “মিশ্রভক্তি সাধ্যসার”। জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি সাধ্যসার।শাস্ত্রে জ্ঞান মানে সম্বন্ধজ্ঞান। এই জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত ভক্তি হল জ্ঞানমিশ্র ভক্তি। মহাপ্রভুর উত্তর ছিল যে এও বাইরের পথ।এই ভক্তিতে সাধকের সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকলেও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই ভক্তিতে জ্ঞানের দিকে বেশি ঝোঁক থাকে। ভক্তি কমে যায়। তাই এও বাহ্য। রায় রামানন্দ এবার জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা পারলেন, বললেন- জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক শূণ্য ভক্তিতে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে মহাপ্রভু ‘বাহ্য’ শব্দটি ব্যবহার করলেন না।বললেন এও হয়। তবে এর অতিরিক্ত কিছু আছে। কারণ জ্ঞানশূন্যা ভক্তি জীব ব্রহ্মের সেব্যা-সেবক ভাব বিকাশের এবং কৃষ্ণ সেবার বাসনা প্রস্ফুটিত করার অনুকুল। কিন্তু এর অতিরিক্ত আরো কিছু সাধ্য আছে। রায় রামানন্দের যুক্তি ছিল ‘প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার’। প্রেম মানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা। মহাপ্রভু বললেন, এও হয়, তবে এরওপরে কিছু বলার আছে। এই পর্যায়ে রামানন্দ রায় প্রেমভক্তি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হলেন। প্রথমে বললেন দাস্যপ্রেমই হল শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু প্রাধান্য না দিয়ে বললেন দাস্যপ্রেমে গৌরব বৃদ্ধি থাকে, তা বেশী বিকাশ হয়না।রামানন্দ রায় সখ্য প্রেমের অবতারনা করলে মাহাপ্রভু বললেন ‘এহোত্তম’। তার কারন শান্ত ও দাস্যের সবকটি গুণই এই সখ্য প্রেমে আছে। অতিরিক্ত যোগ হল ভগবানের সাথে সমজ্ঞান। মহাপ্রভুসখ্যজ্ঞানকে উত্তম বলেও

বললেন এরও অতিরিক্ত কিছু আছে। রামানন্দের উত্তর হল “বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্যসার” এই বাৎসল্য প্রেমে শান্ত,দাস্য,সখ্যের গুণগুলি আছে, অতিরিক্ত আছে ভগবানকে হীনবুদ্ধি। কৃষ্ণ পাল্য এবং নন্দ যশোদা পালক। এই পালক ভাবটি আগের তিন রসের তুলনায় এখানে বেশি আছে। তাই এহোত্তম । কিন্তু এর পরেও কিছু আছে। এবার রামানন্দ বললেন-“কান্তা প্রেম সর্বসাধ্যসার”। কান্তা প্রেম হল স্বসুখবাসনা পরিত্যাগ করে ভগবান কৃষ্ণ সুসৈখবাসনাময় যে কৃষ্ণপ্রীতি তাই হল কান্তাপ্রেম। এখানে শান্তের নিষ্ঠা,দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচ, বাৎসল্যের পালন ও মমতাধিক্যের সাথে যোগ হয় কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজাঙ্গ দ্বারা সেবা। তাই কান্তা প্রেমই সর্বসাধ্যসার।

রাধার প্রেমই হলো সাধ্যশিরোমণি। তাইই শ্রেষ্ঠ। গোপীদের কান্তা প্রেমের থেকে যে রাধার কান্তা প্রেম শ্রেষ্ঠ তা বোঝার উপায় জানতে চাইলে মহাপ্রভুকে রামানন্দ বললেন-

“রাধা লাগি গোপীরে যদি
সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধা কৃষ্ণের গাঢ়
অনুরাগ।।”

রামানন্দ বললেন, রাসে এমন ঘটনা ঘটেছে। শতকোটি গোপীসঙ্গে কৃষ্ণের রাসলীলা। গোপীদের প্রত্যেকের ইচ্ছা কৃষ্ণের সাথে রাস মিলন। ইচ্ছা কৃষ্ণ সেবার-

“শতকোটি গোপীসঙ্গে রস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধা পাশ।

সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।।
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল শ্রী হরি।।
সম্যক সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা

রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা।

তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভরে চিতে।

মন্ডলী ছাড়িয়া গেল রাধা অন্বেষিতে।।

ইতঃস্তত ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।

বিষাদ করেন কাম বাণে ভিন্ন হইয়া

শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ।

ইহাতেইঅনুমানিশ্রীরাধিকার গুণ।।"

এই ভাবেই রাধা প্রেম যে স্বর্গ প্রেমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার মহাপ্রভুর কাছে ব্যাখ্যা করেন রায় রামানন্দ।মহাপ্রভু তা মেনে নিয়ে বললেন-"এবে যে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়"। অর্থাৎ তিনি ও মেনে নিলেন যে রাধাপ্রেমই সর্বসাধ্যসার। এরপর মহাপ্রভু রামানন্দের কাছে কৃষ্ণ স্বরূপ,রাধাস্বরূপ প্রভৃতি জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

১৪.৪ সাধন তত্ত্ব

মহাপ্রভু সাধন তত্ত্ব প্রসঙ্গে জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রায় রামানন্দ তাকে বললেন, সাধনতত্ত্ব অত্যন্ত গোপনীয় এক তত্ত্ব। রাধা ও কৃষ্ণলীলা অত্যন্ত গূঢ়তম এক বিষয়। কান্তাভাব আশ্রিত এই লীলাদাস্য বাৎসল্য ভাবাদির অধিগম্য বিষয় নয়। রাধাকৃষ্ণ লীলার অধিকারী শুধু মাত্র সখীরা । এই ব্রজসখীদের মধ্যে আছে মহাভাব। ব্রজসখীরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এই লীলার পুষ্টি সাধন সম্ভব নয়।তারাই এই লীলার রস গ্রহণ করেন, তারাই এই লীলার পুষ্টি সাধন করেন। সখীরাই এই লীলার একমাত্র প্রবেশাধিকারী। ভগবান কৃষ্ণের যারা নিত্যপরিকর তারা সখীদের আনুগত্য স্বীকার করেই তাদের অর্থাৎ সখীদের কাছ থেকে রাধাকৃষ্ণের সেবা করার শিক্ষা লাভ করতে পারেন। যারা লাভ করতে পারেন তারাই রাধাকৃষ্ণের সেবারূপসাধ্যবস্তু পেতে পারেন। অন্য কোন উপায় তা পাওয়া সম্ভব নয়।

সখীদের ছাড়া সাধ্যবস্তু লাভ করা সম্ভব নয়। আবার এই সখীরা স্বভাবের দিক থেকে অনির্বচনীয়। সখীরা সকলে প্রেমিকা বলেই তাদের প্রেম সুখবাসনাহীন। কৃষ্ণলীলায় তারা কখনোই নিজের সুখ কামনা করেন না। রাধার সাথে কৃষ্ণের প্রেমলীলা

সম্পাদনা করিয়ে তাদের কোটিগুণ সুখ হয়। মহাভাবস্বরূপিনী, কৃষ্ণপ্রেমের চরম পরিণতি রাধা হচ্ছেন কল্পলতার মত।সখীরা যেন সেই লতার পল্লব, পাতা এবং ফুল। লতাতে জল ঢাললে পাতা-পল্লব ফুল যেমন আপনা থেকেই জল পায়, তেমনি রাধার যদি কৃষ্ণলীলামৃতের জলসেচন হয় তবে সখীরূপ পল্লব পাতা ফুল ও জল পায়। সখীরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় লাভ করে শতগুণ আনন্দ।

রাধাও সখীদের সাথে কৃষ্ণের কেলি সম্পাদন করিয়েনিজ কৃষ্ণসঙ্গ অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ লাভ করেন। দুজনার স্বসুখবাসনাহীন প্রেম পরস্পরের রসপুষ্টিসাধন করে থাকে। তাদের প্রেমের পারস্পরিক রসপুষ্টি কৃষ্ণকেও আনন্দ দেয়।

গোপীদের প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রতি ইচ্ছায় পরিচালিত। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নয়। স্বসুখ বাসনা হীন এই কৃষ্ণ সাধনা। তা কৃষ্ণ সুখের জন্য তন্ময়, তৎপর।

গোপীদের প্রেম ভাবনায় যিনি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম স্বর্গাদিলোকের বাসনা, লৌকিক ধর্ম পরিত্যাগ করে কৃষ্ণসাধনা করেন।

বৃন্দাবনের সাধনার যে স্তরগুলি বা বৈচিত্র্যগুলি অর্থাৎ দাস্য,সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবের যেকোন একটি ভাব কে নিয়ে ভজনা করলে অনুকূল দেহ প্রাপ্ত হয়ে ব্রজধাম এ ভগবান কৃষ্ণ কে লাভ করে থাকেন।রামানন্দ বললেন-

“গোপি-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে।

ভজিলেন নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে।

তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষী করিল ভজন।

তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।।”

রামানন্দ রায় বলতে চাইলেন সখীর আনুগত্যে রাগানুগাভক্তিমার্গে যদি ভজনা করা যায় তাই হল ভগবান কৃষ্ণ রাধার সেবায় সাধ্য প্রাপ্তির সাধনা।সাধ্য সাধন তত্ত্ব এমন অবতারণার পরে মহাপ্রভু রামানন্দ কে আত্ম স্বরূপ উন্মোচন করে দেখা দিলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ হিসেবে। রামানন্দকে মহাপ্রভু বললেন, আজীবন তিনি রামানন্দের সঙ্গে থাকতে চান তাই রামানন্দ কে নীলাচলে আসতে বললেন বিষয়কর্ম ছেড়ে। এরপরের সন্ধ্যায় রামানন্দ আর মহাপ্রভুর আলোচনার বিষয় হল ইষ্টগোষ্ঠী

প্রসঙ্গ।

এখানে রাধা প্রেমকে শেষ পর্যন্ত সাধ্যশিরোমনি বলা হল। এই সাধ্যবস্তুসাধন ব্যতীত লাভ অসম্ভব। জীবের পক্ষে সাধ্য শিরোমণি লাভ সম্ভব নয়। রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি কিন্তু তা সাধনের ফল নয়। অনাদিকাল থেকে তা বর্তমান রয়েছে। তবে জীবের পক্ষে রাধা প্রেমের আনুগত্যময় অবকাশও কেবলমাত্র লীলাতে। কিন্তু সখীরা ছাড়া অন্য কারো লীলায় অধিকার নেই। সম্পূর্ণভাবে সংকোচত্যাগ করে, রাধার সখীস্থানীয়াগোপীদের মত সহজ-সরলভাবে তনু মন প্রাণ ঢেলে কৃষ্ণের সেবা করাই সখীভাব। এই সখীভাব সাধন করলে রাধা প্রেমের অনুগত প্রেম লাভ করা যায়।

১৪.৫ কৃষ্ণ-তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, অর্থাৎ সমস্ত অবতারের মূল এবং সমস্ত কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মূল কারণ। তিনি হলেন অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত অবতার এবং অনন্ত ব্রম্ক্ষান্ডের আধার বা আশ্রয়।শ্রীকৃষ্ণের দেহ কোন রক্ত মাংসে তৈরি নয় তা সৎ,চিৎ ও আনন্দময়। ব্রজলীলায় প্রকট কৃষ্ণমূর্তিই তাঁর ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বরূপই পরমেশ্বর। তিনি সকল ঐশ্বর্য পূর্ণ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বরস-পরিপূর্ণ।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান।
সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান।।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
আন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার।।
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন
সবৈশ্বর্য্য-সর্বশক্তি সর্বরস পূর্ণ

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁর সৌন্দর্য, মাধুর্য সবকিছুই অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত বস্তুতে- নিজের প্রতি নিজের সৌন্দর্য মাধুর্য আস্বাদন এর জন্য কামনা জন্মায় বলে কৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত কামদেব এবং এই কামনা কে আরো বলশালী করে তিনি মত্ততার জন্ম দেন বলে তাঁকে বলা হয়েছে অপ্রাকৃত মদন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অচিন্ত্য মাহাত্ম্যে নিজের সৌন্দর্য মাধুর্য বিষয়ে প্রতিদিন নতুন কামনার

মধ্য দিয়ে এই মত্ততার জন্ম দিয়ে থাকেন বলে তাকে অপ্রাকৃত নবীন মদন বলা হয়। শ্রী বৃন্দাবনই হল নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণের ধাম।

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন হলেও মায়া মুগ্ধ চিত্ত তাঁর আকর্ষণে সাড়া দেয় না; সেজন্য সাধনের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বীজ মন্ত্র হচ্ছে কাম বীজ ও তার উপাসনার গায়ত্রী হচ্ছে কাম গায়ত্রী।কামবীজ(ক্লীং) হচ্ছে প্রনবের ও কাম গায়ত্রী হচ্ছে বৈদিক গায়ত্রী র রসাত্মক রূপ। কাম বীজ(ক্লিং) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলিত স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন রূপকে অনাবৃত ভাবে সূচিত করে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন- পুরুষ, নারী, স্থাবর, জঙ্গম- প্রভৃতি সকলেরই চিত্তাকর্ষক তাই তিনি সাক্ষাৎ মদনমোহন। তিনি বিভিন্ন রসাশ্রিত ভক্তের কাছে বিষয় ও আশ্রয়ের স্বরূপ। বিষয় রূপে তিনি আস্বাদ্য। তিনি মূর্তিমান শৃঙ্গার রস। অন্যের তো বটেই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজেরও চিত্তহরণ করেন। লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে লাভ করবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম-গায়ত্রী কাম-বীজে যাঁর উপাসন।।
পুরুষ যোষিৎ কিংবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেইসব রসামৃতেরবিষয় আশ্রয়।
শৃঙ্গার-রসবীজময়-মূর্ত্তি ধর,
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব চিত্তহর।
লক্ষীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণে করে আকর্ষণ।।

এইভাবে রামানন্দ রায়ের সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের বর্ণনা করলেন।

১৪.৬ রাধা তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে প্রধান তিনটি শক্তি হল-চিচ্ছক্তি, মায়া শক্তি ও জীব শক্তি। এদেরই নাম যথাক্রমে অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।

চিচ্ছক্তি, মায়া শক্তি,জীবশক্তি নাম।

অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গাতটস্থা কহি যারে।।

অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তি তাই তা শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হল সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ সৎ,চিৎ ও আনন্দের সমাহার। অতএব স্বরূপ শক্তিও তিন প্রকার-

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ

আনন্দাংশে‘হ্লাদিনী’,সদংশে‘সন্ধিনী’

চিদংশে ‘সংবিৎ’যারে জ্ঞান করিমানি।।

শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ দান করে বলেই এই শক্তিকে হ্লাদিনী বলে। এই হ্লাদিনীশক্তির সাহায্যেই রসাস্বাদন হয়ে থাকে।রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ রসরূপে আস্বাদ্য ও রসিকরূপে আস্বাদক। কিন্তু আস্বাদনের কারণ হল এই হ্লাদিনীশক্তি। সারাংশের নাম হচ্ছে প্রেম। প্রেম হল আনন্দ অনুভবময় চিন্ময় রস। এই প্রেমের পরম সারবস্তু হল মহাভাব। তাই শ্রীরাধা হলেন মহাভাব স্বরূপিনী।

হ্লাদিনীর সার অংশ - তার প্রেম নাম।

আনন্দ চিন্ময়রস - প্রেমের আখ্যান।

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।

সেই মহাভাব রূপা - রাধা ঠাকুরানী।।

শ্রীরাধার দেহ হল প্রেমস্বরূপ; তা প্রেমের দ্বারা গঠিত ও প্রকাশিত। তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী। শ্রেষ্ঠ চিন্তামণির মত ইনি সকল বাঞ্ছাই পূর্ণ করেন। তার কাজই হলো শ্রীকৃষ্ণের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করা।

“প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত।

কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত।

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে- এই কার্য্য যার

শ্রী রাধা হলেন মূল শক্তি, ললিতাদি সখীগণ তারই ছায়া। অর্থাৎ শ্রীরাধাই ললিতাদিসখীদের রূপ ধারণ করেছেন।ললিতাদিসখীরূপে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

শ্রী রাধার দেহ যে প্রেম দ্বারা গঠিত নানাভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ হচ্ছে সুগন্ধি বিলেপন দ্রব্য বিশেষ যা গায়ে মেখে শ্রীরাধার দেহ সুগন্ধ ও কান্তি যুক্ত হয়েছে। শ্রীরাধা দেহ করুণা, নবযৌবন ও লাবন্যের দ্বারা গঠিত। তার পরিধেয় বস্ত্র হচ্ছে নিজ লজ্জা রূপ শ্যাম বর্ণ পাটের শাড়ি, অর্থাৎ শ্রীরাধা হচ্ছেন পরম লজ্জাবতী। তাঁর উত্তরীয় বস্ত্র হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ রূপ অরুন বসন। প্রণয় ও মান রূপ কাঁচুলীরদ্বারা তাঁর বক্ষস্থল আচ্ছাদিত।

“মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।

ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ।।

রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।

তাতে অতি সুন্দর দেহ উজ্জ্বল বরণ

কারুণ্যমৃত ধারায় স্নান প্রথম।

তারুনামৃত ধারায় স্নান মধ্যম।।

লাবণ্যমৃত ধারায় তদুপরি স্নান।

নিজ লজ্জা শ্যামপট্টশাটী পরিধান।।

কৃষ্ণ অনুরাগ দ্বিতীয় অরুন বসন।

প্রণয়মানকুঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন।।”

শ্রীরাধার অঙ্গ বিলেপন হলো কুঙ্কুম, চন্দন ও কর্পূর।তাঁর সৌন্দর্য হচ্ছে কুঙ্কুম, সখীদের প্রণয় হল চন্দন এবং তার হাসি হল শুভ্র কর্পূর। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসরূপ

মৃগনাভি দিয়ে শ্রীরাধার দেহ চিত্রিত হয়েছে। শ্রীরাধার কোকড়ানো চুলের খোঁপা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন মানের জটিলতা। শ্রীরাধার নায়িকার গুণ হচ্ছে তার দেহ ব্যবহৃত গন্ধ চূর্ণ। এই গন্ধ চূর্ণেরদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রতি আকৃষ্ট হন।অনুরাগই হলো শ্রীরাধার তাম্বুল, যার রঙে তার অধর রক্তবর্ণ হয়ে থাকে। প্রেমের কুটিলতা তার দু চোখে কাজলের বাঁকা রেখার কাজ করে। বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত স্থায়ী ভাব সকল এবং হাসি প্রভৃতি সকল অলংকার হিসেবে অলংকৃত করে থাকে। কিল কিঞ্চিৎ আদি বিংশতি ভূষিত মাধুর্য গুন ফুলের মালার মতো তার স্ত্রী অঙ্গ পূর্ণ করে রয়েছে। সৌভাগ্য তার সুন্দর কপালে তিলক এর মত শোভা পাচ্ছে এবং প্রেম বৈচিত্ত হলো শ্রীরাধার হারের মধ্যমমণি। নিত্য কিশোরের মতো শ্রীরাধা সখীর কাঁধে হাত রেখেছেন অর্থাৎ শ্রী রাধা হলেন নিত্যকিশোরী। তার চারপাশের সখিরা হলেন কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মনোবৃত্তি সকল। শ্রীরাধা নিজের অঙ্গ সৌরভ রূপ গৃহে গর্বরূপে পালঙ্কে শুয়ে আছেন এবং সব সময় তিনি কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর। শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণইতাঁর কর্ণভূষণ, শ্রী কৃষ্ণ নাম তাঁর কানে অবিরাম প্রবাহিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সবসময়ই শৃঙ্গাররসমধু পান করাচ্ছেন। অতএব শ্রী রাধাই হচ্ছেন- কৃষ্ণ বিষয়ক বিশুদ্ধ প্রেম রূপ রত্নের আকর তুল্য। সত্যভামা যাঁর ভাগ্যগুণ পেতে ইচ্ছে করেন, ব্রজোগোপি রা যার কাছে কলাবিলাস শিক্ষা করেন, লক্ষ্মী ও পার্বতী যার সৌন্দর্য দিয়ে উৎসুক, যার পতিব্রতাধর্ম অরুন্ধতীও কাম্য এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁরসদগুনের সীমা দেখতে সক্ষম নন- সেই রাধা তত্ত্বের ব্যাখ্যা সামান্য জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

সৌন্দর্য্যকুঙ্কুম,সখী প্রণয়-চন্দন।

স্মিতকান্তি-কর্পূর, তিনে অঙ্গ-বিলেপন।।

কৃষ্ণের উজ্জলরস- মৃগমদভর।

সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর।।

প্রচ্ছন্ন মানবাম্য-ধম্মিল্ল বিন্যাস।

ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস।।

কবি আরও বলেছেন-

সৌভাগ্যতিলক চারুললাটেউজ্জ্বল

প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল।

মধ্যবয়ঃস্থিতি সখি স্কন্ধে করন্যাস।

কৃষ্ণলীলা মনোবৃতিসখী আশপাশ।

কবি লিখেছেন

যাঁহার সৌভাগ্যগুন বাঞ্ছে সত্যভামা।

যার ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা।।

১৪.৭ মধ্য লীলায় প্রেম বিলাস

প্রেম বিলাস বোঝাতে স্বসুখবাসনাহীন প্রেমজনিতবিলাসের বিবর্তকে বোঝায়।বিবর্ত শব্দের তিনটি অর্থ হয়। এর সাধারণ অর্থ 'ভ্রম'। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শব্দের অর্থ করেছেন 'বৈপরীত্য' এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এর অর্থ করেছেন 'পরিপাক'। তার মধ্যে 'পরিপাক' অর্থই মুখ্য,অপর দুটি অর্থ আনুষঙ্গিক;প্রেমবিলাসের যে পরিপক্কতা হয়েছে তা বোঝা যায় ব্যবহারবৈপরীত্য ও নিজ নিজ সত্তাজ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্তি থেকে।

"না সোরমণ, না হাম রমণী"- গানের এই অংশে এই বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বৈপরীত্যের প্রধান কারণ হল ভ্রান্তি- নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি।আবার এই ভ্রান্তি হচ্ছে বিলাস জনিত তন্ময়তার ফল। যা বিলাসের চরম পর্যায়ের পরিচায়ক।রমণ ও রমণী- এর মধ্যে পার্থক্য ঘুচে যায়। লুপ্ত হয় ভেদজ্ঞান। একে অন্যকে সুখী করার বাসনায় নায়ক নায়িকা কেলি বিলাসে প্রমত্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের চিত্ত অভিন্নত্ব লাভ করে। এই ভাবটিই গানের "দুহুঁ, মনমনোভব পেষল জানি"-এই অংশে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ প্রেমবিলাসের উদ্দিষ্ট বস্তু শুধুমাত্র বিলাসবৈপরীত্য না-বিলাসবৈপরীত্য এর কারণ যা সেটাই। প্রেম বিলাস-সুখতন্ময়তাই তার উদ্দিষ্ট বস্তু। তখন-

"প্রভু কহে- সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।

তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়।"

কিন্তু-

"সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহো নাহি পায়।

কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়।।"

শ্রীল রামানন্দ বললেন- আপনার ইচ্ছাতেই আমি এসব বর্ণনা করছি বস্তুত এতে আমার নিজস্ব কিছুই নেই। আমার মুখে আপনিই বক্তা আবার আপনি সেই বক্তৃতার শ্রোতা। অতএব যা বলতে চাইছেন তাই বলছি।

১৪.৮ ইষ্টগোষ্ঠী

মহাপ্রভু রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন সকল বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ । রামানন্দ উত্তর দিলেন কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কোন বিদ্যা নেই। মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন যে জীবের সমস্ত কীর্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় কীর্তি কোনটা। রামানন্দ উত্তর দিলেন কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত হওয়ার খ্যাতির চেয়ে উৎকৃষ্টতর খ্যাতি আর কিছুই নেই।তখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন জীবের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কি? উত্তরে রামানন্দ বললেন- রাধাকৃষ্ণপ্রেম ছাড়া আর মূল্যবান সম্পত্তি কিছু নেই।জীবের গুরুতর দুঃখ কি মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ বললেন, কৃষ্ণ ভক্তের বিরহ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর দুঃখ। শ্রেষ্ঠ মুক্ত জীবকে? মহাপ্রভুর এই প্রশ্নে রামানন্দ উত্তর করলেন 'কৃষ্ণ প্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি'। মহাপ্রভু তখন জিজ্ঞেস করলেন কোন গান জীবের স্বাভাবিক জীবধর্ম? উত্তরে রামানন্দ রায় বললেন-'রাধাকৃষ্ণ-প্রেম কেলি যে গীতের মর্ম' , সেটাই শ্রেষ্ঠগান। 'সার শ্রেয় কি?' মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ বললেন কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শ্রেয়স। জীবের অনুক্ষণ স্মরণীয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ বললেন 'কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ' ।

শ্রেষ্ঠ ধ্যেয় কি? রামানন্দ উত্তর করলেন 'রাধাকৃষ্ণ পদম্বুজধ্যান'। জীবের একমাত্র বাসভূমি কোথায়? মহাপ্রভুর এই প্রশ্নে রামানন্দ বললেন 'ব্রজভূমি বৃন্দাবন,যাঁহা লীলারসে'। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন 'শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ? 'উত্তরে রামানন্দ বললেন 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন।'

শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি? মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ রায় বললেন যুগল রাধাকৃষ্ণ স্বরূপই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপাস্য। অতঃপর মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন-

"মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছা যেই –কাঁহা দোঁহার গতি।"

উত্তরে রামানন্দ বললেন –

"স্থাবর-দেহে দেব-দেহে যৈছে অবস্থিতি।"

জ্ঞান ও ভক্তির তুলনায় ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে রামানন্দ রায় মন্তব্য করেছিলেন-

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে।।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান।"

এইভাবে দুই জনে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে নাচ-গান অশ্রুপাত প্রভৃতি করে রাত্রিযাপন করলেন এবং সকালে উঠে নিজের নিজের কাজে চলে গেলেন।পরদিন সন্ধ্যায় এইভাবে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করে রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বললেন-"আপনি আমার মুখ দিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ,লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এক বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে; দয়া করিয়া সেই সন্দেহের নিরসন করুন। আপনাকে প্রথমে সন্ন্যাসী রূপে দেখিয়েছি কিন্তু এখন আপনাকে শ্যামগোপরূপে দর্শন করিতেছি। আমার সম্মুখে একটি স্বর্ণপুত্তলিকা দেখিতেছি- সেই স্বর্ণপুত্তলিকার গৌরকান্তি দ্বারা আপনার শ্যামরূপ ও সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। সেই দেহে আবার বংশীযুক্তবদন প্রকট। দয়া করিয়া এইরহস্যের কারণ বলুন।"মহাপ্রভু বললেন-

"কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।।
মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ।।

স্থাবর জঙ্গম দেকে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফুর্ত্তি।।
রাধা কৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা যাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরায়।।"

তখন রামানন্দ রায় বললেন–"প্রভু! আপনি চতুরালী ছাড়ুন। আমার কাছে আপনার স্বরূপ গোপন করিবেন না। আপনি নিজ রস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নিজ প্রেম আস্বাদ করিতে ও অনুসঙ্গিক ভাবে ত্রিভুবন প্রেমময় করিতে আপনার আবির্ভাব। আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তথাপি আমার সহিত কপট ব্যবহার করিতেছেন কেন?" তখন কিছুটা হেসে মহাপ্রভু রামানন্দকে নিজের স্বরূপ দেখালেন।রামানন্দ দেখলেন এক শ্রীচৈতন্যদেহে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার মূর্তি বিদ্যমান। রামানন্দ এই মূর্তি দেখে আনন্দে মূর্চ্ছিত হলেন। তার ভূপতিত দেহ স্পর্শ করে মহাপ্রভু তাকে চেতন করে তুললেন।

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।।
দেখি রামানন্দ হইলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পড়ে দেহ পড়িলা ভূমিতে।।
প্রভু তারে হস্তস্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন।।

মহাপ্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন করে বললেন তুমি ছাড়া আমার এই রূপ অন্য কেউ দেখেনি।আমার তত্ত্ব,লীলা, রস সবই তোমার জানা। সেই কারণে এই রূপ তোমাকে আমি দেখালাম। আমার এই দেহ গৌরবর্ণ নয়। শ্রীরাধা তাঁর অঙ্গ দিয়ে আমার অঙ্গ স্পর্শ করে আছেন বলে আমার দেহের বর্ণ গৌর হয়েছে। শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করেন না। আমি শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হয়ে নিজ মাধুর্য আস্বাদন করে থাকি। তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই। আর গোপন করলেও প্রেম বলে আমার স্বরূপ রহস্য-ভেদ করতে তুমি সমর্থ। যা হোক আমার

এই স্বরূপ তথ্য গোপন রেখো- কারো কাছে প্রকাশ করো না।

এই ভাবে দশ দিন মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সাথে দিনযাপন করলেন। উভয়ের প্রশ্নোত্তরে নিগূঢ় ব্রজলীলার রসমাধুর্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো এবং উভয়কে আনন্দে নিমগ্ন করে তুলল। এরপর মহাপ্রভু রামানন্দের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন-

"বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহা আসিব অল্পকালে
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে।।"

এই বলে রামানন্দকে আলিঙ্গন করে মহাপ্রভু গৃহে পাঠিয়েদিলেন এবং নিজে শয়ন করলেন। পরদিন সকালবেলা মহাপ্রভু শ্রীহনুমানের বিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করে আবার পরিক্রমা আরম্ভ করলেন। বিদ্যাপুরের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক প্রভুর দর্শনে নিজের নিজের মত পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব হলেন। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর বিরহে কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি বিষয়চর্চা ছেড়ে প্রভুধ্যানে মগ্ন রইলেন।

১৪.৯ অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২. মধ্য লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রাধাতত্ত্ব আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৩.চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্যতত্ত্ব ও সাধন তত্ত্বের সম্পর্ক আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৪.চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রেমবিলাস ও ইষ্টগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১.শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত- সম্পাদনা ডঃ বিমলকান্ত মুখোপাধ্যায় ও তপন কুমার মুখোপাধ্যায়

২. বৈষ্ণবীয় সাধনা মুকুল- অমূল্য কুমার গোস্বামী

৩. মহাভাব- বিপিনবিহারী গুপ্ত

৪. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত

৫. চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান-ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

৬. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/মধ্যলীলা/অষ্টম পরিচ্ছেদ/সম্পাদক-শ্রী নরেশচন্দ্র জানা